শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

পঞ্চম ভাগ

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

সূচীপত্র

এক

২. ২৩. ১-৪

জীবকোটির ও ঈশ্বরকোটির ভক্তি

সেদিন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মদিন, ঠাকুরের মন স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তিভাবে ভরপুর ছিল। তাই মহিমাচরণকে বলছেন, একটু হরিভক্তির কথা বল। মহিমাচরণ নারদ পঞ্চরাত্রের কথা উল্লেখ করলেন। সেখানকার মূল ভাব হচ্ছে, অন্তরে বাইরে শ্রীহরিকে ভাবতে হবে। তপস্যা যদি সেই উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে তার কোন সার্থকতা নেই।

এরপর ভক্তি সম্বন্ধে ঠাকুর বলছেন, 'জীবকোটির ভক্তি, বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান। তারপর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।' আর ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা। তিনি সমাধি অবস্থাতেও যেতে পারেন আবার বাহ্য জগতেও ফিরে আসতে পারেন। এই প্রসঙ্গেই শুকদেবের কথা বললেন। শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন কিন্তু নারদ যখন বীণা বাজিয়ে হরিগুণগান করতে লাগলেন, তখন ধীরে ধীরে শুকদেবের বাহ্যজ্ঞান এল। জড়সমাধির পর আবার রূপদর্শনও হল। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাঁরা তাঁরা এইভাবে ওঠানামা করতে পারেন। হনুমানও সেরূপ সাকার নিরাকার দর্শনের পর রামমূর্তিতেই নিষ্ঠা নিয়ে থাকলেন। কারণ তিনি জগৎকে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। তাই তাঁকে বাহ্য জগতে নেমে আসতে হয়েছে না হলে জগৎ এই আদর্শ পাবে কোথায়? প্রহ্লাদও কখনও দেখতেন সোঽহং আবার কখনও দাসভাবে থাকতেন হরিরস আস্বাদন করবার জন্য।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ

এরপর বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের 'আমি' নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, ততক্ষণ তার সম্পূর্ণরূপে সেই ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্ন হয়ে থাকা সম্ভব হয় না। আর যখন সে ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্ন হয় তখন তার আর পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকে না। কিন্তু 'আমি'টা সহজে যায় না। তাই ঠাকুর বলেন, 'ভক্তির আমি', 'দাস আমি' এই নিয়ে থাকতে দোষ নেই। জ্ঞানী এবং ভক্তের এখানে কোনো পার্থক্যই নেই। জ্ঞানী জ্ঞানের ভিতর দিয়ে এবং ভক্ত ভক্তির ভিতর দিয়ে তাঁদের নিজের নিজের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তবে যাঁরা ভক্তিবাদী তাঁরা ভগবানকে আস্বাদন করতে চান বলে নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান না। এখানে যে 'আমি' থাকে তা 'ভক্তির আমি'। ঠাকুর বলেন এতে দোষ নেই।

কিন্তু যদি কেউ নিজের এই 'আমি'কে তাঁতে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয় তাহলে কি তার আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে? আমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ভাবি তাঁকে আস্বাদন করতে গেলে পৃথক সত্তা প্রয়োজন। এজন্য ভক্ত নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে চান না। যেমন রামপ্রসাদ বলছেন, 'চিনি হতে চাই না মা গো চিনি খেতে ভালবাসি।' ভাব হচ্ছে, আমি চিনি হয়ে গেলে চিনিকে আস্বাদন করব কি করে? সাধারণ মানুষ এই নিশ্চিহ্ন হওয়া, ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে দেওয়া, এতে ভয় পায়। যেমন মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি (বৃ. উ., ৪. ৫. ১৩) এরপরে আর সংজ্ঞা অর্থাৎ মনের কোন বৃত্তি থাকে না, প্রত্যয়রূপ জ্ঞান থাকে না। বলতেই মৈত্রেয়ী ভয় পেয়ে গেলেন। আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করছেন এই বলে 'মোহান্তমাপীপিপৎ'। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, না, আমি মোহগ্রস্ত করছি না।

ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীমি (বৃ. উ., ৪. ৫. ১৪) আমি এই বলতে

চাইছি যে, এই সময় বৃত্তিজ্ঞান থাকে না। কিন্তু জ্ঞান থাকে না তা নয়। জ্ঞান আর বৃত্তিজ্ঞান এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞানমার্গের ব্যাখ্যাতারা বলেন, সূর্যের যখন প্রকাশ হচ্ছে তখন সেখানে কোন বস্তু থাকলে তার প্রকাশ হয়। বস্তু যদি না থাকে তবে সূর্যের প্রকাশ লোপ পায় না। সূর্য স্বপ্রকাশ, নিজেই প্রকাশিত থাকেন। কথাটি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। আমরা সবসময়েই বৃত্তিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত। যেখানে আমি আছি জ্ঞাতা, আমার জ্ঞানরূপ ক্রিয়া আছে এবং সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার একটি বিষয় যাকে আমরা জানছি অর্থাৎ জ্ঞেয় তাও আছে। জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই তিনটির সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু যে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, যা বৃত্তিজ্ঞানের পারে সেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এই তিনটি নেই, এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই তিনটি লুপ্ত হলে জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায় না, জ্ঞানের বিষয় লোপ পেয়ে গেল। যদি বৃত্তি ওঠে জ্ঞান বৃত্তিকে প্রকাশ করবে। যদি কোনো বৃত্তি না থাকে তাহলে স্বয়ং জ্ঞান স্বপ্রকাশ হবে। এই জ্ঞানের উত্থান-পতন, উৎপত্তি-লয় নেই। বৃত্তিজ্ঞানের উৎপত্তি-লয় আছে। যেমন সূর্যের আলো যেখানে পড়ছে, সেখানে বস্তু প্রকাশিত হচ্ছে। বস্তুর পরিবর্তনের দ্বারা সেই প্রকাশের পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু যে আলো দিয়ে বস্তু প্রকাশিত হচ্ছে সেই আলো পরিবর্তিত হচ্ছে না। সূর্য সমানেই রয়েছে। সেইরকম বৃত্তিজ্ঞান সমুদ্রের এক একটি ঢেউ। সেই ঢেউ উঠছে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে। তার সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্তঃকরণকে প্রকাশ করছে যে আত্মারূপ আলোক সেই আলোক সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশমান হচ্ছে। কিন্তু যদি সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হয়ে যায় তখন কি আর জ্ঞানের প্রকাশ থাকবে না? বলছেন, থাকবে। যদি কোন বস্তু না থাকে তাহলে সেই প্রকাশস্বরূপ একাই থাকবেন, তাঁর প্রকাশ্য কিছু থাকবে না। জ্ঞানী বলেন সেই প্রকাশস্বরূপই হচ্ছেন ব্রহ্ম,

তিনিই আমাদের গন্তব্য, লক্ষ্য। ভক্তিরস আস্বাদনের ভিতর উত্থান পতন আছে, তা পরিবর্তনশীল। জ্ঞানী বলেন, আমরা ও বস্তু চাই না, এক অপরিবর্তনশীল যে নিত্য জ্ঞান তাতেই নিজেদের অবসান করতে চাই।

ঠাকুর বলছেন, সাধারণ মানুষ ভক্তিভাবের মধ্য দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যায়, কিন্তু এই নিত্যস্বরূপে পৌঁছাতে পারে না। যদি বা পৌঁছায় সেখান থেকে আর ফিরতে পারে না। তবে যাঁরা ঈশ্বরকোটি, আধিকারিক পুরুষ, জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য যাঁরা দেহধারণ করেন, তাঁরা বিদ্যার আমি রেখে দেন লোককল্যাণের জন্য। তাও থাকে দৈবী ইচ্ছায়।

অবতার ও ঈশ্বর

ঠাকুর একদিন মাস্টারমশাইকে বলছেন, 'আচ্ছা, আমার কি অহংকার আছে?' মাস্টারমশাই ঠাকুরের কথা তো অনেক শুনেছেন কাজেই একটু ভয়ে ভয়ে বলছেন, আজ্ঞে না, আপনার অহংকার বিশেষ নেই তবে একটু রেখে দিয়েছেন, লোকের কল্যাণের জন্য। ঠাকুর হেসে বলছেন, না আমি রাখিনি, তিনি রেখেছেন। কথাটুকু ভাল করে বুঝবার বিষয়। এই 'আমি'র লেশটির ভিতরেও তাঁর নিজের কর্তৃত্ব নেই। সেখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের যন্ত্ররূপে কাজ করছেন। অবতার বা অবতারকল্প পুরুষই একমাত্র এই 'আমি'র মধ্যেও কর্তৃত্ববুদ্ধি রাখেন না। এখন অবতার পুরুষ এবং জগৎ নিয়ন্তার মধ্যে পার্থক্য আমরা করি কি করে? না, জগৎ নিয়ন্তা যিনি, তাঁর উৎপত্তি লয় নেই। তিনি নিত্য কিন্তু অবতার ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অবতীর্ণ হন এবং সেইজন্য তাঁর উৎপত্তি আছে, লয় আছে অর্থাৎ স্থূল শরীরের লীলার নিবৃত্তি আছে। এইটুকুই তফাৎ। সুতরাং অবতার ঈশ্বর থেকে ভিন্নও

নন আবার অভিন্নও নন। (ভিন্ন নন এইজন্য যে, তাঁর ভিতর দিয়ে ঈশ্বরীয় সত্তা অবারিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আর অভিন্ন নন এইজন্য যে তাঁর উৎপত্তি, লয় আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। চণ্ডীতে বলছেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা॥ ১. ৬৪-৬৫

যিনি পরমেশ্বরী তিনি নিত্যা হলেও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য অবতীর্ণা হন। এর ভিতরে তাঁর ইচ্ছা প্রকৃতই থাকে কি না, এর উত্তর হল তা বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই। আমরা যখন জগৎ দেখি তখন বলি তাঁর ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হচ্ছে। কাজেই তাঁর ভিতরে ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই ইচ্ছা এত শুদ্ধ যে তার দ্বারা তাঁর সত্তা কোনরকম বিকৃত হয় না। তিনি পরিণাম প্রাপ্ত হন না।

সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া

ভগবান বলছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। গীতা . ৪. ৬

—আমি অজর অমর অক্ষয় আত্মাস্বরূপ হয়েও প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ নিজ মায়াশক্তি আশ্রয় করে জন্মগ্রহণ করি। মায়া মানে সাধারণ অর্থে যে মায়া বলা হয় অর্থাৎ বস্তুর সত্তাকে ঢেকে দিয়ে তাকে ভিন্ন পৃথকরূপে দেখা বা মিথ্যা জ্ঞান করা সেই মায়া নয়। ভক্তেরা সেই মায়াকে বলেছেন গুণমায়া। আর ভগবান যে মায়ার সাহায্যে নিজের দেহ সৃষ্টি করেন তাকে বলেছেন আত্মমায়া। আত্মমায়ার দ্বারা তিনি এক হয়েও বহু হতে পারেন। এই বহুত্বটি মিথ্যা বা কাল্পনিক নয়। যেমন

আমরা বলি, 'স্বপ্ন নু, মায়া নু, মতিভ্রম নু'—এ কি আমি দেখছি, একি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম ? সেই মায়ার কথা এখানে বলছেন না। এটি তাঁর লীলা। কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বহু হচ্ছেন না, এই বহুত্ব তাঁর খেয়াল মাত্র। এক তিনি বহুরূপে লীলা করেন এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞানী ও ভক্ত

তিনি আত্মারাম, তাঁর ভিতরে কোন অপূর্ণতা নেই, যে অপূর্ণতা দূর করবার জন্য তাঁকে সক্রিয় হয়ে কোন ক্রিয়া করতে হবে। সুতরাং পরিপূর্ণ যিনি তাঁর পরিবর্তন ঘটবে কি করে ? যেখানে অপূর্ণতা থাকে সেখানে চঞ্চলতা, তরঙ্গ থাকে। কুম্ভ যদি পূর্ণ হয় তাহ'লে তার ভিতরে কোনো তরঙ্গ থাকে না, প্রবাহ থাকে না। ভগবান যেখানে পরিপূর্ণ সেখানে তাঁর ভিতরে কোনো প্রবাহ থাকে না, তিনি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো। কিন্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্র হলে এই জগৎ-বৈচিত্র্য ঘটে না। আমরা যখন এই জগৎটাকে দেখছি, তার বিচিত্রতা অনুভব করছি, তখন কল্পনা করি পরিবর্তনের কারণ কি। পরিবর্তনটি নিজেই নিজের কারণ একথা বলা চলে না, কারণ আমরা সব সময় দেখি কার্যকে কারণের অতিরিক্ত কিছু হতে হয়। সেই কার্য আর কারণকে অভিন্ন বলা চলে না। অভিন্ন হলে কার্য একটিকে এবং কারণ একটিকে বলা চলত না। দুটির পার্থক্য আছে কিছু। সেই পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একদল বলছেন, ঐ পার্থক্যটি হচ্ছে একটা মায়া বা কল্পনামাত্র, বাস্তবিক পার্থক্য নেই। আর একদল বলছেন, পার্থক্য আছে বটে কিন্তু সেই পার্থক্য ভগবানের ইচ্ছায় হয়। তাতে ভগবানকে পরিবর্তনশীল, পরিণামী না করেও তাঁর ভিতরে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, এ ভগবানের বৈশিষ্ট্য। সেই ভগবৎ সত্তা-বিশিষ্ট যা নিজেকে বহুরূপ করতে পারে তিনিই লীলা করেন

বহুরূপে। ভক্ত এইভাবে ভগবানে পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। আর জ্ঞানী জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ব্রহ্মসত্তায় জগৎকে লয় করতে চেষ্টা করেন। জ্ঞানী জগৎটা লয় করেন ব্রহ্মেতে আর ভক্তের কাছে জগৎই ভগবানময়, তিনিই সর্বরূপে রয়েছেন।

ঠাকুর বললেন, 'হাজার বিচার কর, আমি যায় না। আমিরূপ কুম্ভ। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল। তবু কুম্ভ ত আছে। ঐটি ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর, আমি ভক্ত; তুমি প্রভু, আমি দাস; এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই। কুম্ভ না থাকলে তখন সে এক কথা।' জ্ঞানীর ভাব হচ্ছে, এই কুম্ভরূপ আপদটি কেন রাখব, একে নিশ্চিহ্ন করব। ভক্ত বলেন, যদি এটি ভগবানকে উপভোগ করবার একটি উপায় হয় তাহলে কেন রাখব না? যে আমি নিয়ে ভগবানের সঙ্গে লীলা করা যায়, সে আমি তো বন্ধনের কারণ হয় না। এ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, রুচির পার্থক্য। কোনটি ভাল বা কোনটি মন্দ এ প্রশ্ন ওঠে না। ভক্ত ভগবানকে নিয়ে বিলাস করবার জন্য পৃথক সত্তা হারাতে চান না, আর জ্ঞানী ভগবানে লীন হয়ে যেতে চান; অবশ্য সেখানে লীন হওয়া মানে নাশ নয়, তাঁর স্বরূপে মিশে যাওয়া। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ (কঠ. ২. ১. ১৫)

জ্ঞানী ব্যক্তির কিরকম হয়? যেমন একবিন্দু নির্মল জল নির্মল জলের রাশিতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে অভিন্ন হয়ে যায় তার আর বিন্দুত্ব থাকে না। সেইরকম মননশীল ব্যক্তির যে বিন্দুরূপ পৃথক সত্তা সেটি ঐ সিন্ধুর ভিতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ভক্ত ঐরকমভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে নিজের সত্তাকে

হারাতে চান না, পৃথক থেকে তাঁকে আস্বাদন করতে চান। এইটুকু পার্থক্য।

গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসী ভক্ত

গিরিশ ঠাকুরের অশেষ স্নেহভাজন। তাঁর প্রশংসা করে ঠাকুর বলছেন, 'গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ।' অন্যত্রও বলেছেন, গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস, গিরিশ হ'ল ভৈরবের অবতার। অথচ সেই গিরিশের কাছে নরেন্দ্রের বেশী যাওয়া ঠাকুরের পছন্দ নয়। কারণ যাঁদের দিয়ে ত্যাগব্রত গ্রহণ করাবেন, তাঁদের আদর্শকে নিখুঁত রাখবার জন্য তাঁর এত সতর্কতা। গিরিশ সংসারে থাকেন কিন্তু ঠাকুর জানেন নরেন্দ্র সংসারে থাকবেন না। ত্যাগীর জীবনে কামনা বাসনার লেশমাত্র থাকলে হবে না। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর গৃহস্থদের কখনও ঘৃণা করেননি। নিজেই বলছেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি সব হয়েছেন—সকলেই নারায়ণ।' গিরিশের কথা বলছেন, 'কিন্তু রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই।' গিরিশের আগে যে মন্দ সংস্কার ছিল সেগুলো এখন তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে না, কিন্তু তার একটু দাগ তো থেকে যায়। তাই বলছেন, 'ওরা থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে।' তাই যাদের দিয়ে কাজ করাবেন তাদের তিনি গৃহস্থদের কাছ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন।

সংসারী লোকেদের আর একটি দিক বলছেন। সংসারে যারা জড়িয়ে পড়েছে তারা কেবল ভগবানকে নিয়ে থাকতে পারে না, সম্ভব হয় না। বলছেন, তাদের অবসর কোথায়? আসলে এখানকার সব উপদেশগুলি ত্যাগীদের লক্ষ্য করে। দৃষ্টান্ত দিলেন, সেই রাজা আর

ভাগবত পাঠক পণ্ডিতের। শাস্ত্রচর্চার সার্থকতা তার মর্মবোধে। পণ্ডিত যখন ভাগবতের মর্ম বুঝলেন তখন সংসার ত্যাগ করলেন। রাজাকে বলে গেলেন এবার তিনি বুঝেছেন। ঠাকুর এইজন্য বলতেন, গীতার সার কথা হ'ল ত্যাগ।

অনেক সময় স্বামীজী, সন্ন্যাসী বিশেষ করে ব্রহ্মচারীদের গৃহস্থদের থেকে একটু দূরে থাকতে বলতেন। কিন্তু স্বামীজীও গৃহস্থদের অবজ্ঞা করেননি। ঠাকুর যেমন তাঁর ত্যাগী সন্তানদের পৃথক করে রাখতেন, স্বামীজীও তেমনি ত্যাগব্রতী ব্রহ্মচারীদের আদর্শ অব্যাহত রাখবার জন্য তাদের সংসারীদের থেকে একটু পৃথক করে রাখতেন। তবে কি সংসারের ভিতরে শুদ্ধ নেই, ভক্ত নেই? অবশ্য আছে। ঠাকুর তো বলেছেন ভক্তদের শুদ্ধ আধার, তাদের কাছে গেলে ভগবৎভাবের স্ফূরণ হয়। কিন্তু যাঁদের আচার্য বলে তৈরী করবেন, এখানে তাঁদের সাবধান করে দিচ্ছেন, এটুকু মনে রাখতে হবে। সমস্যা হচ্ছে যে, এরূপ শুনলে গৃহীদের মনে হয় তাহলে কি আমরা তত্ত্বজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হব? যেমন একজন বলেছেন, সংসারীদের কি উপায় নেই? ঠাকুর জোর দিয়ে বলছেন, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই উপায়কে অনুসরণ করতে হবে। এমন কোনো অবস্থা নেই যা ত্যাগীর মতো সংসারীর অলভ্য। সব অবস্থাই তার লাভ হয়। তারও ভগবান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়। পূর্ণ অধিকার সকলেরই আছে তবে পথের তারতম্য আছে। গৃহস্থ ত্যাগীর আদর্শ হতে পারে না। পক্ষান্তরে একথাও বলা যায় যে, ত্যাগীও গৃহস্থের আদর্শ হতে পারে না। কেন না সংসারী ত্যাগের আদর্শ নিলে সেই আদর্শ অনুসারে সে জীবনকে পরিচালিত করতে পারবে না এবং যে আদর্শ তার পক্ষে উপযোগী তার উপরেও তার শ্রদ্ধা কমে যাবে। ফলে সে এগোতে পারবে না। এইজন্য ঠাকুর সাধুদের একরকম বলেছেন, গৃহস্থদের আর একরকম বলেছেন।

কাকেও সান্ত্বনা দেবার জন্য নয়, যা সত্য তাই বলছেন। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলেছেন যা সবাইকেই করতে হবে তা হ'ল ত্যাগ। আর ত্যাগ অন্তরে হলে বাইরের ত্যাগ তো গৌণ। দেবালয়ে বসে মন আস্তাকুঁড়ে পড়ে রইল আর আস্তাকুঁড়ে থেকে মন দেবালয়ে থাকল—এর মধ্যে কোনটা শ্রেয়? সংসারে অথবা অরণ্যে—বাস যেখানেই করি মন কোথায় থাকে তার উপর সব নির্ভর করে। তবে গৃহীর অন্তরে ত্যাগ যতই হোক গৃহী ত্যাগীর আদর্শ হ'তে পারে না, কারণ ত্যাগের আদর্শ দেখাতে হলে আংশিক নয়, পুরোপুরি ত্যাগ করতে হবে। এখানে তাঁর কোনো আপোস নেই।

একবার ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের একজন বলছেন যে উনি এখন বলছেন ভগবানকেও ডাক সংসারও কর, একদিন কুটুশ করে কামড়াবেন। অর্থাৎ একদিন বলবেন, না সংসার ছাড়। ঠাকুর হেসে বলছেন, কামড়াব কেন গো? আমি তো বলি এ-ও কর ও-ও কর। দুই-ই সত্য। একথাটি সত্য নয় তা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপদেশ সবসময় অধিকারীকে লক্ষ্য করে হয়। যার যেরকম পথে চলার সুযোগ আছে তাকে সেইরকম পথে চলার নির্দেশ দিতে হয়। ত্যাগের অধিকারীকে সংসারে থাকার উপদেশ দিলে তার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। আবার সংসারী লোক যার ত্যাগের আদর্শ গ্রহণের সুযোগ নেই তাকে সে আদর্শের কথা বললে তাকে দুর্বল করে দেওয়া হবে। এই-জন্য যার যেটা উপযোগী তাকে সেইরকম উপদেশ দেওয়া দরকার। ঠাকুর কখনও কখনও গৃহীর সামনে ত্যাগের কথা বলে ফেলেছেন, তখন কোনো গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করেছেন, তাহলে কি সংসারে থাকলে হবে না? ঠাকুর বললেন, তা হবে না কেন? ও আমাদের একটা হয়ে গেল। অর্থাৎ তোমাদের জন্য ঐ ত্যাগের উপদেশ আমি দিইনি।

স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন যে, আদর্শে পৌঁছলে ত্যাগী এবং

গৃহস্থ দুই-ই সমান। এই প্রসঙ্গে চড়াই পাখীর অতিথি সেবায় সপরিবারে আত্মবিসর্জনের কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, এটা কি কম বড় আদর্শের কথা? আবার যে সন্ন্যাসী, রাজ্য, রাজকন্যা সব প্রলোভনকে অতিক্রম করে চলে গেল, তার আদর্শে সে অক্ষুণ্ণ। ত্যাগ ছাড়া হবে না এ কথা পরিষ্কার বলেছেন। কাজেই এখানে কোন আপোস করছেন ঠাকুর এরকম যেন আমরা মনে না করি। ঠাকুর সে ধাতেরই নন, কখনও কোথাও আপোস করেননি। তবে অধিকারী হিসাবে আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অধিকারী হিসাবে উত্তম বৈদ্য যার যা পথ্য তাই নির্দেশ করেন।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আছেন। যথারীতি মা নহবৎ থেকে খাবার করে দিয়েছেন। খাবার পর ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, কিরে কেমন খেলি? নরেন্দ্র বলছেন, বেশ রুগীর পথ্য খেলাম। ঠাকুর মাকে বললেন, নরেনের জন্য মোটামোটা রুটি আর ঘন করে ছোলার ডাল করবে। ভাব হচ্ছে, যার যা পথ্য তাকে তা দিতে হবে। যোগীন মহারাজ ঠাকুরের মতো পেটরোগা ছিলেন। তাঁকে সেইরকম পথ্য করে দিতে হোত। তেমনি উপদেশও আধার বুঝে। ত্যাগীদের যখন উপদেশ দিতেন শোনা যায় তিনি দরজা বন্ধ করতেন, তারপরেও আশে পাশে কেউ আছে কিনা দেখে তারপর উপদেশ দিতেন। সেই তীব্র বৈরাগ্যের কথা শুনলে সংসারীর সংসার জ্বলে পুড়ে যাবে, তাই তাঁর এত গোপনতা। এখানে নরেন্দ্রকে সাবধান করে দিচ্ছেন, গিরিশের ওখানে বেশী যাস না। আবার সুবোধানন্দ স্বামীকে মাস্টারমশাই-এর কাছে পাঠিয়েছেন। মনে হয়, খোকা মহারাজের তখন সংসারীদের প্রতি বিরূপতা ছিল। ঠাকুর তা বুঝেছেন, তাঁকেই পাঠাচ্ছেন মাস্টারমশাই-এর কাছে। ঠাকুর বলার পরও তিনি যাননি। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করায় বললেন, না,

যাইনি। মাস্টারমশাই সংসারী লোক, তাঁর কাছে আবার কি ধর্মোপদেশ নিতে যাব? ঠাকুর হেসে বললেন, না রে যাস। তারপরে ঠাকুর বার বার বলেছেন বলে মাস্টারমশাই-এর কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, ঠাকুর তাঁকে আগে আসতে বললেও তিনি আসেননি। মাস্টারমশাই হেসে বললেন, দেখ, এখানে আমার নিজস্ব কিছু নেই। ঘরে একটি গঙ্গাজলের জালা আছে, তাতে গঙ্গাজল ভরে রাখি। কেউ এলে সেইখান থেকে একটু একটু দিই। তাৎপর্য হচ্ছে, মাস্টারমশাই-এর কাছে গেলে ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা নেই। ভগবৎ কথাও ঠাকুরের উপদেশের সঙ্গে মিশিয়ে বলতেন। দেখা গিয়েছে, তাঁর এই-রকমই স্বভাব ছিল। হয়তো খোকা মহারাজের ভিতরে একটা অভিমান ছিল যে আমি ত্যাগী, আমি আবার গৃহীর কাছে কি যাব? সেই অভিমান দূর করবার জন্য ঠাকুর তাঁকে পাঠাচ্ছেন। আবার গিরিশের এখন সেই পূর্বের ভাব নেই স্বামীজীর মুখে একথা জেনেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পরিহার করতে বলছেন।

ঠাকুর অনেক চিন্তা করে তাঁর কথা বলেছেন। দীর্ঘকাল ধরে এগুলি ধর্মজগতের নজীর হয়ে থাকবে। অনেকসময় ঠাকুরের কথা আপাতবিরোধী বলে মনে হয় কিন্তু কোন পরিবেশে কাদের জন্য বলছেন সেকথাটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। শাস্ত্রেরও সর্বদা এই নির্দেশ। বেদে কতরকমের উপদেশ আছে। যারা কামনা বাসনায় পূর্ণ তাদের জন্য কোথাও তদুপযোগী উপদেশ আছে। আবার অন্য জায়গায় তীব্র ত্যাগ বৈরাগ্যের কথাও আছে। দুটি পরস্পর বিরোধী। বিরোধ থাকে না যদি কার জন্য কোন কথা বলছেন এই দৃষ্টিতে বিচার করি। গবেষকরা অনেকসময় এরকম কিছু উক্তি উদ্ধার করে বলেন, এসব পরস্পর বিরোধী কথা, কথার স্থিরতা নেই। কিন্তু context বা পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে বিরোধ থাকে না। কোন পরিবেশে

কাকে কি উপদেশ দিলেন তা বিচার না করে শুধু উক্তিগুলি টেনে বার করলে হয় না।

আমরাও অনেক সময় ঠাকুরের কথা আলোচনা করে এইরকম একটা বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। হরি মহারাজ তখন কনখলে। তিনি খুব তীব্র বৈরাগ্যের কথা বলতেন। শুনে সাধুরা অনেকে ভাবলেন, কাজকর্ম তো বৈরাগ্যের পরিপন্থী, তাই তাঁরা এদিকে ওদিকে তপস্যায় চলে গেলেন। একজন এসে বলছেন, মহারাজ, আপনার উপদেশের ফলে সাধুরা সব তপস্যা করতে চলে যাচ্ছেন, কাজ করতে কেউ থাকছেন না। বললেন, তাই নাকি? ব্যাটারা আমার কথা এইরকম করে বুঝল? উপদেশ বুঝতে এইরকম ভুল হয়।

কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস

গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্মসন্ন্যাসের উপদেশ দিচ্ছেন তখন অর্জুন সংশয়গ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, কোনটি শ্রেয় বল। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা বুঝি কর্ম আর সন্ন্যাস দুটি অত্যন্ত বিরোধী কিন্তু শাস্ত্র দেখাচ্ছেন দুয়ের কোথায় সামঞ্জস্য আছে। কর্ম বা সংসার করা দোষের নয়, কিভাবে করা হয় ভালমন্দ তার উপর নির্ভর করে। মানুষের সংশয়াচ্ছন্ন মনে ঠাকুরের কিছু কথা পরস্পর বিরোধী মনে হয় কিন্তু তাৎপর্য বুঝলে সব বিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়।

তারপর ঠাকুর এখানে বলছেন, 'সব দেখছি কলাই-এর ডালের খদ্দের' অর্থাৎ গৃহী অথবা সন্ন্যাসী যাই হোন সর্বস্ব পণ করে ঈশ্বরকে চাইবেন এমন উচ্চ অধিকারী বিরল। যেমন গীতায় বলেছেন—

> ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ (গীতা ৩।৪)

—কেবল ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয়ে যাবে না। বাসনা ত্যাগ করতে হবে—বার বার এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। বলছেন,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ২।৪২-৪৪

—বেদে ভোগৈশ্বর্যের উপায়ভূত বিবিধ কর্মের প্রশংসাসূচক কথা আছে। যা চাও সব পাবে। ইহলোকের ভোগ কিংবা পরলোকে স্বর্গলাভ যা চাইবে। এইগুলি হচ্ছে পুষ্পিতা বাক্, আপাতমনোরম কথা। এই আপাতমধুর কথায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, ফলে তাঁদের অন্তরে কখনও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উদিত হয় না, তাঁরা কখনও ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না। কেবল সন্ন্যাস নিলেই ফল হবে না।

কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করতে হবে, শুধু বাইরে ত্যাগ করলে হয় না। বলছেন, নিষ্কাম হয়ে কর্ম করলে বদ্ধ না হয়ে মুক্ত হবে। অজ্ঞানিগণ আসক্ত হয়ে যেরূপ কর্ম করে থাকেন জ্ঞানীরা অনাসক্ত চিত্তে লোককল্যাণের জন্য তেমনি কর্ম করেন। কর্ম করাতে কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য রয়েছে কি দৃষ্টিতে করছে। গীতায় আছে—

'কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।' ৪।১৬

কর্ম কি কর্মহীনতাই বা কি জ্ঞানীরাও এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন। তারপর বলছেন, 'কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।' (৪।১৭) কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মের, বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মের এবং অকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগের তত্ত্ব জানা দরকার। কর্মের স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে সিদ্ধান্ত করলে তা প্রমাদপূর্ণ হয়।

তেমনি ঠাকুরের ত্যাগী ও সংসারীর দুটি আদর্শকে ঠিক মত বুঝতে হবে।

তারপর ভাবোন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন, 'কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই। মনে সন্ধ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হা-রাই॥' ঠাকুর ভাবছেন যে, এখন স্বামীজীর অন্তরে এমন তীব্র বৈরাগ্য উদ্দীপিত হয়ে আছে যে তিনি বোধহয় আর ঠাকুরের স্নেহে বাঁধা থাকবেন না। কোথাও বেরিয়ে যাবেন। মাস্টারমশাই-এর স্বগতোক্তি থেকে মনে হচ্ছে ঠাকুরের আশংকা স্বামীজী বুঝি তাঁর আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হন। নরেন্দ্র যাতে একটি নিখুঁত যন্ত্র হয়ে তাঁর কাজ করে যেতে পারেন সেজন্য স্বামীজীর ভিতরে তাঁর আদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখে ঠাকুর লীলা সংবরণ করতে চান। এইজন্য ঠাকুরের এত সাবধানতা।

মহিমাচরণ চুপ করে আছেন দেখে এবার তাকে বলছেন, এগিয়ে পড়। একজায়গায় বসে থাকলে হবে না।' যা কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। আরও এগোতে হবে। একটা তীব্র অতৃপ্তি মনে রাখতে হবে কিছুতেই যেন থেমে না পড়ি। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, এই বোধ সর্বদা যেন থাকে।

দোলযাত্রা বলে ঠাকুর মন্দিরে প্রণাম করে বিগ্রহদের আবির দিলেন, ভক্তদেরও গায়ে ফাগ দিলেন। এইসব বাহ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের কল্যাণচিন্তা অন্তঃসলিল প্রবাহের মতো অনুক্ষণ তাঁর ভিতরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বাবুরামের খোঁজ নিচ্ছেন। পল্টুর ধ্যান হয় না কেন সে চিন্তা করছেন। বাইরে বারান্দায় নরেন্দ্র এক বেদান্তবাদীর সঙ্গে বিচার করছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখে আসছেন, যাতে বিচারের ধারায় নরেন্দ্রের মন অন্যদিকে না চলে যায়।

ঠাকুর মহিমাচরণকে স্তবপাঠ করতে বলায় তিনি কয়েকটি স্তব পাঠ করলেন। মহিমাচরণ অপেক্ষাকৃত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, পড়াশুনা করতেন,

যদিও যতদূর পড়াশুনা ছিল তার চেয়ে যেন একটু বেশী করে নিজের পাণ্ডিত্য দেখাতেন। তার পরিচয় অন্যত্র আছে।

মহিমাচরণ শংকরাচার্যের যে শিবস্তোত্র পড়লেন তাতে সংসার কূপ, সংসার গহনের কথা আছে। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, 'সংসার কূপ, সংসার গহন কেন বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি?' সংসার সংকটময়, দুঃখময়। ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। সংসারটাকে যদি দুঃখময় বলে অনুভব না হয় তাহলে এই সংসার ছেড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষাই বা কেন হবে? সংসার ভাল লাগলে এখানেই আপোস করে পড়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। এর পারে যাবার বাসনাই মনে জাগবে না। তাই বলছেন প্রথম প্রথম বলতে হয়। তারপর অভয় দিচ্ছেন, 'তাঁকে ধরলে আর ভয় কি?' সেই ভগবানকে আশ্রয় করলে আর সংসার কূপ থাকে না, তাকে আর দুঃখময় মনে হয় না। আজু গোঁসাই-এর ভাষায় তখন এই সংসারই হয় 'মজার কুটি'। সংসারে থেকে আমি আনন্দ করি, সংসারটা আনন্দে পরিপূর্ণ। জনকরাজা এই সংসারেই ছিলেন কিন্তু তাতে তাঁর কি কোনো অপূর্ণতা ছিল, আনন্দের কি কিছু কমতি ছিল? 'সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' জনকরাজা সংসার ও ঈশ্বর দুদিক বজায় রেখে সংসারে ভোগের মধ্যে ছিলেন কিন্তু ভোগে আসক্ত হননি। ভোগ দোষের নয়, আসক্তিই দোষের। অনাসক্ত থেকে ভোগ বন্ধনের কারণ হয় না।

সংসার ও আশ্রম

ঠাকুর হঠাৎ এখানে একথা বলছেন কেন? ভাব হচ্ছে এই যে, মহিমাচরণ মুখে যাই বলুন তিনি সংসারী। সর্বত্যাগের আদর্শ অনুসরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেইরকম আদর্শ বললে তাতে মন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাতে যোগও হয় না, ভোগও হয় না। এইজন্যে কাকেও

এইরকম দ্বিধার মধ্যে রাখতে নেই। তাই শাস্ত্র বলেছেন—ঠাকুরও বার বার বলেছেন যে, এই সংসারও আশ্রম। একে আশ্রয় করে মানুষ চরম কল্যাণ লাভ করতে পারে। সংসার এ কারাগারও নয়, ভগবানকে ভুলে থাকার জন্য কল্পনা করি আমরা বদ্ধ। ভগবানকে সর্বত্র দেখতে পারলে সংসারে দোষ কোথায়? এই সংসারকে আমাদের ঈশ্বরময় করে তুলতে হবে। 'ঈশাবাস্য-মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—এই সমস্ত বস্তু সেই এক ঈশ্বর দ্বারা আবরণীয়। সবজায়গায় তাঁকেই দেখতে হবে। সংসারে যা কিছু আমাদের আকর্ষণ করছে সকলের ভিতরে সেই এক পরমেশ্বর রয়েছেন। বিষয়ের মধ্যে তাঁরই আকর্ষণ আমরা বিকৃতভাবে অনুভব করছি। যখন সর্বত্র তাঁকে দেখব তখন কোনো বিষয়ই আমাদের ত্যাজ্য হবে না।

'জনকরাজা দু'খানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নেই।' ঠাকুর বলছেন, ভয় কি? তাঁকে ধরো। হলেই বা কাঁটাবন, জুতো পায়ে দিয়ে চলে যাও। যে বুড়ি ছোঁয় তাকে কি আর চোর হতে হয়? রাম সংসার ত্যাগ করতে চাইলে বশিষ্ঠ যে কথা বলেছিলেন তার তাৎপর্য হচ্ছে ভগবান সংসারের সর্বত্র ওতপ্রোত হয়ে আছেন, সুতরাং ত্যাগ কি করব? কথা হল, সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখা, তা জ্ঞানীও দেখতে পারেন, ভক্তও দেখতে পারেন। দূর থেকে একটা দড়িকে কখনও সাপ বলে, কখনও মালা বলে, কখনও লাঠি, কখনও জলধারা বা মাটির উপরে একটা ফাটল বলে দেখছি। এই যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি সবই আশ্রয় করে আছে এক দড়িকে। দড়ি বলে যদি জানি তখন সাপকে পরিহার করে ছুটে পালাতে হবে না বা মালা বলে তাকে তুলে গলায় পরতেও হবে না। এ সবকে পরিহার করে তখন মানুষ সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারে। এই কথাটুকুই এখানে বোঝাচ্ছেন। বিশেষ করে গৃহীর পক্ষে এই দৃষ্টি

উপযোগী। তাদের যদি সর্বত্যাগের আদর্শ দেওয়া যায় তাহলে সেই আদর্শ গ্রহণ করতে না পারায় তাদের মনে হীনমন্যতা আসবে। অসামর্থ্যের জন্য তারা নিজেকে দীন, অধম ভাববে। এই অধম ভাবটা ঠাকুর পছন্দ করতেন না। যে নিজেকে অধম ভাবে সে অধমই হয়ে যায়। ঠাকুর তাই তার বিপরীত ভাবের উপর জোর দিতেন। এখানে বলছেন, তুমি সেই ঈশ্বররূপ বর্ম যদি পরে থাক তাহলে সংসার তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। এইটি বিশ্বাস করা এবং তদনুসারে সাধনা করা যদি লক্ষ্য হয় সংসারে থেকেও তা সম্ভব।

জ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বলা হল যে প্রথম জন্ম নিলেন হিরণ্যগর্ভ। তিনি একা বলে ভয়ে কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি ভাবলেন, আমি ছাড়া আর কিছু যদি না থাকে তবে আমি কার কাছ থেকে ভয় পাচ্ছি?

যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি— (বৃঃ ১. ৪. ২)

আর ভক্তের দৃষ্টিতে, যদি সর্বত্রই প্রেমময় ভগবান অস্তিত্ববান হন তাহলে ভয় কোথায়? ভালর ভিতরে যিনি, মন্দের ভিতরে তিনিই। সুতরাং তার ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য থাকে না। যে বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলেছে তার আর ভয়টা কি? বুড়ি হলেন সেই ভগবান, যাঁকে একবার অনুভব করলে সংসার আর কখনও ভয় দেখাতে পারে না। সংসারকে মায়াময় বলা হয়। গীতায় বলেছেন, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' ৭।১৪ —যারা আমার শরণাপন্ন হয় তারা এই মায়ার পারে যায়। ঠাকুর বলেছেন, মায়ার থেকে মুক্ত হতে হলে মায়াবীকে ধরো। নাহলে যতই চেষ্টা কর মায়া-জাল থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায়ই নেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে যাঁর মায়া তাঁকে ধরা। তখন তিনি মায়ার আবরণ সরিয়ে নিলে এই মায়ার রাজ্যে বাস করলেও কোনো দুঃখ নেই, বরং বলছেন, 'বিনোদো নাট্য বদ্ধিয়ঃ'—তখন নিজেকে রঙ্গমঞ্চের দর্শকের মত মনে হবে। যে অভিনয় দেখছে সে জানে এটা মিথ্যা সুতরাং তার ভালমন্দ

কোনটাতেই মন চঞ্চল হয় না, বরং দেখে আনন্দ হয়। এইজন্য যাঁরা জ্ঞানী সংসারের এই বৈচিত্র্য তাঁদের অভিনয় দেখার মতোই মনে আনন্দ উৎপন্ন করে। কে অভিনয় করছে? সেই সৎ যিনি, তিনিই অভিনয় করছেন। আর কি সুদক্ষ অভিনেতা, এমন করে আত্মগোপন করেছেন যে তাঁকে আর চিনবার উপায় নেই। এইখানেই অভিনেতার সাফল্য। অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে যাওয়া তাঁর মতো এরকম নিপুণ অভিনেতা আর কে আছে? এইজন্যই ভগবান শঙ্করকে বলা হয় নটরাজ, নটশ্রেষ্ঠ। নটরাজ রূপে এই বিশ্বে তিনি নৃত্য করছেন, কত রূপে অভিনয় করছেন। তাঁকে জানলে বিশ্ববৈচিত্র্যে আমরা অভিনয় দেখার আনন্দ পাব।

করুণাময় অবতার

ঠাকুর বলছেন যে, মহিমাচরণের স্তবগান তাঁর মনকে ঊর্ধ্বগামী করে রেখেছে। মন আর বাহ্যজগতে নেমে আসছে না। ঠাকুরের মনে সর্বদাই পরম তত্ত্বের আকর্ষণ প্রবল তবুও তিনি যে জোর করে মনকে নীচে নামিয়ে রাখেন তা তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত ভক্তদের কল্যাণের জন্য। আমরা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করি মনকে নীচ থেকে উপরে নিয়ে যাবার জন্য আর তাঁকে যুদ্ধ করতে হয় উপর থেকে মনকে নীচে নামাবার জন্য। মাকে বলছেন, আমি সমাধি চাই না মা, আমাকে বেহুঁশ করিস্ না, আমি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলব। এইজন্যই তো তাঁর দেহধারণ করে অবতীর্ণ হওয়া। নাহলে তিনি তো ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে চেষ্টা করে সে তত্ত্বে যেতে হবে না। জগতের প্রতি করুণার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে আনন্দের ছিঁটেফোঁটা পেলে মানুষ 'মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি'—সেই পরিপূর্ণ আনন্দ সর্বদা তাঁর অনুভব হচ্ছে, তা সত্ত্বেও জোর করে মনকে নীচে নামিয়ে আনছেন। সকলের

সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাইছেন তার দ্বারা তিনি তাঁদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবেন। অবতারেরা সকলেই হচ্ছেন পরমেশ্বরের হাতের নিখুঁত যন্ত্র। কোনো অভিমান, কর্তৃত্ববোধ থাকে না বলে তাঁদের ভিতরে ঐশী শক্তির নির্বাধ প্রকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু আমিত্ববিশিষ্ট যন্ত্র বিকৃত, তাই তার ভিতর দিয়ে শক্তির পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য অবতারকে পরমেশ্বরের মূর্তি বলা হয়, তাঁকে দেহধারী ভগবান বলা হয়, এটুকু মনে রাখতে হবে।

তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা

রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের তর্ক চলছে। রামচন্দ্র গভীর বিশ্বাসী আর নরেন্দ্র বিচারশীল তবে দুজনেই ঘোর তার্কিক। অতএব তর্ক খুব জমেছে কিন্তু ঠাকুরের এসব ভাল লাগছে না। আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ, যদি তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ করা যায় তাহলে মানুষ সত্যাসত্য বুঝতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে সে কোন বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না। এজন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলেন, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'

ব্রহ্মসূত্রেও আছে, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানা'—তর্ক বিচারের দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

তবে কি বিচারের কোন প্রয়োজন নেই? শ্রুতি বলছেন, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য।' আত্মাকেই জানতে হবে, কিন্তু চোখ বুঁজে বিশ্বাস করলে হবে না। শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। শুনতে হবে, মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। আমাদের জানতে হবে আমরা কোথায় যাব। তারপর কোন পথে লক্ষ্যপ্রাপ্তির অনুকূল হবে সেই পথের সম্বন্ধেও একটা ভাল ধারণা থাকা চাই। বৈকুণ্ঠের পথে যাওয়া মানে শুধু কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে শরীরের রক্তক্ষরণ নয়। বৈকুণ্ঠে

যাব না খানায় পড়ব তা বিচার করে জানতে হবে। বিশ্বাসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যে বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁদের সিদ্ধান্ত হল সাধ্য এবং সাধন দুটি সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। স্বয়ং মহাপ্রভু রায় রামানন্দের কাছে গিয়ে বিনীত ভাবে সেই তত্ত্ব জানতে চান। সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রেও বিচারের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে। ঠাকুর বলেছেন, যাকে ভক্তি করবি তাকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? কাজেই জ্ঞানী, ভক্ত বা কর্মী যা-ই হোন না কেন সকলেরই বিচারের দরকার নাহলে তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয় না। একজন চাইছে ব্রহ্মানন্দ, আর একজন শুঁড়ির দোকানে মদ খাইয়ে বললে এর নাম ব্রহ্মানন্দ। সে কি বুঝে নেবে এই ব্রহ্মানন্দ? অনেক সময় সাধারণ মানুষ লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা না থাকার জন্য বিভ্রান্ত হয়। তাই ভগবানের পথের পথিককে জিজ্ঞাসা করে বসে, আমার ছেলের চাকরী বা মেয়ের বিয়ে কবে হবে? কিংবা আমার অবস্থার উন্নতি কবে হবে, আমার ফাঁড়া কিসে কাটবে ইত্যাদি। ভুলে যায়, যাঁর কাছে যাচ্ছি সেখানে যাবার উদ্দেশ্য কি? এগুলো আমাদের অজ্ঞতা আর এজন্যই বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হল অগম্য যে তত্ত্ব তাকে বিচারের দ্বারা কি করে জানব? তার উত্তর হল সম্পূর্ণ জানা না গেলেও মনে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগোতে হবে। মন যত শুদ্ধ হবে ধারণা তত স্পষ্টতর হবে এবং চরমে সেই ধারণা যখন বদ্ধমূল হবে তখনই তার নাম অনুভূতি। অনুভূতি হল আমি যা চাইছি পরিপূর্ণভাবে সেইভাবে ভাবিত হয়ে যাওয়া। ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচার করতে করতে সেই বিচার যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে সন্দেহের লেশমাত্র নেই তখনই ব্রহ্মানুভূতি হবে তবে বিচারের ভিতরেও ফাঁক থেকে যায়। যার ফলে একজনের বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত আর একজন উল্টে দিচ্ছে। এইখানে

খানিকটা বিশ্বাসের অবকাশ আছে। উপনিষদে ঋষি শিষ্যকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন। তিন চারটি উপমা দিয়ে নানানভাবে বোঝাচ্ছেন আর শিষ্য কেবলই বলছে, আবার বলুন। শেষকালে বললেন, বৎস শ্রদ্ধৎস্ব, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হলে কোনো বিচারই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করবে না। যে জেগে ঘুমায় তাকে আর জাগান যায় না। তাই বিচারের সঙ্গে বিশ্বাসের দরকার। তবে তার আগে ভিত্তিগুলিকে একটু শুদ্ধ করে নিতে হয়।

তর্ক বিচারের জন্য চাই শুদ্ধ মন

এখানে ঠাকুর যে বলছেন তর্ক আর ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না? না, শুধু শুষ্ক বিচারে তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। বস্তুকে বুঝবার চেষ্টা কর, তাঁকে জানবার চেষ্টা কর, শুধু তাই নয় তাঁকে পাবার চেষ্টা কর। অশুদ্ধ মন নিয়ে বিচার করলে কি সিদ্ধান্ত হবে? এমন কি মন খুব শুদ্ধ হলে হয়তো বিচার না করলেও চলে। শুদ্ধ মনে তত্ত্ব অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পায় কিন্তু সেরকম মন কজনের হয়? কাজেই সাধারণের পক্ষে বিচার ও শ্রদ্ধা বিশ্বাস দুই-ই দরকার।

জ্ঞানবাদী গুরু শিষ্যকে বললেন, 'তুমি ব্রহ্ম।' তার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হওয়া উচিত ছিল যে, 'আমি ব্রহ্ম'। যাকে 'শব্দাপরোক্ষ' বলে, শব্দের থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু হাজার বার শুনলেও তো হচ্ছে না। কাজেই প্রত্যক্ষ বোঝা যাচ্ছে যে শব্দের দ্বারা জ্ঞান হচ্ছে না। তার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, 'ব্রহ্ম' মানে কি বুঝছি না, 'আমি' মানে কি বুঝছি না, আর 'আমি ব্রহ্ম' এই দুই-এর অভেদ কি তাও বুঝছি না। তাই তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে না। আমাদের বুদ্ধি কলুষিত বলে এইরকম বিভ্রান্তি হচ্ছে। সুতরাং বলা হয় বুদ্ধিটি আগে শুদ্ধ মার্জিত করে তবে জানবার চেষ্টা করতে হবে। অনর্থক

তর্ক বিচারে লাভ হবে না। ত্রিবিধ তর্কের মধ্যে তাই 'বাদ'কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বাদ মানে তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য যে বিচার। তাই ভগবান গীতায় বলেছেন, 'বাদঃ প্রবদতাং অহম্'—যারা তর্ক করে তাদের মধ্যে আমি বাদরূপ। একদেশী ভাব, পূর্ব সংস্কারাচ্ছন্ন মন prejudiced mind নিয়ে বিচার হয় না। রাগ দ্বেষ আসক্তি বিমুক্ত শুদ্ধ মনে বিচার করলে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। মনকে রাগদ্বেষশূন্য করবার জন্য উপাসনা প্রার্থনাদি নানা উপায় আছে।

মনকে শুদ্ধ করবার উপায়

আর এই যে ঠাকুর মাঝে মাঝে বলছেন, আমাকে তোমার কি মনে হয়। কেউ বলে, অবতার। তুমি কি বল? এটি তার ভক্তের অবস্থা নির্ণয়ের একটি উপায়। কোনো কোনো ভক্তকে তিনি এরকম বলতেন। উদ্দেশ্য—তাঁর সম্পর্কে কতখানি ধারণা হয়েছে সেটি জানা। অন্য কাকেও বলেছেন, তুমি কি বল এর ভিতরে কতখানি প্রকাশ হয়েছে? বলা যায় তিনি তো দিব্য দৃষ্টি দিয়েই তা বুঝতে পারেন। কিন্তু ঠাকুরের জীবনে দেখা যায় তিনি একদিক দিয়ে বিচার করতেন না। কেবল দিব্য দৃষ্টি দিয়ে নয়, মনের গঠন, দেহের গঠন, আচার আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত করতেন। এ তাঁর একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সবগুলি একই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় কিনা দেখছেন। এখানেও প্রশ্ন করে দেখছেন সাধন পথে কতখানি উন্নতি হয়েছে। না হলে তাঁকে বড় বলবে, অবতার বলবে, তা শোনা উদ্দেশ্য নয়। তিনি তো বলেইছেন, অবতার কথায় ঘেন্না হয়ে গিয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অনেক অস্পষ্ট অদ্ভুত ধারণা আছে। বস্তুটি দুর্জ্ঞেয় বটে কিন্তু প্রহেলিকা নয়। 'তদেজতি তন্ন এজতি' তিনি গতিশীল, আবার তিনি স্থবিরও। তিনি কাছে আবার দূরে 'তদ্দূরে তদান্তিকে' এইরকম বিপরীত শব্দের দ্বারা অনেক

সময় উপনিষদে তত্ত্বকে বোঝাবার প্রয়াস দেখা যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপরীত ধারণাগুলিকে মন থেকে দূর করে দিয়ে আবর্জনা মুক্ত করা। মনে কত মলিনতা তা কি করে শুদ্ধ করতে হবে? না, ভগবান শুদ্ধ-স্বরূপ, তাঁর চিন্তা করে মনের অশুদ্ধিকে দূর করতে হবে। ভগবানের স্বরূপ আমাদের অগোচর। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, মহাপুরুষদের বাক্য থেকে সে সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা হয়, সেই ধারণাটি নিয়ে আমরা বিচার করব, চিন্তা করব, ধ্যান করব। করতে করতে আমাদের মনের জড়তা মলিনতা সব ধীরে ধীরে সরে যাবে। তখন সেই মনে ভগবানের স্বরূপ ফুটে উঠবে। উপনিষদে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ ১. ২. ২৪

—যে পাপাচরণ থেকে বিরত হয়নি, যার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়নি, যার মন ধ্যেয় বস্তুতে সমাহিত হয়নি, যার মনের সকল বৃত্তি শান্ত হয়নি, সে কেবল প্রজ্ঞানের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে লাভ করতে পারে না।

এইটিকে বুঝে নিলে বিভ্রান্তির আর অবকাশ থাকবে না। আমরা অনেক সময় অপরের সমালোচনায় মুখর হই। কিন্তু অপরের শুদ্ধির বিচার না করে নিজের বিচার করা বেশী দরকার আমি যে নিজেকে ভক্ত বা জ্ঞানী বলছি আমার আচরণ তদনুরূপ কি না। সাধনপথে আত্ম-বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রতিপদে বিচার করে দেখতে হবে আমার আচরণ আমার ভাবাদর্শের অনুরূপ কি না। হয়তো কোনদিন ভগবানের চিন্তা করে মনে একটু রোমাঞ্চ হল, কি শরীরে একটু কম্প শিহরণ হল অমনি আনন্দে বিভোর, একটু গর্বও বোধ করি আজ ধ্যানজপ খুব ভাল হয়েছে। এগুলো যে শরীরের ধর্ম, সবটাই সাধনার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এই কথাগুলিকে ভাবি না। চোখে অশ্রুবর্ষণ ভক্তির লক্ষণ নয়। অভিনেতারা ইচ্ছা করলেই অশ্রুবর্ষণ করতে পারেন এবং অভিনয় এখানে শুধু অন্যকে দেখাবার জন্যই নয় আত্মবঞ্চনাও হতে পারে। সুতরাং আত্মসমীক্ষার দ্বারা আমরা কোন স্তরে আছি বুঝে নিয়ে প্রবর্তকের মতো ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে।

দুই

২.২৪.১-৭

অবতারে মানবত্ব ও ঈশ্বরত্ব

এখানে ঠাকুরকে নিদ্রাভিভূত দেখে মাস্টারমশায় সবিস্ময়ে ভাবছেন এই মহাপুরুষও প্রাকৃত লোকের মতো ব্যবহার করছেন। সাধারণ লোকও এমনি ভাবে যে, যাঁকে ঈশ্বর বলছি তিনিও যদি প্রাকৃত লোকের মতো ব্যবহার করেন তাহলে এই ব্যবহারটা কি কেবল অভিনয়? আর যদি তা না হয় তাহলে তাঁর ঈশ্বরত্ব সে সময় কোথায় রইল? সাধারণভাবে এর মীমাংসা হওয়া কঠিন কারণ আমরা তাঁকে বুদ্ধির গোচরে আনতে পারি না সুতরাং প্রশ্নটা থেকেই যায় যে, ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি ঈশ্বর থাকেন কি না। পুরাণাদিতে বলা আছে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। তারপরে দৈত্য বিনাশাদির পর দেবতারা এসে বলছেন, আপনি ফিরে চলুন, আপনার অভাবে আপনার আসন শূন্য আছে। একদিকে বলা হচ্ছে ঈশ্বর পূর্ণ, সর্বব্যাপী—আবার বলা হচ্ছে, আপনার আসন শূন্য আছে। দুটি আপাতবিরোধী কথা। তবে সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে দেখলে মনে হয়

ঈশ্বর যখন অবতার হন, জীবধর্মকে স্বীকার করেন তখন তাঁর ভিতরে এই ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃতিও কখনও কখনও আসে। অবতারদের জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত আছে। ভাগবতে দেখা যায় ব্রহ্মার চাতুরীতে বাছুর হারিয়ে ভগবান প্রথমে ব্যাকুল হয়েছিলেন। পরে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখে প্রকৃত ঘটনা জানলেন। রামচন্দ্রও সীতাকে হারিয়ে শোকে আকুল হন, নানাদিকে চর পাঠালেন সীতার সন্ধানের জন্য। তিনি তো সহজেই জানতে পারতেন সীতা কোথায় আছেন। গীতাতেও আছে অর্জুন বলছেন, আপনি যা বলেছিলেন তা আবার বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি তখন যোগস্থ হয়ে বলেছিলাম—যা বলেছিলাম তা আমার মনে নেই। এ কেমন অদ্ভুত কথা। স্বয়ং ঈশ্বর যিনি তাঁর মনে নেই তাহলে কার মনে থাকবে? এ প্রশ্নের সমাধান এইভাবে হয় না। বিচার করে বুঝলে বোঝা যায় ঈশ্বর যিনি অবতারত্ব গ্রহণ করেছেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে জীবধর্মকে স্বীকার করেন। তবে তাঁকে ঈশ্বর বলি কেন? এইজন্য বলি তাঁর যখনই ইচ্ছা হয় তিনি তাঁর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাঁকে এজন্য চেষ্টা বা সাধনা করতে হয় না, স্বভাবত হয়। এইখানে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, অবতারের অবতারত্ব। সাধারণ মানুষ তার জীবধর্ম স্বেচ্ছায় বরণ করে না, কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ভোগ করে আর ঈশ্বর স্বেচ্ছায় জীবত্ব গ্রহণ করেন, এইটুকু পার্থক্য।

এখন, কি করে বুঝব তিনি এটি স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন? বুঝতে পারি যখন তাঁদের জীবন-চরিত আলোচনা করি। তখন দেখি কোনো সাধনা করবার আগেই তাঁর ভিতরে দেবস্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, কোনো কোনো গাছের আগে ফল তারপরে ফুল, যেমন লাউ কুমড়োর। অবতারের আগে জ্ঞান তারপর সাধনা। এই সহজ কথাটি সহজভাবে মেনে নিলে পরিষ্কার বোঝা যায়।

না হলে যুক্তি দিয়ে বুঝতে গেলে অনেক গোলমাল। ঈশ্বর যিনি তিনি কি আত্মবিস্মৃত হতে পারেন? আর আত্মবিস্মৃত না হলে তাঁর এই ব্যবহার কি করে আমরা স্বীকার করব? ভাগবতে বলা আছে —'মায়া মনুষ্যঃ হরি'—মায়ার দ্বারা তিনি মানবদেহ ধারণ করেছেন। এমন মায়া যে কখনও কখনও তাঁর স্বরূপকেও ভুলিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে অবতারের ভিতর জীবভাবও রয়েছে আবার পরমেশ্বরের স্বরূপও রয়েছে। এই দুটি বৈশিষ্ট্য থাকার জন্যই তাঁকে অবতার বলা হয়। কিন্তু এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান কি করে সম্ভব? সাধারণত যা সম্ভব নয় দৈবী-মায়ার দ্বারা সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়। বেদান্তীরাও বলেন, মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। রামচন্দ্র হতাশ হয়ে পড়েছেন, লক্ষ্মণ তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন—

'উৎসাহী বলবান্ আর্য নাস্ত্যুৎসোহাৎ পরমং বলম্'

—উৎসাহ থেকে বড় বল আর নেই। উৎসাহীরাই বলবান। রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান অথচ লক্ষ্মণ তাঁকে বোঝাচ্ছেন। অন্যত্রও আরও দৃষ্টান্ত আছে। দেখা যাচ্ছে অবতার তাঁর দেবত্ব সম্পর্কে সর্বদা অবহিত নন।

লীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে, তাঁর মানবভাবটি নিখুঁত মানবভাব, এবং সেটা অভিনয়ও নয়। অভিনেতা কখনও আত্মবিস্মৃত হয় না। অবতার কখনও কখনও সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত হন আর মানুষের এই বিস্মৃতিটাই স্থায়ী এবং স্বাভাবিক। মানুষ এবং অবতারের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য। আর যদি তিনি নিজ স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে তাঁকে অবতার না বলে ঈশ্বর বলা হত। অব মানে নীচে নেমে আসা। নিত্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তিনি জগৎকে ইচ্ছামত পরিচালিত করতে পারতেন, তবু নীচে নেমে এসে যে জীবোদ্ধার

কার্য করেন এটি তাঁর লীলা। নব নব রূপে আবির্ভূত হয়ে জগতের সঙ্গে এই আচরণ তাঁর নিত্যস্বরূপের, তাঁর আনন্দের একটা অভিব্যক্তি। বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতে, রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাছাড়া স্বীয় আচরণের দ্বারা জগৎকে দৃষ্টান্ত দেখাতে চাইছেন যে কতখানি আর্তি হলে ভক্ত ভগবানকে লাভ করে। একবার ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, তোমরা ভগবানকে যেমন করে ডাক সেভাবে কি তাঁকে পাওয়া যায়? তাঁকে পেতে হলে এইরকম করে ব্যাকুল হতে হয়; বলতে বলতেই তাঁর ভাব একেবারে বদলে গেল, আকুল হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভক্তেরা অবাক। এটা অভিনয় নয়। যখন তাঁর মনে সেইভাব এল, তাঁর দেহ মন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন আর উপদেষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ নন, তখন ভক্ত শ্রীরাম-কৃষ্ণ যিনি ভগবানের জন্য ব্যাকুল। এইরকম অবতারের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয় বহু বিচিত্র লীলা। কোনোটাই অভিনয় নয় সবই সত্য। আর এর ফলে লোকশিক্ষা হয়। তিনি যদি কেবল ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন যা চিরকালই আছেন তাহলে তাঁকে দিয়ে আমাদের কি কাজ হত? যখন তিনি অবতারত্ব গ্রহণ করেন তখন আমরা তাঁর জীবনাচরণ দেখে বুঝতে পারি ঈশ্বরকে পেতে হলে কি করতে হয়। ঠাকুর বলছেন, আমি যদি ষোল টাং করি তোরা এক টাং করবি। এই ষোল টাং তাঁকে দেখাতে হবে তবে অন্যরা তার থেকে কতকটা নেবে। তাই ঠাকুর বলেছেন, অবতারকেও সাধন করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-যন্ত্র নিয়ে তাঁর সাধন করেছিলেন। তাই অবতারকে ঈশ্বররূপেও দেখতে হয় মানবরূপেও দেখতে হয়। অবতার যেন সেতুরূপে কাজ করেন। মানুষের ইহকাল, পরকাল, অনিত্য আর নিত্য জগতের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য তাঁর অবতার হয়ে আসা। দুদিককে স্পর্শ

করে রয়েছেন তিনি, যখন যেমন ইচ্ছা সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। এই অবতার তত্ত্বকে বোঝা এইজন্য বড় কঠিন।

পরে বলছেন, 'কে জানে বাপু! আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষরাত্রে বড় কষ্ট হয়।' ব্যথায় কষ্ট হচ্ছে কি করে তা ভাল হয় অধীর হয়ে একে ওকে জিজ্ঞাসা করতেন, কি করে সারবে? যেন কিছুই জানেন না। আবার অন্যত্র আছে, ঠাকুরকে রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে একজন বলছেন এসব তাঁর অভিনয়, আত্মগোপন করা। অত যন্ত্রণার ভিতরেও ঠাকুর হঠাৎ হেসে ফেলে বললেন, 'শালা, ধরে ফেলেছে।' তার মানে এই যে তিনি এতেও আছেন, ওতেও আছেন। তিনি মানবরূপে আছেন এটা স্বাভাবিক, আমরা ধরতে পারি কিন্তু তাঁর সত্য স্বরূপকে যদি চিনতে পারি, তাহলে তাঁকে ধরে ফেলা হল। কাজেই কেউ ধরে ফেললে তিনি হাসেন। বহুরূপী যখন যে রূপ নেয় সে সেই ছদ্মবেশের অনুরূপই ব্যবহার করে। এর মধ্যে কেউ যদি চিনে ফেলে সে হেসে চলে যায়, আর তার বহুরূপ দেখান হল না।

আবার এরই মধ্যে ভক্তদের প্রতি ঠাকুরের করুণা, শুধু করুণা নয় স্নেহের ভাবও প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর মুখ শুকোচ্ছে বলে বাবুরাম জামরুল আনতে চাইলে ঠাকুর বলছেন, 'তোর আর রৌদ্রে গিয়ে কাজ নাই।' মাস্টার পাখা করছিলেন, তাঁকে বললেন, 'থাক, তুমি অনেকক্ষণ—' মাস্টার বললেন, 'আজ্ঞা, কষ্ট হচ্চে না।' ঠাকুর স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'হচ্চে না?' এইগুলি তাঁর অপরিসীম সন্তানপ্রীতির পরিচায়ক।

বলরাম বসুর অন্দরমহল থেকে ঠাকুরের জন্য মোহনভোগ করে পাঠান হয়েছে। ঠাকুর নরেন্দ্রকে বললেন, 'ওরে মাল এসেছে।' সকলে হেসে উঠলেন। এইভাবে সকলের সঙ্গে আনন্দ করতেন। আবার অপরাহ্ণে গিরিশের বাড়ি যাবার সময় পরিহাস করে বললেন, 'হ্যাগা, কি বলে? পরমহংসের ফৌজ আসছে?' ঠাকুর যেখানে যেতেন

ভক্তের দল সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। তাই অনেকে বলত, পরমহংসের দল আসছে প্যাঁক প্যাঁক। এগুলি বিদ্রূপ করে বলা। আগেও ভগবানের পার্ষদদের এমনি অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তোমরা ভেব না আমার কাছে এসেছ বলে সুখে থাকবে। যেখানে যাবে সেখানেই তোমাদের নির্যাতন ভোগ করতে হবে। তখন কি করবে? এক গ্রামে ওরকম হলে সেখান থেকে অন্যগ্রামে চলে যাবে। তাদের পূর্বাহ্নে প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। আমরা ভাবি ভগবানের নাম করলে তিনি আমাদের সুখে রাখবেন। এ তো ভগবানের সঙ্গে সর্ত-সাপেক্ষ একটা রফা করে নেওয়া। বাস্তবে তা হয় না কারণ সুখে হোক দুঃখে হোক যে তাঁকে ধরে থাকবে সেই যথার্থ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। একটি প্রচলিত কথা আছে—

'যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ
তবু যদি না ছাড়ে আশ তবে হই তার দাসের দাস।'

ভাগবতে বলছেন, শুধু দাস নয়, 'দাসস্য দাসস্য দাসস্য দাসঃ।' সুখের সময় বলব তাঁর কি কৃপা কিন্তু দুঃখে তিনি আর করুণাময় থাকেন না। কুন্তীর প্রার্থনাটি অতি সুন্দর। বলছেন, সুখের সময় তোমাকে ভুলে থাকি দুঃখে পড়লেই তোমাকে মনে পড়ে। তাই তুমি আমাকে দুঃখের পর দুঃখ দাও। দুঃখে থাকলে তাঁর অন্তরে ভগবানের স্মৃতি সদা জাগ্রত থাকবে। অবশ্য দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের জন্য যারা ভগবানকে চায় তারাও ভক্ত। তবে ভক্তের তারতম্য আছে। তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত সুখে দুঃখে ভগবানের প্রতি যাঁর পূর্ণ নির্ভরতা থাকে। ভাগবতে সর্বোত্তম ভক্তের সংজ্ঞা হল—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স
বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ১১. ২. ৫৩.

—ত্রিলোকের ঐশ্বর্যের কারণ উপস্থিত হলেও যাঁর মন দেবগণের অন্বেষণীয় ভগবানের চরণারবিন্দ থেকে লবনিমেষার্ধ কালের জন্যও বিচলিত হয় না, ভগবচ্চরণারবিন্দকেই যিনি সার বলে দৃঢ়নিশ্চয় করেছেন, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তিনি সুখে রাখবেন অথবা দুঃখ থেকে ত্রাণ করবেন বলে তাঁকে ডাকব এটা ব্যবসাদারী। তাঁকে ডাকব তিনি আমার আপনার বলে, আমার স্বস্বরূপ তিনি। ভগবান গীতাতেও চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন,

'উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।' (৭/১৮)

কারণ তাঁর মতে জ্ঞানী তাঁর আত্মা। ভগবান আমাদের আত্মা বলে তিনি স্বতঃপ্রিয়। এখানে জ্ঞানীর অর্থ কেবল জ্ঞানপথের পথিক নয়, ভগবানের স্বরূপে যে-ই নিজের সত্তাকে বিলীন করে দিয়েছে সে ভক্তিপথে গেলেও জ্ঞানী।

পরবর্তী পরিচ্ছদের ঘটনাস্থল গিরিশের বাড়ী। ঠাকুর গিরিশ আর মহিমাচরণের ভিতরে তর্ক বাধিয়ে দিচ্ছেন। লীলার পোষ্টাই-এর জন্য নারদ যেমন ঝগড়া বাধাতেন ঠাকুরও তেমনি তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ভাবাবলম্বী ভক্তদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতেন। তবে এখানে বিবাদ মানে বিচার। গিরিশ, মহিমাচরণ দুজনেই তার্কিক। গিরিশ বিশ্বাসী আর মহিমাচরণ বেদান্তী। তাই ঠাকুর তাদের বিচারে উৎসাহ দিচ্ছেন। রাম-চন্দ্র ভক্ত, তিনি আপত্তি জানিয়ে বলছেন, 'ওসব থাক—কীর্তন হোক।' ঠাকুর বলছেন, 'না, না; এর অনেক মানে আছে। এরা ইংলিশম্যান, এরা কি বলে দেখি।' মহিমাচরণের মত—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে। সাধন করতে পারলেই হল। গিরিশের মত, শ্রীকৃষ্ণ অবতার। মানুষ হাজার সাধন করলেও অবতারের মতো হতে পারবে না। মহিমাচরণ যুক্তির সাহায্যে বলছেন, মানুষের ভিতরে পূর্ণব্রহ্ম রয়েছেন কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। সাধনের দ্বারা প্রতিবন্ধক

অপসারিত হলেই ব্রহ্মস্বরূপ ফুটে উঠবে। খুব বিচারসহ, যুক্তিযুক্ত কথা। আবার গিরিশের যুক্তিও সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক। কারো ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হলে সে শ্রীকৃষ্ণই। মানুষ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে না, মানুষ মানবত্ব হারাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশ করছেন, ঠাকুর যাকে বলতেন, অবতার হল ভগবানেরই এক একটি নিত্য ছাঁচ। যখন কেউ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সেই ছাঁচে রূপান্তরিত করতে পারবে সে ঐ ছাঁচরূপই হবে। যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সত্তাকে নিজের ভিতরে প্রকাশিত করে সে কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নয়? মানুষ নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেবে যার সত্তায় সেই সত্তাই হল আসল। কথাটি খুব সুন্দর।

যখন বাইবেলের নানারকম সমালোচনা হচ্ছে প্রখর যুক্তিবাদী একদল বলছেন, যীশু বলে কেউ ছিল না। আর একদল বলছেন, তাহলে যীশুর ভাব ছিল। এঁরা বললেন, ভাব থাকতে পারে যীশু ছিল না। অন্যরা বলছেন, **It requires a Christ to conceive a Christ**—যদি যীশুর ভাবকে কেউ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে তবে সে যীশুই হয়ে যাবে। ভগবানের ভাবকে যে পরিপূর্ণরূপে নিজের ভিতর বিকশিত করতে পারবে সেই ভগবান হয়ে যাবে। গিরিশের যুক্তি এইরকম। এরপর মহিমাচরণ তাঁর বিচার বেশী দূর নিয়ে যেতে পারলেন না, গিরিশের কথায় একরকম সায় দিলেন। বললেন, বিভিন্ন পথ দিয়ে এক জায়গাতেই পৌঁছন যায়। ঠাকুর এখানেও গিরিশের প্রশংসা করে মহিমাচরণকে বললেন, 'আপনি দেখলে, ওর কি বিশ্বাস। জল খেতে ভুলে গেল।'

কীর্তনে অনুরাগপর্ব বা তীব্র ব্যাকুলতা

গিরিশের বাড়ীতে ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে কীর্তন হচ্ছে। ঠাকুর পূর্বরাগ পর্যায়ের গান শুনতে চাইলেন। বৈষ্ণব সাধকদের কাছেও মাথুর,

পূর্বরাগ প্রভৃতি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পদ বেশি প্রিয় ছিল। কারণ ঐসব পদে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার বিরহ ব্যাকুলতা ও মিলন আকুলতার মধ্যে তাঁরা ভগবানের জন্য ভক্ত হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। মিলনের আগে কৃষ্ণের নাম শুনে বা চিত্র দেখে রাধার মনে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে তাকে বলে পূর্বরাগ। আর কৃষ্ণ মথুরা যাবার পর গোপীদের সুতীব্র বিরহ-বেদনাকে অবলম্বন করে রচিত পদকে মাথুর বলা হয়।

শ্রীগৌরচন্দ্র বিষয়ক পদ গানও হচ্ছে। এই বিষয়ক কিছু পদকে গৌরচন্দ্রিকা বলে। রাধাকৃষ্ণলীলা রসাস্বাদনের অপরিহার্য ভূমিকা স্বরূপ কৃষ্ণ লীলাকীর্তনের আগে গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান করার রীতি আছে। এই সব পদে গৌরাঙ্গের জীবনের এমন ঘটনা বর্ণিত হয় যার মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলা আভাসিত হয়েছে। এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কৃষ্ণকাহিনী পৌরাণিক তা আমাদের কল্পনার বস্তু, কিন্তু মাত্র পাঁচশ বছর আগে চৈতন্যদেব আমাদেরই মতো দেহধারণ করে এসেছিলেন, ভক্ত সঙ্গে লীলা বিলাস করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তকবিদের বর্ণনায় তাঁর ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন রূপটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাই আমাদের কাছে ঐসব পদ এত হৃদয়গ্রাহী। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণলীলারস আস্বাদনের আগে গৌরাঙ্গলীলা শুনে ভক্তের মন ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। এইজন্য ভূমিকা অর্থে গৌরচন্দ্রিকা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এইরকম সব প্রেমভক্তিমূলক গান শুনতে শুনতে ঠাকুর মাঝে মাঝে ভাবে বিভোর হয়ে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। তারপর তিনি নিজেই সকলকে নিয়ে সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। ভাব উপশম হলে ঠাকুর বলছেন, 'কোন্ দিকে মুখ করে বসেছিলুম এখন মনে নাই।' জগৎ বোধটাই দূর হয়ে গিয়েছে, কাজেই মনে থাকবে কি করে? মানুষ যখন অন্তরে সেই আনন্দের স্বাদ পায় তখন তার আর সংসারের কথা মনে থাকে না। আনন্দেরও প্রকার আছে, মাত্রা আছে। গভীর আনন্দ যেখানে,

ছোটখাট আনন্দ সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, চুম্বক লোহাকে টানে এবং যদি একটা ছোট ও একটা বড়—দুটো চুম্বক থাকে, তাহলে কোনটা লোহাকে টানবে ? বড় চুম্বকই টানবে। ভগবান হচ্ছেন সবচেয়ে বড় চুম্বক। তাঁর আকর্ষণের সঙ্গে অন্য আকর্ষণের তুলনা হয় না। তাহলে আমরা বিষয়াসক্ত হই কেন ? তার কারণ তাঁর আকর্ষণ আমরা এখনও বোধ করছি না। ঠাকুর বলেছেন যে, ছুঁচ যদি কাদা মাখান থাকে তাহলে চুম্বক তাকে টানে না। কাদা হচ্ছে এই সংসারের মলিনতা। সংসার মানে টাকা-কড়ি, বাড়ীঘর, স্ত্রীপুত্রই নয়, সংসার হল মনের সংসার। মনে বিষয়াসক্তি যতক্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণ ভগবানের দিকে আমাদের মন যায় না। তবে একবার যদি সেই আনন্দের স্বাদ কেউ পায়, তাহলে বিষয়ানন্দ তাকে আর টানতে পারে না। মানুষের মন স্বভাবতই মলিন। তার উপর পরিবেশ তাকে মলিনতর করে তুলেছে। ছুঁচের উপরে ক্রমান্বয়ে মাটির প্রলেপ পড়ছে তাই ভগবানকে সে চায় না, ভগবানের আকর্ষণও বোধ করতে পারে না।

অনুরাগের উপায় বৈধীভক্তি বা কর্মযোগ

তাহলে কি করে এই বিষয়াসক্তি যাবে, ভগবানে আসক্তি হবে ? তার উত্তর হচ্ছে বৈধীভক্তির দ্বারা, যাকে ঠাকুর বলতেন বিধিবাদীয় ভক্তি। ভগবানের নাম করতে করতে ক্রমশ মলিনতা কাটবে। 'এই হরিনাম নিতে নিতে প্রেমের মুকুল ফুটবে চিতে।' নাম নিতে নিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ হবে, তখন নামীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে। এই হল প্রণালী, এই প্রণালীতে চলতে হবে। শাস্ত্র বলছেন, বৈধী ভক্তির দ্বারা ক্রমশ রাগাত্মিকা ভক্তি উৎপন্ন হবে। তখন সে সমস্ত বিধিকে অতিক্রম করে যাবে। শাস্ত্রে আছে ধ্যান জপ পূজা পাঠ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু তা করলেই ভগবানের কাছে পৌঁছন যাবে তা নয়, তবে চেষ্টা

করতে হবে। অন্তরাত্মারূপে অন্তরে থেকে ভগবান নিত্যই আমাদের আকর্ষণ করছেন। কিন্তু মন বাইরের কাজে, বাইরের আকর্ষণে এত মগ্ন যে তাঁর আকর্ষণ বোধ করতে পারে না। ভাগবতে এইজন্য বলছেন যে, অত্যন্ত বিষয়াসক্তের পক্ষে ভক্তিযোগ অনুকূল হয় না। ঠাকুর যে বদ্ধজীবের বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরকম। যেখানে ভগবানের কথা হয় বদ্ধজীব সেখান থেকে দূরে সরে যায়। ঠাকুর দেখেছেন তাঁর কাছে যে সব ভক্তেরা আসেন, তাদের ভিতরে হয়তো কিছু লোক সঙ্গীদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে এসে বসেছেন। ঠাকুর সৎপ্রসঙ্গ করে চলেছেন, তাঁদের ভাল লাগছে না। বারবার করে বলছেন, কখন যাবে? তবু সঙ্গীরা যাচ্ছে না দেখে বলছেন, তবে তোমরা কথাবার্তা কও আমরা নৌকায় গিয়ে বসি। প্রবল বিষয়াসক্তির জন্য ভগবানের কথা তাঁদের কাছে প্রীতিকর হয় না। যখন হয় তখনই সেইসব প্রসঙ্গ জীবনে কাজে লাগে। তাই ভাগবতে বলেছেন, অত্যন্ত বিষয়াসক্তের পক্ষে উপযোগী কর্মযোগ। তারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবে। তাই বা করবে কেন? করবে এইজন্য যে, শাস্ত্র আশ্বাস দিয়েছেন এইভাবে কর্ম করলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হবে। ঠাকুর বলছেন, কুমীরের পিঠে তলোয়ারের আঘাত করলেও তার লাগে না অথবা তপ্ত লোহায় জলের ছিটে দিলে মুহূর্তে জলটা উবে যায়। বিষয়াসক্ত মনেও তেমনি সৎপ্রসঙ্গ ফলপ্রসূ হয় না। তাই তাদের জন্য শাস্ত্রের অমোঘ উপদেশ এই যে, তুমি যা চাইছ তা লাভ করবার জন্য যাগযজ্ঞ, পূজা অর্চনা কর, করলেই ফল লাভ হবে। সম্পদলাভ কিংবা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার, এমন কি শত্রু বিনাশ করা—শাস্ত্রে তারও উপায় আছে, বিধিব্যবস্থা আছে।

বিস্মিত হতে হয় এই সব বিধিব্যবস্থাকে ধর্ম কি করে বলা যাবে? মানুষ ক্রূর, নিষ্ঠুর হয়ে অপরের বিনাশের জন্য উপায় খুঁজছে আর শাস্ত্র তাকে সেই উপায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন তখন সে শাস্ত্র তো কল্যাণকর হবে

না। কিন্তু শাস্ত্র কি কেবল কয়েকটি শুদ্ধ মনের জন্য ? না, সকলের জন্যই। তা না হলে অধিকাংশ লোকের উপরে উঠবার আর পথ থাকবে না। তাই শাস্ত্র সকলের জন্যই ব্যবস্থা করেছেন যার যা চাই। অনাবৃষ্টি, ফসল হচ্ছে না ? কারিরী যজ্ঞ কর, বৃষ্টি হবে। সন্তান নেই, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর সন্তান হবে। শত্রুবধের জন্যও শ্যেন যজ্ঞাদি আছে। মানুষ এগুলি করবে লাভের আশায়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে। শাস্ত্র কেবল সেই প্রবৃত্তিটাকে একটা শাস্ত্রীয় পথে পরিচালিত করবার জন্য বিধান দিচ্ছেন, এই কর, ঐ কর। সেই বিধানগুলি তার পক্ষে মঙ্গলকারী কেমন করে হবে ? হবে এইভাবে যে, শাস্ত্র বলছেন, এই যজ্ঞ করতে হলে তোমাকে খানিকটা সংযত হতে হবে। তখন সে খানিকটা সংযম অভ্যাস করতে বাধ্য হবে। ক্রমশ এই সংযম পুষ্ট হতে হতে মনের মলিনতা একটু একটু করে কাটবে তখন আর রাজার কাছে লাউ কুমড়ো চাইবার নির্বুদ্ধিতা হবে না। এই হল ভগবানের দিকে মানুষকে প্রবর্তিত করবার প্রণালী।

এখন যার মন লাউ কুমড়োর জন্য ব্যাকুল সে লাউ কুমড়ো চাইবেই তবে তাকে বোঝাতে হবে তিনি কল্পতরু, এর চেয়ে বড় ঐশ্বর্য চাইলেও পেতে পার। তখন সে তাই চাইবে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ মানলে তা পাবেও। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি জিনিস আসবে। তা হল ক্রমশ তার মনের শুদ্ধি। তখন একসময় মনে হবে, আমি এর চেয়ে আরও বড় জিনিস চাইলে পেতাম, কেন চাইলাম না ? ভাগবতে তিনরকম যোগের কথা বলেছেন—জ্ঞান, ভক্তি আর কর্মযোগ।

'নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনাম্ ইহকর্মসু
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ যাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥'

ভাগবতম্ ১১. ২০. ৭

—যাঁরা অত্যন্ত বিষয় বিরাগী এবং সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করেছেন তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগের বিধান। সে অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানযোগে অধিকার হয় না। অত্যন্ত বিষয়াসক্তের জন্য কর্মযোগের বিধান আছে। এই এই কর্ম করলে তাঁদের অভীপ্সিত ফল লাভ করবেন। আর যাঁরা উভয়ের মধ্যবর্তী যাঁদের মন অতিরিক্ত বিষয়াসক্তও নয় আবার বৈরাগ্যও প্রবল হয়নি, কেবল ভগবানের কথায় একটু শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে তাঁদের জন্য ভক্তিযোগ। এঁরাই সংখ্যায় বেশী।

শাস্ত্র এইভাবে অধিকারী হিসাবে পথনির্দেশ করেছেন, এ কথাও বলেছেন, অনধিকারীকে উপদেশ করে কোন লাভ নেই। 'নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রুয়াৎ,—জিজ্ঞাসা না করলে ধর্ম সম্বন্ধে কাকেও বলবে না কারণ, তা তার কাজে লাগবে না।

ভোগপ্রবণতা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাতে দোষের কিছু নেই—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ মনুস্মৃতি ৫. ৫৬

—এ সব মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এগুলোকে দোষের বলে তাদের আরও দুর্বল করে দিও না। তবে এটুকু বলা যেতে পারে 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—যদি নিবৃত্তিতে যেতে পার তবে তা মহাফলদায়ক। এর বেশী উপদেশ দিলে সে শুনবে না। ঠাকুরও তাই বলেছেন, বিষয় বাসনা যার প্রবল দেখি তাকে কিছু বলি না। মা মুখ বন্ধ করে দেয়।

যারা ধর্মপথে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি তারাও বেশীর ভাগ নিজেদের কামনা পূরণ করবার জন্য ভগবানকে ডাকছে। নিষ্কাম ভাবে তাঁকে কজন ডাকছে? তাই শাস্ত্রে সকাম কর্মের কথা আছে। এইসব কর্মের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনের শুদ্ধি আসে যেমন ধ্রুবের জীবনে এসেছিল। বিমাতার দ্বারা অপমানিত পিতৃক্রোড়বঞ্চিত বালক ধ্রুবের

অভিমানে আঘাত লেগেছে। জননীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর কোন প্রতিকার আছে কি না। মা বললেন, বাবা, মধুসূদনকে ডাক। ধ্রুব ভগবানকে ডাকবার জন্য মাত্র পাঁচ বছর তপস্যা করতে চলে গেলেন। তাঁর আন্তরিক আহ্বানে ভগবান তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ধ্রুব কি বর চাও? ধ্রুব বললেন, কিছু চাই না, তোমাকেই চাই। তাঁর তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল, সুবিস্তৃত রাজ্য লাভ কিন্তু এখন তা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর। কেন? না, আমি কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে কাঞ্চন পেয়েছি—

'স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে'—(হরিভক্তি সুধোদয় ৭. ২৮) প্রভু আমি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি আর কোনো বর চাই না।

ধ্রুবের এই অনুভূতি ভক্তদেরও হবে, যদি তাঁরা ভগবানকে ডাকতে ডাকতে মনের শুদ্ধি আনতে পারেন। এই কারণেই বেদে সকাম কর্মের স্থান রয়েছে। সকাম কর্ম ক্রমে নিষ্কাম কর্মে নিয়ে যায়। প্রথমে আমরা যখন ভগবানকে ডাকি তার ভিতরে তেমন আন্তরিকতা থাকে না, কারণ মন কামনা বাসনায় আসক্ত হয়ে আছে। ভগবানের ভক্ত যাঁরা তাঁদের কথা চিন্তা করতে করতে, তাঁদের ব্যবহার দেখতে দেখতে আমাদের মনে সেই অনুরাগের ছোঁয়াচ লাগে। মন্দভাব যেমন সংক্রামক উচ্চভাবও তেমনি সংক্রামক। এইজন্য ঠাকুর বার বার সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন। ভগবানের ভক্ত যিনি তিনিই সাধু। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধুর পদধূলির স্পর্শে পবিত্র হতে চেয়েছেন। তিনি নিজের জীবনে আচরণ করে দেখাচ্ছেন যে সাধুসঙ্গ কত পবিত্র, কল্যাণকর। এখানে ঠাকুর শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন, এই ভাবগুলি আরোপ করতে হয়। রাধা সকল ভক্তের আদর্শ।

ধর্মজীবনের প্রকৃত সূচনা অনুরাগ দিয়ে

অতএব দেখা গেল বৈধী ভক্তির ভিতর দিয়ে রাগাত্মিকা ভক্তি আসবে। সেই ভক্তি হলে তবে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ঠিক ঠিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন, তখন সাধনার আরম্ভ হল তার আগে সাধনা কোথায়? মনের ঘসামাজা করতেই সময় কেটেছে, আরম্ভ তখনও হয় নি। যখন ভগবানরূপ বস্তুকে ভাল লাগবে তখন ভগবানের পথে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হবে এবং তখনই ধর্মজীবনের প্রকৃত সূচনা। সে পথেও যে কত বাধা তা গোপীদের জীবনে আমরা দেখেছি। ভগবানের আহ্বান এসেছে তাঁরা লোকনিন্দার ভয়ে বাড়ী থেকে বেরোতে পারছেন না, কতরকমের আরও কত বাধা—সংসারের প্রতি কর্তব্য, সন্তান পালনের দায়িত্ব, পতিসেবা—এ সবগুলিই হল বাধা। এগুলি অপ্রয়োজনীয় নয়। আমরা যে সব কর্তব্য করি, সে কর্তব্যগুলি হচ্ছে সাধকের জীবনের প্রথম পাঠ। এগুলি করতে করতে মনের শুদ্ধি হবে। ভগবান বলছেন, নিজের নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করে সাধকরা সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু এই কর্তব্য যদি আমাদের কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসে তাহলে ভগবানের দিকে যাওয়া আর হবে না, কর্তব্যের বেড়াজালের ভিতরেই আটকে থাকতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যাবন্দনাদি করতে হয়, কিন্তু কতদিন? যতদিন না তাঁর নামে চোখে জল আসে, তাঁর প্রতি অনুরাগ আসে ততদিন।

কর্তব্যকর্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর ঈশানকে বলেছিলেন, অনেকদিন তো করলে আর কত করবে? ভগবানের জন্য যদি কেউ পাগল হয় তার আর কোন কর্তব্য থাকে না। ঠাকুর বলছেন, পাগলের জন্য কোনো আইন নেই। একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ বিবেকচূড়ামণি ২৭০

—প্রথম হচ্ছে দেহের অনুবর্তন—দেহ ভোগ সুখ চায়। কিসে দেহ সুন্দর হয়ে উঠবে এই জন্য আমরা যে চেষ্টা করছি, এটা হচ্ছে দেহের অনুবর্তন, দেহের দাসত্ব করা, সেটি ত্যাগ করতে হবে। তারপরের কথা শাস্ত্রানুবর্তন। শাস্ত্র বলছেন, এই করবে, এই করবে না। তদনুসারে চলতে হবে—একে বলে শাস্ত্রের দাসত্ব। প্রথম দিকে এতে খানিকটা কল্যাণ হলেও পরে শাস্ত্রের বিধি নিয়মে আমরা বদ্ধ হয়ে যাই। শাস্ত্র সাধনার একটা ধাপ মাত্র, আমরা শাস্ত্রের দাস নই সুতরাং এও ত্যাগ করতে হবে। তার পরেও আছে লোকানুবর্তন অর্থাৎ লোকে কি বলবে ভেবে লোকের মতানুসারে চলবার চেষ্টা। এই লোকানুবর্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও দাসের মতো করে ফেলে। ঠাকুর বলছেন, আমি এত বড় লোক, আমি যদি হরি হরি করে নাচি তবে লোকে কি বলবে ? এই হল লোকানুবর্তন।

গোপীরা রাসের সময় বনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়েছেন। তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা করে বললেন, 'স্বাগতং ভো মহাভাগা'। তোমরা মহাভাগ্যবতী এখানে এসেছ, আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি, কি করলে তোমাদের আনন্দ হবে বল। তারপরে বলছেন, তোমরা রাত্রিকালে এই গভীর অরণ্যে এসেছ চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদ, অত্যন্ত বিপদসংকুল জায়গা। এখানে তোমাদের থাকা উচিত নয়, শীঘ্র বাড়ী ফিরে যাও। সেখানে তোমাদের বহুবিধ কর্তব্য রয়েছে সেগুলি না করলে তোমরা ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হবে। তাঁরা গেলেন না। কর্তব্যও একসময়ে বাধাস্বরূপ হয়। তাই কর্তব্যকেও পরিত্যাগ করতে হবে। গীতায় বলছেন—

'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' (গীতা ১৮।৬৬) সর্বধর্ম অর্থাৎ দেহধর্ম, শাস্ত্রধর্ম, লোকধর্ম এইসব নিঃশেষে পরিত্যাগ করতে হবে। ভগবানের জন্য উন্মাদনা যখন আসে তখনই এটি সম্ভব হয়,

তার আগে অবধি নয়। তার আগে কর্তব্য করতে হয়। যেমন ঠাকুর প্রতাপ সম্পর্কে বলছেন, দেশে মা ছেলেমেয়ে স্ত্রী না খেতে পেয়ে মরছে আর উনি এখানে বসে ধর্ম করছেন! বাড়ী গিয়ে মায়ের সেবা করতে, স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণের চেষ্টা করতে ঠাকুর হাজরাকে কতবার বলেছেন। স্বামীজী তার পক্ষ হয়ে বলেছেন, বৈরাগ্যবান হয়ে ও এখানে এসেছে, আপনি কেন যেতে বলছেন? ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, এরকম করে ধর্ম হবে না। অন্যত্র আছে, গিরিশ বললেন, 'দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন।' ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে এত অসুস্থ যে কথা বলতে কষ্ট হয়। নিজের মুখে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, পরিবারের খাওয়া-দাওয়া কিরূপে হবে—তাদের কিসে চলবে? আবার সেই ঠাকুরই স্বামীজীকে সব কর্তব্য ত্যাগ করে সংসার ছাড়বার উপদেশ দিচ্ছেন। স্বামীজীর মা, ছোট ছোট ভাইবোনেরা তাঁরই উপর নির্ভরশীল। তবু স্বামীজীকে তিনি ঐভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন। অধিকারী ভেদে কাকেও ত্যাগ-নিবৃত্তির পথে আবার কাকেও সংসারে কর্তব্যাদি করে যাবার উপদেশ দিচ্ছেন। একই উপদেশ সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা না এলে ধর্মকর্মের দোহাই দিয়ে কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থাকা চলে না। কিন্তু যখন তাঁরই জন্য পাগল হই তখন আমাদের শাস্ত্রানুসরণ বা কর্তব্যাদি থাকে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মাস্টারমশায় ঠাকুরের কাছে যখন প্রথম এসেছেন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে অন্যমনস্ক দেখে ভাবছেন, ইনি বোধহয় এখন সন্ধ্যা করবেন। ঠাকুরের মন তখন স্বভাবত অন্তর্মুখ, সন্ধ্যা করবার আর প্রয়োজন হয় না। তবে অন্তর্মুখ করবার প্রাথমিক উপায় হিসাবে সন্ধ্যা বন্দনাদি শাস্ত্রের বিধান-গুলি মানতে হয়। সংসারের কর্তব্যগুলিও ঠিক ঠিক করতে হয়। তারপর তার উপরে উঠলে আর কোনো কর্তব্য থাকে না।

অনেক সময় আমরা দুঃখ করি, বলি, সংসারে কর্তব্যের এত বোঝা

আর পেরে উঠছি না, ভগবানকে কখন ডাকব? কর্তব্য বহুবিধ —বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান প্রভৃতির প্রতি পারস্পরিক কর্তব্য, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজের প্রতি কর্তব্য—কর্তব্যের আর শেষ নেই। তাহলে? মনে একটা সংশয় আসে। কিন্তু বিচার করতে হবে, কর্তব্য করা আমাদের উদ্দেশ্য, না উপায়? আসলে ভগবানের জন্য মন যখন এত ব্যাকুল হবে যে আর কিছুতেই অন্যদিকে মন যাবে না তখনই সমস্ত কর্তব্য এড়িয়ে ভগবানকে ডাকার, দেহধর্ম, শাস্ত্রবিধি, লোকমতের দাসত্ব অতিক্রম করে তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার সময় এসেছে বুঝতে হবে। ভাগবতে সে কথা আছে, এখানে এই কীর্তনের ভিতরেও সেই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। অরুণোদয় হলে আর ভাবনা নেই অচিরে সূর্য উঠবে, ঠাকুর একথা বার বার বলেছেন।

তবে যতদিন না মন সর্বধর্ম পরিত্যাগ করবার উপযোগী হচ্ছে ততদিন সব কর্তব্য করতে হবে। দেহকে সুস্থ সবল রাখতে হবে, শাস্ত্রীয় বিধানকেও মেনে চলতে হবে, আবার আত্মীয় পরিজন সমাজের প্রতি কর্তব্যও যথাসাধ্য করতে হবে। কিন্তু জানব এগুলি উপরে উঠবার উপায়, সিঁড়ির এক একটি ধাপ। শাস্ত্রে আছে, 'ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্‌বা বনাদ্‌বা···যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। (জাবাল উ.)—আগে ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ, তারপর সন্ন্যাস করবে। আর যদি মনে তীব্র বৈরাগ্য আসে তাহলে ব্রহ্মচর্য থেকেই সন্ন্যাস নেবে অথবা গার্হস্থ্য থেকে সন্ন্যাসী কিংবা বানপ্রস্থ থেকে সন্ন্যাসী হবে। পরে জোর দিয়ে বলছেন, 'যদি বা ইতরথা'—যেদিন মনে বৈরাগ্য আসবে সেইদিনই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চলে যাবে। শাস্ত্র একদিকে বলছেন, 'যাবৎ জীবম্ অগ্নিহোত্রম্ জুহুয়াৎ'—যতদিন বেঁচে থাকবে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান কর। কিন্তু এও

বলছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। আন্তরিক বৈরাগ্য যেদিন আসবে সেইদিনই তুমি মুক্ত, শাস্ত্রের এই মর্মটুকু আমরা যেন না ভুলি।

এখানে হাজরার প্রসঙ্গ আবার উঠেছে। হাজরার মা, হাজরার জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধপ্রায়। ঠাকুরকে খবর পাঠিয়েছিলেন হাজরাকে দেশে পাঠাবার জন্য। ঠাকুর বলছেন, 'আমি হাজরাকে অনেক করে বললুম, বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এস ; তা কোন মতে গেল না। তার মা শেষে কেঁদে কেঁদে মরে গেল।' হাজরার আরও কয়েকটি আচরণ উল্লেখ করে ঠাকুর বললেন, যে বৈরাগ্যবান হবে সে বিনয়ী হবে। সে কারো সঙ্গে ব্যবহারে তার নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে যাবে না। যেমন বৈষ্ণব ধর্মে বলছেন,

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ শ্রীমুখশিক্ষা শ্লোক ৩২

—ভগবানের নাম করছি অথচ যশমানের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, গর্ব অহঙ্কার আছে, এসব থাকলে নামের ফল হয় না। এগুলির দ্বারা তাঁর নামের শক্তি যা তা নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য ঠাকুর বার বার করে এইসব বলছেন।

তারপরে বলছেন, 'বেঁটে, ও ডোব কাটা কাটা গা, ভাল লক্ষণ নয়। অনেক দেরীতে জ্ঞান হয়।' শারীরিক লক্ষণগুলি দেখে বিচার—এটি ঠাকুরের ভূয়োদর্শনের ফলই বলতে হবে। তবে এসব অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিতে হবে তা বলেননি। বলছেন, এইসব বাহ্য লক্ষণগুলি তাদের জ্ঞানলাভের পক্ষে খানিকটা প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে হলে তাকে আরও বেশী করে সাধন করতে হয়। তাই তা বেশী সময়সাপেক্ষ। এমন কি, তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতম স্বামী সারদানন্দের চোখ একটু ট্যারা দেখে ঠাকুর আশঙ্কিত হয়েছিলেন।

জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করলেন, মা, ওর দোষ কাটিয়ে দাও। কি দোষ ছিল তা আমরা বুঝব না। অনেক সময় হাতটা ওজন করে দেখে বলতেন, যে সরল তার হাত হালকা হয়। কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ দিয়েও অনেক সময় তিনি ভক্তদের বুঝতেন। নানাভাবে ভক্তদের পরখ করে নিশ্চিত হতেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে কোনো ভুল নেই। এখানে স্বামীজীকে বলছেন, 'তুই নাকি লোক চিনিস্, তাই তোকে বলছি।' তার কারণ স্বামীজীকে তাঁর তৈরী করতে হবে, লোক চেনা শেখাতে হবে।

বলছেন, বিশেষ কথা এইটি, 'আমি জানি যেমন সাধুরূপী নারায়ণ, তেমনি ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ!' সকলের ভিতরে নারায়ণ তা বলে সকলের ব্যবহার একরকম নয়। প্রশ্ন ওঠে সবই যদি নারায়ণ হয় তবে ব্যবহার এত খারাপ হয় কেন? তার উত্তরে প্রথম কথা হচ্ছে যে, এ ভগবানের খেলা। তিনি যদি শুধু ভাল হয়েই খেলতেন তাহলে এই জগতে তাঁর খেলার চিত্রটা পরিপূর্ণ হোত না। একটি মাত্র রং দিয়ে ছবি আঁকলে ছবি ভাল ফোটে না। লীলার জন্য ভগবানকেও বিচিত্র রূপ ধারণ করতে হয়। তবে বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়ে তাঁর সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না, কলুষিত হয় না। উপনিষদে বলেছেন,

'সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ কঠ ২.২.১১

একই আলো দিয়ে তিনি জগৎকে প্রকাশিত করছেন। এই প্রকাশ্য বস্তুর তারতম্য অনুসারে সূর্যের তারতম্য কিছু হয় না। ঠিক সেইরকম আত্মা বিভিন্ন বস্তুর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন কিন্তু সেই বস্তু-ধর্মগুলি আত্মাকে পরিবর্তিত করছে না। যেমন একটি বহুমূল্য মুক্তা যদি

আস্তাকুঁড়েও পড়ে থাকে তবে মূল্যের কোন হ্রাস হয় না। কিংবা বিভিন্ন রঙ-এর কাচের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন রঙের আলো বেরোলেও আলোটা সেই রঙের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে যায় না। সেইরকম এক তত্ত্ব সর্বত্র প্রকাশিত থাকলেও যে বিভিন্ন বস্তুর ভিতরে তিনি প্রকাশিত সেই বস্তুর ধর্মগুলি তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না। তিনি সর্বধর্মের বাইরে। এইটি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন। তারা আধেয় বস্তুটিকে আধারগুলি থেকে ভিন্নরূপে বুঝতে পারে না। যেমন নানা রঙ-এর কাচের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত আলোকে আমরা কাচগুলি থেকে ভিন্নরূপে বুঝতে পারি, কারণ আলোকে কাচ থেকে সরিয়ে আলাদা করে দেখতে পারি। কিন্তু আত্মাকে আমরা কখন সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক করে তো দেখিনি। আত্মা বিভিন্ন বস্তুধর্মের দ্বারা যে প্রভাবিত হন না তা আমরা বুঝতে পারি না। আর পারি না বলেই আমরা মানুষের ভিতরে ভালমন্দ উচ্চ নীচ বিভেদ করছি। মানুষ থেকে ইতর প্রাণীকে পৃথক করে তাদের ভিতরে সত্তা বা চৈতন্যের পার্থক্য কল্পনা করছি। যে চৈতন্য বস্তুধর্মের অতীত তাকে আমরা বুঝতে পারি না বলে আমাদের এই বিভ্রম ঘটছে। সাধনের পথে আমরা মনকে যখন মন্দ থেকে মুক্ত করে তাকে শুদ্ধ পবিত্র করবার চেষ্টা করছি, তখন অশুদ্ধগুলি না দেখে শুদ্ধিগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। তাই ভগবানকে অশেষ-কল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিলহেয়গুণবর্জিত রূপে কল্পনা করছি। কিন্তু হেয় গুণগুলি যদি তাঁর ভিতরে না থাকত অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে তিনি যদি সেই গুণগুলির ভিতর না থাকতেন তাহলে গুণগুলির প্রকাশ হত না। যেমন, ভালমন্দ দৃশ্যের উপরে যদি সূর্যের আলোক-পাত না হোত, তাহলে ভাল-মন্দ দৃশ্যগুলি প্রকাশিত হোত না। কিন্তু যে ভক্ত সাধনা করতে আরম্ভ করেছেন তিনি ভাবতে থাকেন যে, ভগবান কেবল শুদ্ধ পবিত্র কারণ মনকে শুদ্ধ করবার জন্য এরূপ

ভাবার প্রয়োজন। এইরকম মনে করতে করতে মনের শুদ্ধি হবে সেই শুদ্ধ মন দিয়ে ভক্ত ভগবানের স্বরূপ ধারণা করতে পারবে আর তখনই সে ভাল মন্দের পারে যাবে। অর্থাৎ দেখবে ভাল-মন্দ দুই-ই এক পর্যায়ের কারণ সকলেই সেই ভগবৎ সত্তাতে সত্তাবান।

(এখন আমরা বলি যার মন শুদ্ধ সে কখনও ভাল ছাড়া মন্দ দেখে না। কিন্তু মন্দ যেখানে আছে সেখানে মন্দ দেখবে না? কালো রঙকে কালো না দেখে যদি কেউ সাদা দেখে সেটা তার দৃষ্টির বিভ্রম। ঠাকুর নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, কোনো জল খাওয়া যায়, কোনো জলে বাসন মাজা যায়, আবার কোন জল ছোঁয়াই যায় না। জলকে নারায়ণ বলা হয়েছে, এগুলি সেই এক নারায়ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ। যখন আমাদের দৃষ্টি খুব উঁচু সুরে বাঁধা হবে তখন ভাল দেখে মন প্রসন্ন আর মন্দ দেখে মন অপ্রসন্ন হবে সেই ভাবটি আর থাকবে না। এ দৃষ্টি তখনই আসে যখন মন শুদ্ধ হয়, রাগদ্বেষশূন্য হয়।)

প্রেমাভক্তি

এবার অন্য প্রসঙ্গ হচ্ছে। গিরিশ প্রশ্ন করছেন, 'একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে?' শ্রীরামকৃষ্ণ—'একাঙ্গী, কি না, ভালবাসা একদিক থেকে। যেমন জল হাঁসকে চাচ্ছে না কিন্তু হাঁস জলকে ভালবাসে। আবার আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা।' একাঙ্গী প্রেম মানে এক-তরফা ভালবাসা। ভক্ত যখন ভগবানকে শুধুই ভালবাসে, প্রতিদানে কিছু চায় না তখন তাকে বলে একাঙ্গী প্রেম। বৈষ্ণব শাস্ত্রে রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। 'সাধারণী প্রেম নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব।' সাধারণ মানুষের ভক্তি এইরকম। যা চাইব তিনি তা দেবেন এইজন্য ভগবানকে ভালবাসা। সাধারণ লোকের কাছে তিনি উদ্দেশ্য নন উপায় মাত্র।

আর সমঞ্জসা হল পারস্পরিক। আমি ভগবানকে ভালবাসি প্রতি-দানে আমি চাই ভগবানও আমায় ভালবাসুন। ঠাকুর বলছেন, 'এ খুব ভাল অবস্থা।' তবে সমর্থা হল শ্রেষ্ঠ। যেখানে আমি কেবল ভগবানকে ভালবাসি তিনি আমাকে ভালবাসেন কিনা সে আমার প্রশ্ন নয়। 'যেমন শ্রীমতীর, কৃষ্ণ সুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক। গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব'। একজায়গায় শ্রীরাধা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যান তাতে আমার কিছু ক্ষোভ নেই কিন্তু দুঃখ এজন্য যে চন্দ্রাবলী ভগবানের সেবা করতে জানে না।

ঠাকুর বলছেন, তিন প্রকারের ভালবাসার মধ্যে 'সকলের উচ্চ অবস্থা সমর্থা'। এভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীমতী। গীতাতেও ভগবান চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

তারপরে একজন ভক্তের প্রশ্ন—'মহাশয়। অন্তরঙ্গ কাকে বলে?' ঠাকুর সহজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের থাম, বাইরের থাম। যারা সর্বদা কাছে থাকে তারাই অন্তরঙ্গ।' ভাগবতে বিভিন্ন প্রকার মুক্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণান্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৩. ২৯. ১৩.

সালোক্য একলোকে তাঁর সঙ্গে বাস, এ বাইরের থাম। সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য, এও বাইরের জিনিস। সারূপ্য—ভগবানের মতো রূপ। সামীপ্য হল ভগবানের কাছে থাকা, তাঁর অন্তরঙ্গ হওয়া। আর একটি হল একত্ব। একত্ব বলতে ভক্তিশাস্ত্রে আছে, ভগবানের অঙ্গ হয়ে থাকা। তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত এটা বোঝাবার জন্য বলা হয় তাঁর অঙ্গ। একত্বে সম্পর্কে জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ভক্ত তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে, তাঁর অঙ্গ হয়েও তাঁকে আস্বাদন করতে চান। জ্ঞানীর একত্ব হল কৈবল্য—যেখানে এক বই আর কোন তত্ত্ব থাকবে না।

ঠাকুরের জ্ঞানাবস্থা

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চা করেন তাই মহিমাচরণকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বলেছেন, 'কিন্তু জ্ঞানী রূপও চায় না, অবতারও চায় না।' অবতারও তো রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হবেন তাই তাঁরা অবতারও চান না।

ঋষিরা রামকে বললেন, 'আমরা তোমাকে জানি দশরথের বেটা,' ভরদ্বাজাদির মতো অবতার বলি না। 'আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করি। রাম প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন।' প্রসন্নতার কারণ, ঋষিরা যে সচ্চিদানন্দের চিন্তা করেন তিনিই তো সেই সচ্চিদানন্দ। সুতরাং তাঁরা তাঁরই চিন্তা করেন, তাঁরাও ভক্ত কেবল সাকার নয়, নিরাকার রূপে চিন্তা করছেন। অব্যক্তের চিন্তা করেও তাঁকেই পাওয়া যায়। গীতায় বলেছেন, 'অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥' (১২।৫) দেহধারী (মানুষ) অনেক ক্লেশকর সাধনার দ্বারা নির্গুণ বিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করে থাকেন। অপেক্ষাকৃত সহজ সরল উপায় হচ্ছে সাকার বা সগুণরূপে তাঁকে চিন্তা করা। যাঁরা তাঁকে অব্যক্ত রূপে চিন্তা করেন তাঁরা তাঁরই চিন্তা করেন তবে পথটি অত্যন্ত কঠিন। তাই 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্॥' (১২।৫) আমাদের সীমিত মন সীমিত বস্তুকে চিন্তা করতে পারে, অরূপের ধারণা করতে পারে না। এইজন্য এই অব্যক্তগতি অতিশয় কষ্টকর, দেহাভিমান থাকতে সহজে লাভ হয় না।

তারপরেই বলছেন, 'উঃ আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত! এমন কতদিন! সব ভক্তি ভক্ত ত্যাগ করলুম। জড় হলুম।' অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত, নিশ্চেষ্ট হলেন। 'দেখলুম, মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়! রামলালের খুড়ীকে ডাক্‌ব মনে করলুম!' কেন? না, যদি মনটাকে নামান যায়, যাতে দেহবুদ্ধি আসে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন। 'ঘরে ছবিটবি যা ছিল, সব সরিয়ে ফেলতে বললুম।'

মন তখন আর কোন সীমিত রূপ চায় না। 'আবার হুঁশ যখন আসে, তখন মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে।' এরকম হবার কারণ, অরূপে স্থিতিটাই এত স্বাভাবিক মনে হয় যে তার থেকে নীচে নেমে আসলে কষ্ট বোধ হতে থাকে। যেমন আমাদের কাছে বাতাসের অস্তিত্ব স্বাভাবিক, নিবাত স্থানে আমাদের প্রাণ আটুপাটু করে, জল থেকে তুললে মাছের যেমন হয়। সেরকম অখণ্ডে অভ্যস্ত মন যখন এই খণ্ড সীমিত রাজ্যে আসে তখন সে সেইরকম আটুপাটু করে, দ্বৈত রাজ্যে নামতে চায় না। তাহলে ব্যবহার কি করে সম্ভব হবে? 'শেষে ভাবতে লাগলুম তবে কি নিয়ে থাকবো। তখন ভক্তি ভক্তের উপর মন এল।' ভক্তের ভিতর ভগবানের স্বরূপকে অনেকটা প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায় বলে সেই সূত্র ধরে নেমে আসা সম্ভব হয়। ঠাকুর যখন সমাধিস্থ হতেন তখন যে ভাবে সমাধিস্থ হতেন সেই ভাবের নাম তাঁর কানে শোনাতে শোনাতে তিনি নেমে আসতেন। কারণ একই। বাইরের সেই নাম শুনতে শুনতে বাহ্যিক দৃষ্টি, বাহ্য জ্ঞান একটু একটু করে ফিরে আসে। 'তখন লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগলুম যে, এ আমার কি হল!' অর্থাৎ আমি আবার এই সমাধি অবস্থা ছেড়ে সাধারণ ভক্তদের ভালবাসার ভিতরে নেমে এলাম কেন? ভোলানাথ বললে, ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোক যখন সমাধি থেকে ফিরবে, তখন কি নিয়ে থাকবে? কাজেই ভক্তি-ভক্ত চাই। তা না হলে মন দাঁড়ায় কোথায়?' তাই ভক্তি-ভক্ত অবলম্বন করে তাঁর মনকে নামাতে হয়।

ঠাকুরের মনকে নামাতে হোত কারণ তিনি বিশেষ অধিকার নিয়ে এসেছেন। জগৎ উদ্ধার কার্য তাঁকে করতে হবে, দেহধারণের তাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাহ্য জগতে ব্যবহার করতে হবে। এইজন্য ভক্ত বা ভক্তি, একটি কোন সূত্র ধরে তাঁকে নামতে হোত।

যাঁদের মনের এরকম উচ্চ স্তরে অবস্থান স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে এ কেবল তাঁদের পক্ষেই প্রযোজ্য অপরের পক্ষে নয়।

মহিমাচরণ একটি দার্শনিক প্রশ্ন করলেন যে প্রশ্ন বহুজায়গায় আলোচিত হয়েছে—'সমাধিস্থ কি ফিরতে পারে?' প্রথম কথা, সমাধি বলতে আমরা কি বুঝি? সমাধি মানে সম্যকরূপে আধান বা স্থাপন অর্থাৎ মন যখন ভগবানে সম্যকরূপে স্থাপন করা যায় সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। তবে সমাধি শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। একাগ্র-ভাবে বিষয় চিন্তা করতে করতেও কেউ সমাধিস্থ হয়। সেখানে সমাধিস্থ মানে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য। আবার বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা গবেষণায় এমন তন্ময় হয়ে যান যে বাহ্য জগতের কোন চেতনা থাকে না। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনে এরকম তন্ময়তার দৃষ্টান্ত আছে। সেও একরকম সমাধি তবে এ সমাধির বিষয় ভগবান নয়, জীব কিংবা জড় জগতের কোন একটি সমস্যা। ঠাকুর যে সমাধির কথা বলছেন, তা ঠিক এইরকম সমাধি নয়। তা হল ভগবানের অথবা জগৎ কারণের কথা বা জগতের অতীত যে তত্ত্ব, বা সত্য যাকে আশ্রয় করে সমস্ত জীব জগতের আবির্ভাব হয়েছে তার কথা। সেই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে মন যখন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয় সেই অবস্থাই সমাধি। এর অনেক রকম স্তর বা পর্যায় আছে। সবচেয়ে নিম্নতম পর্যায় তাকে বলা যায় যখন শরীরের হুঁশ থাকে না। তবে শরীরের হুঁশ না থাকলেও মন যে বৃত্তিশূন্য হয় তা নয়। যেমন নিদ্রিত মানুষের বাহ্যজ্ঞান থাকে না কিন্তু আন্তরজ্ঞান থাকে, স্বপ্নজগতের বোধ থাকে। মন নিষ্ক্রিয় নয়, ক্রিয়াশীল তবে বাহ্য জগৎ মনে কোনো রেখাপাত করছে না। আরও গভীরতর অবস্থা আছে। এই অবস্থাতে মনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায়, কেবল সূক্ষ্ম অহংবোধটুকু থাকে যে 'আমি' বোধটির সঙ্গে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি জ্ঞাতা এ বোধ পর্যন্ত থাকে

না, খুব সূক্ষ্ম তত্ত্ব সেটি। তবে মনের সূত্র তখনও ছিন্ন হয় না। সূত্র ধরে মানুষ বাহ্যজগৎ এবং আন্তর্জগতের মধ্যে আসাযাওয়া করতে পারে।

আমরা সাধারণ জীব কখনও জাগ্রত অবস্থায় বাহ্যজগৎ দেখছি কখনও স্বপ্ন অবস্থায় স্বপ্ন অনুভব করছি। আমাদের সেই সূত্র ছিন্ন হয়নি। আমরা সেই সূত্র ধরে বাইরের জগতে আসি আবার ঘুমিয়ে স্বপ্নজগতে যাই অথবা জেগে জেগে আকাশ কুসুম চিন্তা করা বা যাকে ইংরাজীতে Day dreaming বলে তাও করি। সেখানে বাহ্যজগতের সম্পর্ক নেই কিন্তু মন ক্রিয়াশীল। আরও গভীরে গেলে মন আর ক্রিয়া করে না। যেমন, সুষুপ্ত অবস্থা, তখন জাগ্রৎও নেই, স্বপ্নও নেই। সুষুপ্ত অবস্থায় মনের একপ্রকার লয় হয় মানে তার ক্রিয়াশীলতা বন্ধ হয়। কোন বাসনা কামনা মনে উদয় হয় না। চিন্তা করলে অনুভব করা যায় এটি একেবারে সূক্ষ্মতম অবস্থা, এত সূক্ষ্ম যে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে। সুষুপ্তি বাস্তবিক অনুভূত বস্তু না কল্পনা, এ প্রশ্ন নিয়ে বহু দার্শনিক বিচার আছে। অনেক দার্শনিক সুষুপ্তিকে অনুভূত বস্তু বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সেখানে মন সম্পূর্ণ লয় হয়ে যায় সুতরাং অনুভব কি করে হবে? অন্য দার্শনিকরা বলেন, অনুভব হয়। অনুভব যদি না হয় তাহলে আমার যে সুষুপ্তি হয়েছিল একথা আমি করে বলি? 'যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি'। (বৃ ৪. ৩. ২৩)

সুষুপ্ত অবস্থায় দ্রষ্টা যে কোনো জিনিস দেখেন না তার কারণ সে সময় তিনি জ্ঞাতারূপে থাকেন বলেই বলেন যে তিনি দেখেন না। যেহেতু তিনি দ্রষ্টা রয়েছেন সেহেতু তিনি বলেন, আমি জানি আমি দেখেছি সে সময় আমার কোন অনুভব আসেনি। অনুভব যদি না হোত তাহলে তার স্মৃতি কি করে আছে? কেউ এটিকে স্মৃতি বলে, কেউ বলে অনুমান। যেমন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুমাতে যাই তখন

বারোটা, যখন ঘুম ভাঙল তখন দুটো। এই বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত সময়টা আমি কি করলাম? বলব যে, আমি কিছুই করিনি। তাহলে এই অবস্থাটাই সুষুপ্তি। সে সময় আমি জেগেও ছিলাম না, স্বপ্নও দেখছিলাম না। এইরকম অনুমান করা যায়। কেউ বলে, না এটা প্রত্যক্ষ। কিরকম? না, এই সময়ে আমি যে কিছু দেখছিলাম না তা কি করে জানলাম? তাহলে আমি তখন জেগে ছিলাম। জেগে না থাকলে কি করে বললাম আমি সে সময় কিছু দেখিনি? তখন একেবারে সব লয় হয় না, দ্রষ্টা তখনও থাকে। কিন্তু তার দৃশ্য থাকে না। কাজেই সুষুপ্তিকে অনুভূত তত্ত্ব বলা হয়। এ হল অনুভূতির একেবারে সূক্ষ্মতম অবস্থা।

এই অনুভূতির সঙ্গে সমাধির তফাৎ কি? না, এই অনুভূতি মানুষের স্বাভাবিক নিয়মে আসে, আবার চলে যায়। সুষুপ্তি থেকে আবার আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রতে ফিরে আসি তাতে আমাদের অন্তরের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু সমাধি হলে তারপরে যে মানুষটি ফিরে আসে, সে আর আগের মানুষটি নয়। তার আমূল পরিবর্তন হয়। আগে যে অজ্ঞানী ছিল সে এখন পূর্ণজ্ঞানী হয়ে ফিরে আসে। সুষুপ্তি থেকে সমাধির পার্থক্যটুকু এইখানে বোঝা যায় এবং এই হল সাধারণ নিয়ম।

এখানে প্রশ্ন ছিল যে সমাধির পরে কেউ ফিরে আসে কি না।

আমরা বলি সেই চরম সমাধি অবস্থায় মানুষের সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হয়। 'অজ্ঞানের নাশ হয়', এর তাৎপর্য কি তা বুঝতে হবে। আমি কর্তা, আমি অনুভব করছি কিংবা আমি দ্রষ্টা, আমি ভোক্তা, এ সবই হল সেই এক অজ্ঞানের কার্য। এই অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নিঃসংশয়িত ভাবে দূর হয়ে যায়। দূর হওয়ার আবার রকমফের আছে, একটু দূর হওয়া আর একেবারে নির্মূল হওয়া। যেমন ভোরবেলাকার

আলো আঁধারের মিলনলীলায় কতক দেখা যায় কতক যায় না—এ একরকম অন্ধকার। আবার মানুষ যখন মূর্ছিত হয় তখন আর এক-রকম অন্ধকার। তখন যে মূর্ছিত হয় সে নিজের হাত পা দেখতে পায় না অথচ তা রয়েছে। ঐ রকম মূর্ছার সময় বা সুষুপ্তিকালে বা সমাধির সময় যখন আমরা গভীরভাবে নিমগ্ন হয়ে যাই তখন যে দেখবে তারও অনুভব থাকে না। এই অবস্থাটি হল গভীর সমাধির কথা।

এই সমাধি তুরকমের আছে। একরকম যৌগিক সমাধি, আর একরকম জ্ঞানের দ্বারা সমাধি। যোগের প্রক্রিয়া অনুসারে সাধনা করতে করতে যখন মনকে একেবারে তরঙ্গশূন্য করা যায় সেই অবস্থার নাম হল যৌগিক সমাধি। 'যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ'—চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। চিত্তবৃত্তি শব্দটিকে দৃষ্টান্ত দিয়ে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। হ্রদের ভিতর ঢিল ফেললে তাতে একটা তরঙ্গ হয়। ভাল করে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সেই তরঙ্গ সমস্ত হ্রদের ভিতরে বিস্তৃত হতে থাকে। ঠিক এইরকম আমাদের চিত্তরূপ হ্রদে বিষয়রূপ ঢিল পড়ে যেন তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। তারপরে সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে সমস্ত অন্তঃকরণকে পরিব্যাপ্ত করে। ঢিলও আবার তুইরকম আছে। বাহ্যজগতের ঢিল আছে, আবার মনোজগতের সংস্কার থেকে যে ফুট উঠছে তারও তরঙ্গ হয়। এই তরঙ্গ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমাদের মনের সক্রিয় অবস্থা। তরঙ্গগুলিকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন সম্পূর্ণরূপে স্থির হতে পারে না। মনের স্বভাবই এই সর্বদা সে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। যোগ কি করে? না, এই তরঙ্গটিকে স্তব্ধ করবার চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে, বিষয় আর তাতে আঘাত সৃষ্টি করতে পারে না। এইভাবে বাহ্যজগৎ শুধু নয় অন্তর্জগতেও ঢেউগুলি ক্রিয়া থেকে নিরত হয়, মন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ হয়। মনের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থাকে বলা হচ্ছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। যোগীর

মতে এই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে সত্য বা তত্ত্ব প্রতীত হয়। সাধারণ দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝি জল যখন নড়ে তখন জলের উপরে প্রতিবিম্বিত বস্তুকে বিকৃত করে। জল স্থির থাকলে বস্তুর প্রতিবিম্বটি সেখানে স্পষ্ট প্রকাশ পাবে। তেমনি চিত্তহ্রদকে নিস্তরঙ্গ করলে সত্য সেখানে অবিকৃত হয়ে প্রকাশিত হবে। যোগীর সমাধি অবস্থা এই।

জ্ঞানীরও এই অবস্থা হতে পারে। বিষয় মনকে তখনই তরঙ্গায়িত করে যখন আমরা বিষয়কে গ্রহণ করি। আমি এখানে আছি অন্য দেশে কত কি হচ্ছে তাতে আমার মন তরঙ্গায়িত হচ্ছে না অথবা আমি যখন চোখ বন্ধ করে থাকি তখন কত জায়গায় কত কি বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটে উঠছে তাতে আমার মনে কোন তরঙ্গ হচ্ছে না। বিষয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখলে বিষয় তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না। যোগী বলছেন, এই সম্পর্ক থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে, বিষয় আর আমাদের মনে তরঙ্গ তুলতে পারবে না। আর জ্ঞানী কি করেন? তিনি জগৎরূপ বৈচিত্র্যকে মিথ্যা বলে বুঝতে চেষ্টা করেন। তা বুঝতে পারলে জাগতিক ব্যাপারে মন ক্ষুব্ধ হবে না। ঘটনা যাই ঘটুক তিনি তাঁর নিজের সম অবস্থাতে স্থির থাকতে পারবেন। সম-কেই আর এক শব্দে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্মতে মনের দৃঢ় স্থিতি হবে এই অবস্থার নাম সমাধি।

এখন এখানে প্রশ্ন ছিল এই সমাধির পর ফিরে আসা সম্ভব কি না। এ প্রশ্ন উঠছে এই কারণে যে, জগৎরূপ যে ভ্রান্তি তখনই নিঃশেষে দূর হতে পারে যখন এর কারণ পর্যন্ত দূর হয়। কারণ থাকলে তার থেকে আবার কার্য উৎপন্ন হয়। বীজ থাকলে তার থেকে অঙ্কুর বেরোয়, বীজশূন্য করে দিলে আর অঙ্কুর হয় না। এই জন্য বলে নির্বীজ সমাধি, যার ভিতরে পুনরায় অঙ্কুরিত হবার শক্তি আর থাকবে না।

এই অবিদ্যার বা মায়ার শক্তিকে এমনভাবে দূর করে দেওয়া হয়েছে যে তার আর ব্যবহার হয় না। তাহলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্যবহার দেখা যায় কেমন করে? তার উত্তরে ঠাকুর বলছেন, যদি ব্যবহার না হোত তাহলে খবর দেবে কে? অনুভূত তত্ত্বের বর্ণনা করবে সে-ই যে অনুভব করেছে। সুতরাং ব্রহ্মে লীন হয়ে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান কি বস্তু তা বলবার কোনো লোক থাকে না। অনুভব করে এসে কেউ যদি তা না বলতে পারে তাহলে তার প্রমাণ কি? এইজন্য বলা হচ্ছে যে সমাধি থেকে কেউ না ফিরলে জ্ঞানের উপদেশ কে দেবে? আর উপদেশ দেবার যদি কেউ না থাকে, হাজার শাস্ত্রে লেখা থাকুক তার কোন মূল্য নেই। কারণ সে বস্তু আমাদের অনুভবের বিষয় নয়। শাস্ত্রে একে 'আচার্যাভাব' বলে। যে আচার্যের কাছে শিক্ষা পেয়েছে তারই জ্ঞান হয়েছে। শঙ্কর বলছেন, যুক্তির দ্বারা অনুমানের দ্বারা বলতে পার অজ্ঞান দূর হয়ে গেলে জ্ঞানীর আর ব্যবহার হয় না; কিন্তু যে বস্তু অনুভবসিদ্ধ তাকে যুক্তির দ্বারা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না, বাধিত করা যায় না।

সুতরাং সমাধি অবস্থা থেকে লোকে ফেরে কি না এটা যুক্তি দিয়ে দেখলে বলতে হবে, না ফেরে না কারণ তার ফিরবার সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সূত্র হচ্ছে অহংবোধ। সেই বোধই যখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন সে ফিরে আসবে কোন সূত্র বা পথ ধরে? কিন্তু আমরা জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহারের কথা পড়ছি যে জ্ঞানী বলছেন, আমি প্রত্যক্ষ তাঁকে করেছি—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ (শ্বে. উ. ৩. ৮.)—এগুলিকে শঙ্কর বলছেন, প্রত্যক্ষসিদ্ধ অতএব একে অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানের অনুভব হবার পরেও জ্ঞানী ফিরে আসতে পারেন, সাধারণ মানুষ হয়তো একবার ঐ সমাধি অবস্থায় গেলে সে ডুবে যায়। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় ছিন্নমূল লতার। লতার গোড়া কেটে দিলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে

লোপ পায় না, তেমনই থাকে কেবল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, সমাধির পর একুশদিনে শরীরটা পড়ে যায়। কারণ 'আমি-আমার' অভিমান না থাকলে শরীর কাজ করে না।

ঠাকুর লৌকিক দৃষ্টান্তের কথা বলছেন, জীবের আর পরে সত্তা থাকে না। কিন্তু অবতারকল্প পুরুষরা লোককল্যাণকামনারূপ সূত্র ধরে ব্যবহারিক জগতে ফিরে আসেন। এই লোককল্যাণকামনা এত সূক্ষ্ম যে তা তাঁর জ্ঞানকে আবৃত করে না কারণ তাঁর সত্তাই জ্ঞানময়। লোককল্যাণবাসনা থাকার জন্য অবতার আবার ফিরে আসেন অর্থাৎ তাঁর ভিতরে জগৎ বৈচিত্র্যের একটা বীজ থেকে যায় এবং সেই বীজ-সূত্রকে অবলম্বন করে তিনি আবার জগৎ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন, নিজে দেহ ধারণ করতে, অবতার রূপে লীলা করতে পারেন। ভাগবত বলছেন—

'ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাৎ অগুণাৎ অবিক্রিয়াৎ'। —হে প্রভু, তোমার থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। তোমার কোন গুণ নেই, কোনো ক্রিয়া নেই, বিকার নেই। 'ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মাণি ন বিরুদ্ধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ'—তুমি ঈশ্বর তোমার পক্ষে এটায় বিরোধ নেই কিছু। কেন? না, যে গুণের দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে সেই গুণগুলি যেহেতু তোমাকে আশ্রয় করে রয়েছে সেহেতু গুণের ধর্ম তোমার উপর গৌণভাবে আরোপ করে লোকে বলে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। এইভাবে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। জ্ঞানী পুরুষও ঠিক তেমনি স্বরূপত নিষ্ক্রিয় হলেও তাঁর উপরে এই বিক্রিয়াদি আরোপিত হচ্ছে। বিষয়টি সূক্ষ্ম বিচারের কিন্তু ঠাকুর খুব সোজা করে বললেন এখানে, রাজার ছেলে সাত তলায় আনাগোনা করতে পারে। রাজার ছেলে কে? অবতার। রাজার ছেলে যে, রাজ্যে তার জন্মগত অধিকার। সে ইচ্ছা করলে রাজবাড়ীর সাততলায় যাতায়াত করতে

পারে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে অবতারেরও জন্মগত অধিকার, কাজেই তিনি সমাধির পর ফিরতে পারেন।

ঠাকুর আরও বললেন, 'ফেরে না, ফেরে না সব বলে। তবে শঙ্করাচার্য, রামানুজ এরা সব কি?' এঁরা প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত। তাঁরা তত্ত্বজ্ঞ তবু তাঁরা ব্যবহার করছেন এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ব্যবহার সম্ভব। 'এরা 'বিস্তার আমি' রেখেছিল।' বিস্তার আমি মানে ঐ লোককল্যাণ করবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু। অতি সূক্ষ্ম, শুদ্ধ, স্বচ্ছ যে আমি, সেই আমি রেখেছেন তবে তাঁদের পক্ষে ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। মহিমাচরণ বুঝলেন, বললেন, 'তাই ত; তা না হলে গ্রন্থ লিখ্‌লে কেমন করে?' যদি ব্যবহার সম্ভব না হয় তাহলে উপদেশ দিলেন কেমন করে?

সমস্যা হচ্ছে, সংশয়াকুল মন বলবে, গ্রন্থরচনা তো পাণ্ডিত্যের পরিচয় মাত্র। বিশ্বাসীর কথা, অনুভব না থাকলে এরকম লেখা যায় না। এ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায়, যার শ্রদ্ধা আছে সে বুঝবে, যার শ্রদ্ধা নেই সে সংশয়াকুল হবে। সংশয়কে নির্মূল করবার কোন উপায় নেই।

এরপর ঠাকুর বলছেন, 'আবার দেখ, প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান এরাও সমাধির পর ভক্তির আমি রেখেছিল।' জ্ঞানী তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েও ব্যবহার করেন আবার নারদাদি ভক্তগণ ভক্তির ভিতর দিয়ে চরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধির পরেও তাঁরা ব্যবহার করেছেন। যদি পরে ব্যবহার সম্ভব না হোত তাহলে আচার্য রূপে এঁরা জগতের সামনে দৃষ্টান্ত রাখলেন কিভাবে? এখানে বিশেষত্ব এই যে সমাধির পর যে কেবল জ্ঞানীই ফিরে আসেন তা নয়, ভক্তেরাও সেইরকম অনুভূতির পরে লৌকিক রাজ্যে ফিরে আসেন।

তারপরের কথায় ঠাকুর আরও বলছেন, 'কেউ কেউ জ্ঞান চর্চা করেন বলে মনে করে, আমি কি হইছি। হয়ত একটু বেদান্ত পড়েছে।

কিন্তু ঠিক জ্ঞান হলে অহংকার হয় না, অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, তা'হ'লে আর অহংকার থাকে না।' কথাগুলি সবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য জায়গায় বলেছেন, অহংকার জ্ঞানে হয় না অজ্ঞানে হয় অর্থাৎ অজ্ঞান থেকে অহংকার হয়। যে ঠিক ঠিক জ্ঞানী তার ভিতরে অহংকার অর্থাৎ আমি খুব জ্ঞানী এই বুদ্ধি থাকে না। বেদান্তের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার শঙ্করাচার্য, যাঁর ব্যাখ্যা পূর্বাপর সব ব্যাখ্যাকে পরাস্ত করেছে, সেই শঙ্কর বলছেন, আমি যা ব্যাখ্যা করছি সেটা আমার বুদ্ধি অনুসারে করছি কিন্তু এটাই সকলকে গ্রহণ করতে হবে তা কখনও নয়। তিনি বলছেন, তত্ত্ব যা আমার কাছে প্রতীত হয়েছে, আমি অনুভব করেছি তাই বলছি। কেউ এর সঙ্গে একমত না হয়ে যদি অন্যভাবে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পার তাতে বাধা নেই। যেটা যুক্তিযুক্ত হবে সেটাই গ্রাহ্য হবে। বরং আরও স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে তর্কের দ্বারা কখনও তত্ত্বের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা হয় না। তত্ত্ব স্বনির্ভর, প্রকাশের জন্য তার আশ্রয় দরকার হয় না। সুতরাং জ্ঞানী কখনও অহংকারী হন না। শুদ্ধ জলরাশিতে পতিত শুদ্ধ জলবিন্দুর মতো আসলে প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন আর তাঁর অহং থাকে না। যেমন দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'কিরকম জানো? ঠিক দুপুরবেলা সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে, আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হ'লে—সমাধিস্থ হ'লে—অহংরূপ ছায়া থাকে না।' অহংরূপটি যেন ছায়া অর্থাৎ তত্ত্বের থেকে একটু বিকৃত, একটু পৃথক রূপের কল্পনা। আমি যেন একটি আর আমি অনুসরণ করছি যে তত্ত্বের, সেটি আমার থেকে ভিন্ন। যতক্ষণ ভিন্ন আছি ততক্ষণ আমি আমার উপাস্যের আরাধনারূপ উপাসনা করি। যখন আমি সেই তত্ত্ব থেকে ভিন্ন তখন আমি সেই তত্ত্বকে জানবার জন্য চেষ্টা করি। পার্থক্য থাকার জন্য এই প্রয়াস সম্ভব হয়। কিন্তু যখন পার্থক্য একেবারে লুপ্ত হয়ে

যায় তখন আর আমার বিচার বা উপাসনার অবকাশ থাকে না। তাই ঠিক জ্ঞান হলে সমাধিস্থ হলে অহংরূপ ছায়া থাকে না।

তারপরে আবার বলছেন, 'ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে, তবে জেনো, 'বিদ্যার আমি' 'ভক্তির আমি' 'দাস আমি'। সে, 'অবিদ্যার আমি' নয়।' এটুকু বলতে হল এইজন্য যে যদি সম্পূর্ণরূপে অহং-এর লয় হয়ে যায় তাহলে যেমন ঠাকুরের অন্য দৃষ্টান্তে আছে—নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে গেল, খবর দেবে কে? আমরা আমাদের স্বরূপকে ব্রহ্মকে জানবার জন্য বিচার করছি, করতে করতে আমাদের যে আমিটা ছায়ারূপে ছিল জ্ঞানের আলোকপাতের ফলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তবে জীবন্মুক্ত পুরুষদের যে বিদ্যার আমি, ভক্তির আমি, দাস আমি থাকে তা সত্যকে আবৃত করে না। অহং-এর ভিতর দিয়ে সেই তত্ত্ব অনাবৃত অবিকৃতভাবে প্রতিভাত হয়।

এখন কারো জ্ঞান হয়েছে কি না তার পরীক্ষা হচ্ছে তার অহংকার আছে কি না। যতক্ষণ আমি জ্ঞানী বলে অভিমান আছে ততক্ষণ তার জ্ঞান হয়নি। শাস্ত্র চর্চা করে সে পণ্ডিত হয়েছে কিন্তু তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বুদ্ধির কসরৎ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আমি জ্ঞানী, আমার জ্ঞান হয়েছে, বললেই জ্ঞান হয়ে যায় না। উপনিষদে আছে

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ॥ কেন ২. ২.

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ ঐ ২. ৩.

আমি এরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছি; অর্থাৎ 'জানি না' এও মনে করি না এবং 'জানি' এও মনে করি না। যে কেউ বলতে পারে আমি জানি। যে বলছে জানি, সে জানে না। আমি জানি বললে আমার একটা ব্যক্তিত্ব থেকে যায়। এইভাবে জানাকে শাস্ত্রে জানা বলছে না। যে জানার দ্বারা সমস্ত আমিত্বের লয়

হবে সেই জানাই আসল জানা। সুতরাং জ্ঞানীর অহংকার থাকলে সে জ্ঞানী হবে কি করে? তাই বলছেন, সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হলে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায় আর অহং থাকে না। তবে এটুকু বলেছেন, ঠিক জ্ঞান হবার পর যদি কারো অহং থাকে তার দ্বারা সে বদ্ধ হয় না। অজ্ঞান তাকে আর বিভ্রান্ত করে না।

এবার বললেন, 'জ্ঞান, ভক্তি দুইটিই পথ, যে পথ দিয়ে যাও তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর একভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।' এই কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের অনেক সময় এইরকম আশঙ্কা হয় যে ভক্তির ভিতর দিয়ে চরম তত্ত্বে পৌঁছান যায় না, কারণ সেখানে ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় না। সুতরাং এটি উচ্চ অবস্থা হতে পারে কিন্তু চরম অবস্থা নয়। জ্ঞানপথে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণরূপে লয় হয় যেমন জলবিন্দু সমুদ্রের জলরাশির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। এটা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বলছি কিন্তু ঠাকুর বলছেন, ভক্তের যে আমিটুকু থাকে তা অবিদ্যার আমি নয় বিদ্যার আমি। আসলে জ্ঞান, ভক্তি এই দুটিই লক্ষ্যে যাওয়ার পথ, যে পথ দিয়েই যাওয়া যাক তাঁকেই পাওয়া যাবে। কেবল অনুভবের তারতম্য হয়। জ্ঞানী একভাবে ভক্ত আর একভাবে তাঁকে দেখেন। একই বস্তুকে নিজের নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আস্বাদন করেন। জ্ঞানী জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যখন আস্বাদন করেন তখন তিনি জ্ঞানস্বরূপ বলেন। আর ভক্ত তাঁকে হৃদয়ানুভূতি, রসবোধের ভিতর দিয়ে যখন অনুভব করেন তখন তাঁকে রসস্বরূপ বলেন—'রসো বৈ সঃ'। তাঁর ভিতরে অনন্ত রস। যা আস্বাদন করা যায় তাকে রস বলে—'রস্যতে, আস্বাদ্যত ইতি রসঃ।' সত্যব্রত সামাধ্যায়ী বলেছেন, ভগবান নীরস, তাঁকে আমরা ভক্তি দিয়ে সরস করব। ঠাকুর শুনে বলছেন, কি বলে রে? শাস্ত্রে যাঁকে সব সময় বলছে রসস্বরূপ, তাঁকে বলছে নীরস। তার কারণ হচ্ছে

অনুভূতির অভাব। ভগবান একই তত্ত্ব, তাঁকে দুজন দুই ভাবে আস্বাদন করছেন। তাতে আস্বাদনের মাত্রার তারতম্য হচ্ছে না, অনুভূতি ভিন্ন হতে পারে।

চণ্ডীর ব্যাখ্যা

ভবনাথ প্রশ্ন করছেন, 'চণ্ডীতে লেখা আছে যে, তিনি সব টক টক মারছেন। এর মানে কি?' ভবনাথের মতো এই প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে ওঠে। চণ্ডীতে দেবী আমাদের মাতৃরূপা। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—সর্বভূতে তিনি মাতৃরূপে অবস্থান করছেন। সেই 'মা' আবার টক টক করে অসুর মারছেন? এর মানে কি? ঠাকুর এর মানে বোঝাতে গিয়ে বলছেন, 'ও সব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।' মায়া ছাড়া অন্যভাবে এর ব্যাখ্যা হয় না। তবে রূপক ব্যাখ্যা করা যায় যে, অসুর মানে হচ্ছে আমাদের আসুরিক প্রবৃত্তি, অশুভ সংস্কার। সেইগুলিকে তিনি দূর করছেন তাই অসুর সংহার করছেন। কিন্তু তাঁর সংহার মূর্তিকে কি আমরা রূপক বলে ভাবব? তাতো ভাবি না। তাই ঠাকুর বলছেন, ওসব মায়া। কাকে তিনি মারছেন? যে মারছে সেও যা আর যাকে মারছে সেও তা। তিনি মায়া প্রভাবে নিজে হন্তা এবং নিজেই হত। হনন তিনি নিজেকেই করছেন। ছিন্নমস্তা তিনি, নিজের মুণ্ড নিজে কাটছেন। ঠাকুর যেমন ফড়িং-এর পিছনে কাঠি দেখে বলছেন, রাম, তুমি নিজের দুর্গতি নিজে করেছ। কিংবা সেই সাধুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যিনি বলেছিলেন, যিনি আমায় মেরেছেন, তিনিই আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন। পার্থক্য নেই, কর্তা এবং কর্ম অর্থাৎ যিনি করছেন এবং যার সম্বন্ধে কিছু ঘটছে সবই এক। যতক্ষণ তাঁর লীলাকে অবলম্বন করে বলছি ততক্ষণ কখন বলছি

কালী করালী নৃমুণ্ড মালিনী কখন বলছি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী দয়াময়ী। উভয় বিশেষণই তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য। আর যদি সমস্ত লীলার অতীত রূপে তাঁকে দেখি তাহলে তিনি দয়াময়ীও নন, নিষ্ঠুরাও নন। তিনি তখন এসবের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপ, যে রূপ আমাদের বর্ণনার অতীত বস্তু। আর যখন তিনি বর্ণনার মধ্যে আসছেন তখন বলি, এই জগৎ-লীলা তাঁর। জগৎরূপ বিরাট কার্যের কর্তা কে এই বলে যখন তাঁকে ধরতে যাচ্ছি তখন এই লীলার সাহায্যেই আমরা লীলার অতীত সেই নিত্য যিনি তাঁকে ধরতে চেষ্টা করছি। কাজেই লীলাকে অবলম্বন করেই যতরকমের সাধনা, উপাসনা, বিচারাদি। উদ্দেশ্য হল এর ভিতর দিয়ে তত্ত্বে পৌঁছান, তখন এই লীলার স্বরূপকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। ঠাকুর বলেছেন, লীলা থেকে নিত্য আবার নিত্য থেকে লীলা। এই লীলা দেখতে দেখতে যাঁর লীলা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা তাঁতে পৌঁছাই তারপরে পিছন দিকে যদি দৃষ্টি দিই, দেখব যিনি নিত্যরূপে রয়েছেন তিনিই বহুরূপে লীলা করছেন। বেদে পুরাণে একথা বারবার নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন। যেমন উপনিষদে প্রশ্ন করা হয়েছে, কটি দেবতা? উত্তরে ঋষি বলছেন, তেত্রিশ হাজার তেত্রিশ শো। যাকে আমরা এককথায় বলি, তেত্রিশ কোটি দেবতা। তারপরে আবার বলছেন, কটি দেবতা? বললেন, তেত্রিশটি। যত বার বার প্রশ্ন করা হচ্ছে উত্তরে ক্রমে সংখ্যা কমে আসছে। সব শেষে বলছেন, এক।

এখন এই এক কি করে বহু হল? কি করে হল বলতে এর কারণ যদি কার্যের থেকে ভিন্নরূপ হয় তাহলে তাকে বোঝা যায়। যেমন আমরা দুধে যদি একফোঁটা গোচোনা দিই বা টকরস দিই দুধটা ছানা হয়ে যাবে, কার্যটা বাইরের। সেটা কারণের সঙ্গে মিশে একটা পরিবর্তন ঘটাল। এখন যিনি জগতের এক তত্ত্ব তাঁকে যদি বহুবিচিত্র

রূপ নিতে হয় তার কারণটা কি তাঁর থেকে বাইরে থাকবে? তা যদি থাকে তাহলে সেটা তাঁর সৃষ্ট নয়। তাঁর সৃষ্ট যদি না হয় তাহলে তিনি জগৎ স্রষ্টা হতে পারলেন না। এইজন্যে বাইরের কারণ তাঁর ভিতরে ঢুকে এই বিকৃতি আনছে একথা আমরা বলি না। তাহলে কি বলি? বলি মায়া। তিনি এক হয়েও বহু, বহু হয়েও এক। আমরা দৃষ্টির বিভ্রম অনুসারে কখনও তাঁকে বহুরূপে, কখনও একরূপে দেখছি। বস্তুটির স্বরূপের পরিবর্তন না হয়েও যদি তার রূপান্তর ঘটে তাকে বলে মায়া। যেমন বাজীকর চোখের সামনে একটা আমের আঁটি এনে পুতল, তার থেকে গাছ হল, ফল হল, ফল খাইয়ে দিলে। যে বীজ থেকে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটল, সেটা যদি সত্য হত তাহলে সেই গাছটা থাকত। কিন্তু বাজীকর যতক্ষণ মায়ায় আচ্ছন্ন রেখেছে ততক্ষণই গাছটা আছে তারপর নেই। তখন আমরা বলি মায়া, গাছটা হয়ে আবার নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে না। এইরকম এক থেকে তিনি বহু হতে পারেন না তবু বহুরূপে আমরা তাঁকে দেখছি এইজন্যে একে বলি মায়া। মায়া শব্দের মানে হল এই—তত্ত্বত যা নয় সেইরূপে তার প্রতীতি হয়। শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্ম বৈচিত্র্যময় নন কিন্তু বৈচিত্র্য দেখছি। সুতরাং তিনিই বিচিত্র হয়েছেন বলে বলছি এটি মায়া। কারণ আমাদের বুদ্ধিতে তিনি বিচিত্র হতে পারেন না।

ঠাকুরের ভালবাসা

তারপরের অংশটুকু বর্ণনাপ্রধান। গিরিশের বাড়ী ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসেছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর নরেন্দ্রের খবর নিচ্ছেন। অর্ধেক খাওয়া হতে না হতে ঠাকুর নিজের পাত থেকে খাবার নিয়ে নরেন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন, 'নরেন্দ্র, তুই এইটুকু খা।' নরেন্দ্রের উপরে এত টান একি তাঁর পক্ষপাতিত্ব? কেউ কেউ একটু

ঈর্যাপরায়ণও হতেন। ঠাকুর তাতে দোষ দেখতেন না, হাসতেন। ঠাকুরকে তারা সমগ্ররূপে পেতে চায়, এইজন্য ঠাকুরের হাসি। কিন্তু সমগ্ররূপে পেতে হলে সমগ্ররূপ ধারণা করবার মতো আধার হতে হবে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন আধার, আধার অনুসারে তাঁর স্নেহ করুণা আধারের ভিতরে ভরে নিই, তার বেশী ধরে না। ঠাকুর নিজেই বলছেন, একসের ঘটিতে কি পাঁচসের দুধ ধরে? আমাদের আধার যে মাপের হবে ভগবানের কৃপা আমরা সেই পরিমাণে অনুভব করতে পারব। তিনি পক্ষপাতী নন। ঠাকুরের স্নেহের স্রোত সর্বব্যাপী সর্বগ্রাহী হলেও নরেন্দ্রের আধার অনুসারে সেখানে বেশি প্রকাশিত হচ্ছে। তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা পেতে হলে স্ব স্ব আধারকে তদনুরূপ করে নিতে হয় তা না হলে অনুভব হয় না। তিনি উজাড় করে দিলেও আমরা নিতে পারি না। ঠাকুর বলছেন, তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। তাঁর স্নেহ অনুভব করতে হলে আমাদের সেই অনুসারে বোধ শক্তিকে সূক্ষ্ম করতে হবে। এটুকু আমাদের পক্ষে দরকার। ভগবান পক্ষপাতী নন, আমরাই সীমিত দৃষ্টিসম্পন্ন, এটা মনে রাখতে হবে।

তিন

২. ২৫. ১-২

জ্ঞান অজ্ঞানের পারে বিজ্ঞান

শ্যাম বসুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তা চলছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলছেন, বিজ্ঞান 'নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন এর নাম জ্ঞান, বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান।' অর্থাৎ নানা বস্তুকে তত্ত্ব বলে জানা, সত্য বলে জানা এ হল নানা জ্ঞান। নানা বস্তুকে যদি মিথ্যা বলে জানা যায় সেটা অজ্ঞান হল না, যদি নানা বস্তুকে সত্য বলে জানা হয় তার নাম অজ্ঞান। জ্ঞানের নাম অজ্ঞান কেমন করে হবে তাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। নানা বস্তু মানে এক ব্রহ্ম বস্তু ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের বস্তু আছে এটি জানা। গীতায় যেমন বলেছেন, এই জগতের স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থের মধ্যে আমি ছাড়া অর্থাৎ ভগবান ছাড়া কোনো বস্তু নেই। ব্রহ্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বস্তু প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের ব্রহ্ম স্বরূপ থেকে অতিরিক্ত বলে, বিভিন্ন বলে মনে হলে সেগুলি হল মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপেই যদি তাদের অনুভূতি হয় তাহলে সেগুলি মিথ্যাজ্ঞান হল না। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান, সর্বভূতে একই ঈশ্বর আছেন এর নাম জ্ঞান আর বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। সর্বভূতে তাঁকে অনুভব করা একে বিজ্ঞান বলছেন। এই বিজ্ঞান আর বেদান্তীর বিজ্ঞানের ভিতরে পার্থক্য আছে। বেদান্তীর বিজ্ঞান বলতে বিশেষরূপ জ্ঞান—মানে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নেই এর নাম বিজ্ঞান। কিন্তু যে সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাঁর সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করছে, ঘনিষ্ঠতা করছে তাকে বলছেন বিজ্ঞান। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা তিনি আরও করছেন—'কাঠে

আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে ; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।' অর্থাৎ সেই জ্ঞান অনুভব করে তারপর তার দ্বারা সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যবহার করা এর নাম হল বিজ্ঞান।

তারপরে সেই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদাহরণ দিয়ে বলছেন, তেমনি 'অজ্ঞান কাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান।' অর্থাৎ জগৎটার স্বরূপ জানবার জন্য যে জ্ঞানকাঁটার ব্যবহার করা হল সেই জ্ঞান কাঁটাটি হল উপায় রূপ। তার দ্বারা অজ্ঞানকে দূর করতে হবে। এই কাজ হয়ে গেলে সেই উপায়টিকেও আর ব্যবহার করতে হয় না। বেদান্তে এই কথা বলা হয়েছে। 'যেন ত্যজসি তত্ত্যজ'—বুদ্ধির দ্বারা বিষয় ত্যাগ করলাম তারপরে যে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করলাম সে বুদ্ধিকেও ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ মনের বৃত্তিকেও ত্যাগ করতে হবে। এই হল জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জ্ঞানকে জেনে জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সেখানে জ্ঞানটি আর একটি করণরূপ। কারণ মানে যা দিয়ে অজ্ঞান দূর করতে হবে। সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে ব্যবহার করা হয় তার নাম বিজ্ঞান। এটি এখানে বিশেষ করে বোঝান হচ্ছে।

নির্জনে ধ্যান

শ্যাম বসুর কথাবার্তায় ঠাকুর তাঁর উপর সন্তুষ্ট। অধিকারী বিচার করে তাঁকে বলছেন, 'বিষয়ের কথা একেবারে ছেড়ে দেবে। ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোনও কথা বোলো না,' অর্থাৎ 'আন চিন্তা না করিবে, আন কথা না কহিবে।' ঈশ্বর ছাড়া অন্য কথা বলবে না, অন্য চিন্তাও করবে

না। 'বিষয়ী লোক দেখলে আসতে আসতে স'রে যাবে।' বিষয়ী লোকের প্রতি অসৎ ব্যবহার করবে তা বলেননি, তাদের অসম্মান না করে, মনে আঘাত না দিয়ে আস্তে আস্তে সরে যাবে এই কথা বলছেন। 'এতদিন সংসার করে তো দেখলে সব ফক্কাবাজী। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।' সংসারে আছে কি ? 'আমড়ার অম্বল ; খেতে ইচ্ছা হয়, ···কিন্তু খেলে অম্লশূল হয়।' শ্যাম বসুর বয়স হয়েছে, সংসারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাই তাঁকে বলছেন, বিচার করে দেখলে বোঝা যায় সংসারের অসারতা। শ্যাম বসু তা স্বীকার করলেন। ঠাকুর আবার সেই কথার উপর জোর দিয়ে বলছেন, 'অনেকদিন ধরে অনেক বিষয়কর্ম করেছ, এখন গোলমালে ধ্যান ঈশ্বরচিন্তা হবে না। একটু নির্জন দরকার। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। তাই বাড়ী থেকে আধপো অন্তরে ধ্যানের জায়গা করতে হয়।' বেশী দূরে বললে ভাববে ও আমার দ্বারা হবে না তাই ঠাকুর খুব হিসেব করে বলছেন, আধপো অন্তরে। পো মানে হচ্ছে এক ক্রোশের চতুর্থাংশ অর্থাৎ আধ মাইল। বাড়ীর ভিতরে থেকে যতই চেষ্টা কর মনকে সংসারের আবহাওয়া থেকে মুক্ত রাখতে পারবে না। এইজন্য একটু দূরে যেতে হবে।

'নির্জন না হলে মন স্থির হবে না।' এই কথাটি সকলেরই পরীক্ষিত সত্য। মনের একাগ্রতার জন্য নির্জনতা দরকার। জনমানব থাকবে না এমন নির্জনতা নয়। বাড়ীর কথাবার্তা পৌঁছয় না এমন দূরত্ব রেখে সেখানে গিয়ে জপধ্যান করতে হবে। খুব দূরে গেলে প্রাণ হাঁপিয়ে যাবে বাড়ীর চিন্তা মনকে অস্থির করবে। কাছাকাছি হলে বাড়ীতে এসে খোঁজখবর করতে পারবে। সকলের পক্ষে এটা সম্ভব নয় তাই এ উপদেশ সকলের জন্য নয়। অন্যদের বলেছেন, মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করবে, সর্বদা তো পারবে না। সংসারের নানান রকমের বাধাবন্ধন আমাদের ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, অন্তত

সাময়িকভাবে মনে করতে হবে আমি সেই বন্ধনমুক্ত। ঠাকুর বারবার বলছেন, সংসারের পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে মনে করবে আমার কেউ নেই। আমি আর ঈশ্বর এর মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করে এরকম কেউ নেই।

কথামৃতকার অতঃপর বলছেন, 'শ্যাম বসু একটু চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কি চিন্তা করিতেছেন'। এখানে আমরা কল্পনা করতে পারি তিনি হয়তো চিন্তা করছেন, এইরকম সংসার থেকে একটু দূরে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করা কি সম্ভব হবে? তখন সংসার কে সামলাবে? সাধারণত দেখা যায় বয়স্ক ব্যক্তিরা সংসারের দায় দায়িত্ব বহন করতে কষ্ট বোধ করছে তবু ভারটা আর কাকেও দিতে প্রস্তুত থাকে না। মনে করে আর কেউ সে ভার বইতে পারবে না। এই যে মানুষের অভিমান, অহংকার—আমি না হলে আমার কাজটি আর কেউ করতে পারবে না—এটা সংসারের প্রতি আসক্তির চিহ্ন। যদি বাধ্য হয়ে সংসার থেকে দূরে চলে যেতে হয় তখন কি হবে, একথা মানুষ ভাবে না। ভাবে, আমি না হলে কি করে চলবে? এই অহংকারের ফলেই আমরা সংসারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলি, সংসার আমাদের বাঁধে না। সংসারে আছি বলে বদ্ধ হয়ে আছি তা নয়, নিজেকে সংসারের সঙ্গে বেঁধে রাখছি বলে আমি বদ্ধ। আমরা সবাই বলি, সংসারের বন্ধন, কি করব? বন্ধনটা কেন মনে ভেবে দেখেছি কি? ঐ যে বলে, 'ম্যায় তো কমলী ছোড়া মগর কমলী মুঝে ছোড়তি নেহি।' আমি তো কম্বল ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু কম্বল আমাকে ছাড়ছে না। গল্পটা হল—একটা ভাল্লুক ভেসে যাচ্ছে। একজন তাকে কম্বল মনে করে সাঁতার দিয়ে তাকে ধরেছে, তারপর দুজনেই ভেসে যাচ্ছে। তীরে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে বলছে, আরে ভাই, ছোড় দো, ছোড় দো। অন্যজন তখন ঐ কথা বলল কম্বল আমায় ছাড়ছে না। ভাল্লুক আঁকড়ে ধরেছে।

আসল কথা সংসার জড় বস্তু সে আমাকে বাঁধে না, আমিই স্বেচ্ছায় সংসারকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় একটা খুঁটিকে আঁকড়ে ধরে আমি বলছি খুঁটিটা আমাকে ছাড়ছে না। আমি ইচ্ছা করলেই খুঁটিটা ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু ছাড়ছি না আর বলছি আমায় ছাড়ছে না।

তারপর ঠাকুর একটু শ্লেষাত্মকভাবে বলছেন, 'আর দেখ, দাঁতও সব পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজা কেন?' অর্থাৎ সংসার ভোগের আগার, ভোগের সামর্থ্যই চলে গেছে আর সংসার কেন? আমরা বলি সংসারের সেবা করতে হচ্ছে। প্রকৃতই তা নয়। সেবা সংসারের করছি না, আত্মসেবা করছি। এই ব্যাপারটি সকলেরই বিশেষ করে অনুধাবন করবার বিষয়।

শ্যাম বসু বুঝতে পারছেন ঠাকুরের যুক্তি অকাট্য। তিনি তাই বলছেন, 'আহা! চিনিমাখা কথা'।

তারপরে ঠাকুর আবার এক কথাই বলছেন, 'তাঁর চিন্তা করবার জন্য একটু নির্জন স্থান কর, ধ্যানের স্থান।' নির্জন স্থানে তাঁর চিন্তা কিভাবে করতে হবে এবার স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যে, ধ্যান করতে হবে। ধ্যান মানে গভীরভাবে তাঁকে চিন্তা করা। সে চিন্তায় অন্য কোনো বস্তু যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করতে পারে। স্থানটি নির্জন না হলে ঈশ্বর চিন্তা ব্যাহত হতে পারে। তারপর বললেন, 'তুমি একবার কর না। আমিও একবার যাব,। এরকম একটি জায়গা তৈরী করে নিজে ধ্যান করতে আরম্ভ করলে তিনিও যাবেন অর্থাৎ তিনি প্রেরণা যোগাবেন। এইভাবে তাঁকে উৎসাহিত করছেন। এই যে সংসারের সব আসক্তি ত্যাগ করে দূরে নির্জনে গিয়ে একমনে নিবিষ্টভাবে ভগবানের চিন্তা করার কথা বলছেন এগুলি সাধকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা।

শ্যাম বসু প্রশ্ন করলেন, 'জন্মান্তর আছে'? ঠাকুর এইকথার সরাসরি

উত্তর না দিয়ে বললেন, 'ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক ; তিনিই জানিয়ে দেন, দেবেন।' ঠাকুরের কথার তাৎপর্য—এগুলি জেনে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। জন্মান্তর আছে কি নেই জেনে কারো কোনো লাভ অথবা ক্ষতি হবে না। অতএব এসব অবান্তর বস্তু জানবার জন্য মনের শক্তি ক্ষয় না করে ভগবানকে ডাকতে বলছেন, তাঁর ইচ্ছা হলে তিনিই আর সব জানিয়ে দেবেন। আর যদি না-ই জানান তাতেই বা কি ক্ষতি? এইগুলি গৌণ জিনিস মনের অস্থিরতার জন্য এইরকম জিজ্ঞাসা মনে আসে। জন্মান্তর বিষয়ে জানবার জন্য শ্যাম বসুর মতো কৌতূহল অনেকেরই হয়। এ কৌতূহল চিরন্তন, কারো কথাতে নিবৃত্ত হবে না। একজন যদি বলে দেয়, জন্মান্তর আছে তাহলে কি তাতে বিশ্বাস হবে? আরও পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করবে। মোটকথা ঠাকুর একেবারে মূলে যেতে চান, যাঁকে জানলে তোমার জীবনের সব কৌতূহলের নিবৃত্তি হবে, সমস্ত অজ্ঞান দূর হয়ে যাবে, তাঁকে জান। গীতায় যেমন বলছেন, 'যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥' (৭.২) যাঁকে জানবার পর আর জানবার মতো কিছু বাকি থাকে না। যা থাকে সেগুলি অসার জিনিস, সেগুলি জানবার কোনো সার্থকতা নেই। কেউ যদি লক্ষ টাকা কুড়িয়ে পায় তখন আসে পাশে পড়ে থাকা ছোটখাট জিনিস কুড়োতে আর ব্যস্ত হয়? উপনিষদে বলছেন, 'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥' (ছান্দোগ্য. ৬. ১. ৪.)—একটি মাটির ঢেলাকে জানলে মাটি দিয়ে তৈরী যা কিছু সব জানা হয়ে যায়। মাটি দিয়ে নানান রকমের জিনিস তৈরী হয় যেগুলি মাটির বিকার, পরিণাম, সেগুলি মাটি থেকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট নয়। মাটিকে সরিয়ে দিলে তাদের কোনো সত্তা থাকে না। কাজেই সেগুলিকে জানবার চেষ্টা অর্থহীন। এককে অর্থাৎ মাটির তালকে

জানলেই মাটি দিয়ে তৈরী যত কিছু সব জানা হল। জিনিসের মূল উপাদানকে, জানলে তাদের সার তত্ত্বকে জানা হয়। তার যে হাজার রকম পরিণতি বা বিকার হতে পারে, সেগুলি শব্দমাত্র, সেগুলিকে জানা নিষ্প্রয়োজন। ঠাকুরও ঐ কথাই বলছেন, আর সব জানার কি দরকার? তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে আকুল হ'ল।' অর্থাৎ রাবণের মৃত্যুর সঙ্গে বেহুলার কান্নার কোনো সম্পর্ক নেই। সেইরকম এই জগতের নানান বস্তুকে জেনে আমার লাভটা কি? উপনিষদে আছে, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যাবাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ। (মু. ২. ২. ৫) সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও এবং অপর সকল বাক্য ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। অমৃতত্ব লাভের এই-ই পথ। গীতাতেও ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

'অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥' (১০. ৪২)

—এত সব জানবার প্রয়োজন কি? এইটুকু জেন আমি আমার এক অংশের দ্বারা এই সমস্ত জগৎকে পরিবৃত করে রয়েছি। এ কথাটি যাতে শ্যাম বসুর অন্তরে প্রবেশ করে তাই ঠাকুর পরিষ্কার করে বলছেন, 'ঈশ্বরকে বল, আন্তরিক ডাক; তিনি জানিয়ে দেন দেবেন।' তাঁকে জান তারপর যদি তাঁর বৈচিত্র্য জানবার ইচ্ছা হয়, তিনিই জানিয়ে দেবেন, সেগুলিকে আর পৃথক চেষ্টা করে জানবার দরকার হবে না। যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ হলে তাঁর ধনবৈভবের খবর তিনিই দেবেন। অন্তহীন এই জগতের বৈচিত্র্য যা জেনে শেষ করা যায় না। তাই এই অনন্ত প্রকারকে না জেনে যাঁর প্রকার, যিনি এর মূল তত্ত্ব তাঁকে জানতে পারলে সব বস্তুর সারকে জানা হয়ে গেল। তারপরেও যদি জানার ইচ্ছা হয় তিনি তাও জানিয়ে দেবেন।

অভ্যাস যোগ

শ্যাম বসুর আর একটি প্রশ্ন—'মানুষ সংসারে থেকে কত অন্যায় করে, পাপকর্ম করে, সে মানুষ কি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে?' প্রশ্নটি অতি বাস্তব প্রশ্ন। আমরা জানি মানুষের মন পদে পদে হীনবৃত্তির পরিচয় দেয়। অতএব এই মন নিয়ে কি আমরা ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি? ঠাকুর তার উত্তর দিচ্ছেন, 'দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে আর সাধন করতে করতে, ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয় তাকে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে? প্রসঙ্গত গীতায় ভগবানের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে।

'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥' (৮।৫)

—অন্তকালেও আমাকে স্মরণ করতে করতে যদি কেউ দেহত্যাগ করে তাহলে সে আমারই ভাব অর্থাৎ পরমাগতি লাভ করে, এতে কোন সংশয় নেই। ঠাকুরও একই কথা বললেন, ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থেকে দেহাবসান হলে মানুষের কৃত অসৎকর্ম তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। ভগবৎ চিন্তায় শুদ্ধ হয়ে দেহান্তর হয়েছে, আর তার অশুদ্ধ দেহ লাভ হবে না। কারণ অন্তিম সময়ে মানুষ যা চিন্তা করে সেই চিন্তাই তার পরবর্তী জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এখানে প্রশ্ন মনে জাগবে যে, একজন জীবনভোর অন্যায় কর্ম করেছে আর মরবার সময় কোনোরকম করে ভগবানের চিন্তা করে সে মুক্ত হয়ে যাবে? তাহলে চিরজীবন যারা ধর্মচিন্তা করছে তার সঙ্গে তফাৎ কি হল? তার উত্তর ঠাকুর এখানে নয় অন্য জায়গায় দিয়েছেন—সারা জীবন যে অন্যায় কাজ করে গেল শেষ সময়ে তার মনে ঈশ্বর চিন্তা আসবে তার নিশ্চয়তা কি? এই নিশ্চয়তা যাতে থাকে তারজন্য ভগবান বলছেন,

'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' (গীতা ৮।৭)

—সব সময় আমার চিন্তা কর। সব সময় চিন্তা করলে সেটাই জীবনের প্রধান চিন্তা হবে যা অন্তকালেও হয়তো থাকবে, আর অন্য চিন্তা লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করবে না। এখানে আমরা হয়তো ভাবব সমস্ত জীবনটা যেমন তেমন করে কাটিয়ে শেষসময় তাঁকে চিন্তা করলেই তো হল, ফাঁকি দিয়ে সব লাভ হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে শেষকালে যে তাঁর চিন্তা থাকবে তার নিশ্চয়তা আছে কি? তাই ভগবান যে বলছেন, 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর'—এটা একটা practical কথা, ব্যবহারিক কথা যে, আমরা সর্বদা যা চিন্তা করব মৃত্যুকালে সেই চিন্তাটাই স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রবল হবে। কারণ সেসময় মনের উপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে আসে, জোর করে তাকে অন্যপথে চালিত করা যায় না। সে তার স্বাভাবিক অভ্যাস অনুসারে চলে। 'পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।' (গী. ৬।৪৪)—পূর্বের অভ্যাস অনুসারে পরবর্তী জীবনের ব্যবহার হয়, মৃত্যুকালেও তেমনি হয়। কাজেই সমস্ত জীবন ধরে যদি ঈশ্বরচিন্তা করে তাহলে মৃত্যুকালেও সেই চিন্তাই প্রবল হবে, অন্য চিন্তা নয়।

তা না হয়ে জীবনভোর বিষয় চিন্তা করার পর যদি কেউ ভাবে মৃত্যুকালে তাঁর চিন্তা করব তা করলে কি কিছু লাভ হবে? এতদিনের সংস্কারবশত সমস্ত সৎচিন্তাকে ঠেলে বিষয়চিন্তাই তখন প্রবল হয়ে ওঠে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কার মনে কোন চিন্তা প্রবল ছিল একথা বলা কঠিন। অনেক সময় আমরা বলি, এই তো ভগবানের নাম করতে করতে দেহত্যাগ হল। কিন্তু যখন ভগবানের নাম করা শেষ হল আর তারপর মৃত্যু হল, এ দুটোর মাঝখানে যে কি ঘটছে তা তো আমরা বুঝতে পারি না। এইটুকু বুঝি যে তারপরে তার আর বাহ্য কোন চেষ্টা থাকে না কিন্তু অন্তরে কি চিন্তা চলছে তা তো বোঝা যায় না। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে এই প্রশ্ন মনে আসে যে, সারা জীবন অন্যায়

চিন্তা করে যাবার পর মৃত্যুকালে ভগবানের নাম দু-চারবার করে বা অপরের মুখে শুনে শেষ পর্যন্ত কি ভাব হল তা কে জানে? ঠাকুর বলছেন, পাখীকে রাধাকৃষ্ণ পড়াচ্ছে কিন্তু বিড়ালে ধরলে টঁ্যা টঁ্যা করে। সেইরকম আমরা মনকে বলছি ভগবানের নাম কর কিন্তু আমার অন্তরে যে ভাবটা দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে সেটাই যে তখন প্রবল হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে? তাই শাস্ত্র বললেন, 'অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'। কাজেই মনকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে সে সর্বদা তাঁর চিন্তায় অভ্যস্ত হয় এবং যতক্ষণ চিন্তাশক্তি থাকে ততক্ষণ যেন সে চিন্তাই চলে। অন্য চিন্তা ভগবৎ চিন্তাকে যেন সরিয়ে না দেয়, এই কথাটা বিশেষ ভাবে মনে রাখবার। ফাঁকি দিয়ে শেষ সময়ে ভগবানের চিন্তা করে নেব ব্যাপারটা অত সহজ নয়, তার জন্য সারা জীবনব্যাপী চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বললেন, 'হাতীর স্বভাব বটে নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধুলোকাদা মাখে; কিন্তু মাহুত যদি নাইয়ে তাকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিতে পারে, তা হলে আর ধুলো-কাদা মাখতে পায় না।' শেষমুহূর্তে যদি ভগবানের নাম করে কেউ শুদ্ধ হতে পারে তার আর অশুদ্ধির কারণ ঘটে না। ঠাকুর আরো বলছেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘর একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালালেই আলো হয়ে যায়, অন্ধকার কি একটু একটু করে যায়? হাজার বছর অন্ধকার ছিল বলে সে অন্ধকার যেতে কি হাজার বছর লাগে? কিন্তু দেশলাই-এর কাঠি তো জ্বালাতে হবে। মন তো ভিজে দেশলাই হয়ে আছে, হাজার ঘসলেও কিছু হচ্ছে না। ত্যাগ বৈরাগ্য, সাধন ভজন, সৎসঙ্গ, নির্জনবাস, তাঁকে একান্ত আপনার বলে মনে করবার চেষ্টা—এইগুলি করতে করতে মন শুকনো বারুদের মতো হবে, তবে এক মুহূর্তে তা জ্বলে উঠবে। এ কাজ খুব কঠিন কিন্তু কঠিন বলে ছেড়ে দিলে তো হবে না চেষ্টা করতে হবে। আর বৃথা অনেককাল কেটে গিয়েছে ভেবে হতাশ হবার

কোন কারণ নেই, যে কোন মুহূর্তে তাঁর কৃপার অনুভব হবে তখন এক-সঙ্গেই সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে।

উপসংহারে শ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা দিচ্ছেন, 'ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, আর পাপ স্পর্শ করবে না।' সাধকেরাও বলেছেন অন্তিমে তাঁর চিন্তা করলে আর ভয় থাকবে না। কিন্তু শেষকালে ঈশ্বরচিন্তা আসবে কি না, তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতির দরকার আছে কিনা এ কথা ভাবতে হবে। যদি তা থাকে তাহলে আগে যতকিছু অনিষ্ট অন্যায় চিন্তা হয়ে থাকুক না কেন ভগবানের নামে সে সব নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যাবে। পুরাণে নাম-মাহাত্ম্যের এইরকম কাহিনী আছে যা বহুশ্রুতি। রাজা ব্রহ্মহত্যা করে ফেলে ঋষির কাছে গিয়েছেন পাপ থেকে মুক্তি কিসে হয় জানবার জন্য। ঋষি তখন বাড়ীতে নেই, তাঁর পুত্র আছেন। রাজা তাঁকে বললেন, আপনি কিছু উপায় বলে দিন। তিনি বললেন, তিনবার রামনাম কর। রাজা তিনবার রাম নাম করে চলে গেলেন, ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি হল। তারপর ঋষি ফিরে এসে সব শুনে বললেন, তুই করেছিস কি? এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে, আর তুই তাকে তিনবার রামনাম করালি অর্থাৎ নামে তোর বিশ্বাস নেই? নামে রুচি আনবার জন্য এ উপদেশ, নতুবা যেমন তেমন করে জীবন কাটালাম আর শেষকালে রাম বললে নিষ্কৃতি হয়ে যাবে, এ উপদেশের নিহিতার্থ তা নয়। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার সর্বদা আমরা যেভাবে চিন্তা করি আমাদের মন সেইভাবেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। মৃত্যুকালে কি তার অভ্যাস বদলাবে? অতএব মনকে তৈরী করবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে ভগবৎচিন্তা করতে করতেই জীবন শেষ হয়।

চার

২. ২৬. ১-২

মাস্টারমশায় এখানে কাশীপুর বাগানবাড়ীর এমন সুন্দর ও সজীব বর্ণনা করেছেন যে পাঠক যেন চোখের সামনে বাড়ীটি স্পষ্ট দেখতে পায়। **Telescope** দিয়ে বিজ্ঞানীরা চাঁদের মধ্যে পাহাড় আছে দেখেছেন সেই সম্পর্কে গিরিশ ও মাস্টারমশায়ের মধ্যে কথা হচ্ছে। অধুনা বিজ্ঞানীরা চাঁদে গিয়ে চাঁদের সঠিক খবর এনেছেন, ফটোও তুলে এনেছেন। তাই এখনকার বর্ণনাই যথার্থ, আগে কত রকমের কল্পনা ছিল চাঁদের সম্পর্কে।

এরপরের প্রসঙ্গে গিরিশের সঙ্গে ঠাকুরের ব্যবহার বিশেষ করে লক্ষণীয়। গিরিশ এসেছেন দেখে ঠাকুর লাটুকে বললেন, 'এঁকে তামাক খাওয়া আর পান এনে দে।' লাটু বললেন, 'পানটান দিয়েছি। দোকান থেকে জলখাবার আনতে যাচ্ছে।' লাটুর কথায় এই ভাবটা যেন ফুটে উঠল আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন আমরা তো দেখছি। তারপর ফুলের মালা এল। সেটি নিজে পরে আবার গিরিশের গলায় পরালেন। আর মাঝে মাঝে বলছেন, 'জলখাবার কি এল ?' অর্থাৎ ব্যস্ত হচ্ছেন। তারপর লাটু ঠাকুরের একটি ভক্তের কথা বলছেন, যাঁর ৭/৮ বৎসরের একটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। ছেলেটি ঠাকুরকে অনেকবার দর্শন করেছিল। ছেলেটির মা ছেলের শোকে পাগলের মতো হয়েছে। এই ছেলেটি কে তা পরিষ্কার করে বোঝা যায় না। তবে মাস্টারমশাই-এর ছেলে হতে পারে। মাস্টারমশায় 'একটি ভক্ত' বলে বলছেন, নিজের নাম তিনি করেন না। আর মাস্টারমশাই-এরও এইরকম শোক

হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ছেলের শোকে পাগলের মতো হয়েছিলেন। তারপরে গিরিশ বলছেন, 'অর্জুন অত গীতা-টীতা প'ড়ে অভিমন্যুর শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত। তা এঁর ছেলের জন্য শোক কিছু আশ্চর্য নয়।' তারপর গিরিশকে জলখাবার দেওয়া হল। ঠাকুরের দাঁড়াবার শক্তি নেই। বসে বসেই গিয়ে গিরিশের জন্য কলসী থেকে জল গড়ালেন। আবার হাতে করে দেখলেন জল ঠাণ্ডা কি না। জল তত ঠাণ্ডা নয়, পছন্দ হয়নি কিন্তু এর চেয়ে ভাল নেই বলে সেই জলই দিলেন।

গৃহীর ত্যাগ ও সন্ন্যাসীর ত্যাগ

তারপর গিরিশ বলছেন, দেবেনবাবু সংসার ত্যাগ করবেন। ঠাকুরের তখন কথা বলতে খুব কষ্ট হয়। আঙুল দিয়ে নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে ইঙ্গিত করলেন, 'পরিবারদের খাওয়াদাওয়া কিরূপে হবে—তাদের কিসে চলবে?' অর্থাৎ সংসারত্যাগ করা বললেই হয় না, পরিবারবর্গ যাঁরা আছেন তাঁদের কি ব্যবস্থা হবে? গিরিশ বলছেন, 'তা কি করবেন জানি না।' তারপরেই গিরিশের প্রশ্ন—'কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা?' কষ্টে সংসার ছাড়া অর্থাৎ ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে তবু জোর করে সংসার ছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম করলে, সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়। যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।' সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়ে যারা সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক। জ্ঞানী কিরকম? না, ঘরেও থাকতে পারে বাইরেও থাকতে পারে। 'ভিতর বার দুই দেখতে পায়'। সংসারে থেকেও সে ঈশ্বরে মন রাখতে পারে।

এখন গিরিশ বলছেন, 'মনটা এত উঁচু-আছে, আবার নীচু হয় কেন?' সকলেরই এই প্রশ্ন। কখনও মনটা একটু উঁচু হয় আবার নেমে যায়

সেখান থেকে। তাই ঠাকুর বলছেন, 'সংসারে থাকতে গেলেই ওরকম হয়। কখনও উঁচু কখনও নীচু। কখনও বেশ ভক্তি হচ্ছে আবার কমে যায়। কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় কি না, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বর চিন্তা, হরিনাম করে, কখন বা কামিনী কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। যেমন সাধারণ মাছি কখন সন্দেশে বসছে, কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে। ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরে দিতে পারে ; কেবল হরিরস পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না।' 'ঠিক ঠিক' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। শুধু ত্যাগী অর্থাৎ সংসার ত্যাগ করেছে বললেই হবে না। ঠিক ঠিক ত্যাগী হওয়া চাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই অন্য বাক্য মুখে আনে না। মৌমাছি কেবল ফুলে বসে মধু খাবে বলে, অন্য কোন জিনিস মৌমাছির ভাল লাগে না। ঠাকুরের দৃষ্টান্ত আরও আছে—চাতক পাখীর কথা বলেছেন। বিনা মেঘে সব জল ধুর—মেঘের জল ছাড়া চাতক অন্য জল খায় না, অন্য জল সব ধূলো। তাতে তার পিপাসার নিবৃত্তি হবে না। অর্থাৎ যে ভক্ত সে কেবল ভগবৎ আনন্দ চায়, সেই রস আস্বাদন করে অন্য রস তার কাছে প্রীতিকর নয়।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলছেন, 'ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই তবে তাঁতে সব মন হয়।' ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া সমস্ত মন ভগবানকে দেওয়া মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কার উপর হবে, কার উপর হবে না এ নিয়ে অনর্থক চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। চেষ্টা করতে হবে তারপরে ঈশ্বরের কৃপা আর কৃপা তিনি করবেন কি না তিনিই বুঝবেন, আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই। আমাদের পক্ষ থেকে কেবল যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্য সমস্ত জিনিস থেকে গুটিয়ে মনকে ঈশ্বরে দিতে পারি। অনাসক্ত

হয়ে সংসার করার কথা ঠাকুর বার বার বলেছেন। বলেছেন, সংসারে যারা প্রবেশ করেছে তাদের হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কারণ তাদের কতকগুলি কর্তব্য, দায়িত্ব রয়েছে। বেরিয়ে গেলেই হয় না। শুধু ভরণপোষণই যথেষ্ট নয় স্ত্রীপুত্রকে প্রতিপালন করা মানে অন্নসংস্থান করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাদের স্বনির্ভর করতে চেষ্টা করা— এগুলি সব করলে তবে কর্তব্য পালন হবে। আর কর্তব্যের তো শেষ নেই, পরম্পরায় চলছে। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাব, তার চাকরী, তার বিয়ে তারপর নাতিনাতনী এরূপ পরম্পরায় চলতেই থাকে। তাহলে কি বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই? সবেরই উপায় আছে ঠাকুর বলছেন! প্রথম উপায় বললেন, সংসারে থেকে অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। আবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, সংসারে থেকে চেষ্টা করে কখনও অনাসক্ত হলাম আবার মাঝে মাঝে আসক্তি এসে যায়। তার জন্য চঞ্চল হলে চলবে না। আবার অনাসক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা, সংগ্রাম পরম্পরা এরই নাম সাধন। কবে এই সংগ্রামের শেষ হবে? আত্মদর্শনের পর এই সংগ্রাম শেষ হবে তার আগে পর্যন্ত নয়। আত্মদর্শনের পর, ভগবানকে দেখার পর সে যেখানেই থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। সংসারে থাকলেও সে নির্লিপ্ত হয়ে থাকবে, সংসারের বাইরে থাকলেও নির্লিপ্ত হয়ে থাকবে। কাজেই তার পক্ষে সংসার আর কোনো বিপদের কারণ হয় না, প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। তার আগে পর্যন্ত সংসারের ভিতরে থেকে সংগ্রাম করতে হবে। ঠাকুর, কেল্লার ভিতরে থেকে লড়াই করার কথা বলেছেন। কেল্লার ভিতর খানিকটা নিরাপদ তাই তার ভিতরে থেকে লড়াই করতে হয়। এখন, নিরাপদ যদি তাহলে সকলকে কেল্লার ভিতরে থাকতে বললেন না কেন? বললেন না এইজন্য যে সবাই যদি কেল্লার ভিতরে থাকে, তাহলে যুদ্ধ হবে কেমন করে? কাজেই কেল্লার বাইরেও যেতে হবে। কিন্তু কেল্লার

বাইরে যেতে পারার সামর্থ্য যাদের আছে তারা যাবে। তাদের কোনো **protection** নেই, নিরাপত্তা নেই, তাদের সংগ্রাম আরও কঠোর। তাই বলেছেন, গৃহস্থের মন উঁচু নীচু হয় বটে কিন্তু তার ভিতরেও খানিকটা নিরাপত্তা আছে। আর যদি ভোগের দিকে প্রবৃত্তি যায়ও তবু তার জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না, তার ভিতর থেকেই সে সংগ্রাম করে চলতে পারে। একজন সর্বত্যাগীর দৃষ্টিতে হয়তো সংসারে থেকে সংগ্রাম করাটা ভাল না লাগতে পারে কিন্তু যার সেইরকম মনোভাব নয়, সর্বত্যাগের পথ যে নিতে পারেনি, সংসারে প্রবেশ করেছে পরে তার তো দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না। যেমন দেবেনবাবুর সংসার ত্যাগ করার কথা শুনে ঠাকুর বললেন, তার পরিবারের প্রতিপালন কে করবে? এইরকম ভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে সংসারে থেকে যাতে তাঁর দিকে মন রেখে চলতে পারে, সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা করা ভাল। মন কোথায় রাখবে তার উপর সব নির্ভর করছে। সংসারে যদি মন থাকে তাহলে সে সংসারের ভিতরেই থাক আর বাইরেই থাক তার সংসারেই থাকা হল। আর সংসার মনে যদি না থাকে তবে বাইরেই থাক আর ভিতরেই থাক তার সংসারে থাকা হল না। ঠাকুর বলছেন যে, আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে সেইখানে যে আমরা মন কোথায় রাখছি? ঠাকুর কাকেও হয়তো সর্বত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন আবার কাকেও বলছেন, না তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে না। ত্যাগের শিরোমণি যিনি, যিনি জোর দিয়ে বলেছেন ত্যাগ না হলে কিছু হবে না বাপু, সেই তিনিই আবার বলছেন, না, সংসার ত্যাগ করবে কেন? এরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য কি? তিনি কি আপোস করছেন তাঁর মতের? না, আপোস করছেন না। তিনি অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা করছেন। সর্বস্ব ত্যাগ কারো পক্ষে পথ্য আবার কারো পক্ষে একেবারে কুপথ্য। একই রকম ব্যবস্থা সকলের জন্য হওয়া

উচিত নয়। যখনই জগতে একরকম ব্যবস্থা করবার চেষ্টা হয়েছে তখনই দেখা গিয়েছে লক্ষ্যকে লোকে নীচে নামিয়ে ফেলেছে।

বৌদ্ধধর্মে অনেকসময় এই ত্যাগের উপরে এত জোর দেওয়া হয়েছে যে তার ফলে দলে দলে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে। তার পরিণতি কি হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সন্ন্যাসীর দল আদর্শকে ধরে রাখতে পারেনি। এইরকম অন্যত্র, অন্য কালেও হয়েছে। সুতরাং ত্যাগ সকলের জন্য নয়। আর যারা সংসারে আছে তারা সব হীন অধিকারী এই কথা বলে তাদের মনে, একটা দৈন্য সৃষ্টি করে দেওয়া, তাও উচিত নয়। যে সংসারী, সে সংসারী বলেই যে অধঃপাতে গেল তা নয়। আর একজন সংসার ত্যাগ করেছে বলেই যে সে সাধনার চূড়ায় উঠেছে তাও নয়। ঠাকুর বার বার করে এইকথা বলেছেন। অবশ্য ত্যাগের আদর্শকে তিনি কখনও ম্লান করেন নি, সে আদর্শ অতি উচ্চ আদর্শ; কিন্তু সেই আদর্শে পৌঁছাতে হলে গৃহস্থ এবং ত্যাগীকে সমান ভাবে সংগ্রাম করতে হবে। তবে ত্যাগী সংসার থেকে বাইরে গিয়ে কেবল মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে। আর সংসারী শুধু মনের সঙ্গে নয় তার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেও সংগ্রাম করছে। এটুকু পার্থক্য। সংগ্রাম উভয়কেই করতে হয় এবং কারো সংগ্রাম কম নয়। ত্যাগীরও যেমন সংগ্রাম আছে, সংসারীরও তেমনি সংগ্রাম আছে।

যীশুখ্রীষ্টের কাছে একবার একজন উপদেশ নিতে এসেছে, বলছে যে, আমি শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্ম কর্ম সব করেছি। আমার আয়ের দশম ভাগ আমি দান করি, আমি অমুক দিনে উপবাস করি এইরকম শাস্ত্রে যা যা করণীয় বলা আছে সব করেছি। আমার আর কি করতে হবে? যীশু বুঝলেন, তার ভিতরে সাধনের অহংকার হয়েছে। তাই তাকে বললেন, **Now leave all and follow me.** তাহলে তুমি সব ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে এস। কিন্তু তা আর তার পক্ষে সম্ভব হল না। তবে তার

অভিমান দূর হল। সে মনে করেছিল, আমি খুব ধার্মিক আমার আর করণীয় কিছু বাকী নেই। কিন্তু যীশু দেখিয়ে দিলেন, তুমি এক হিসাবে ধার্মিক বটে কিন্তু তুমি সব ছেড়ে আসনি। আবার সকলকেই তিনি সব ছেড়ে আসতে বলেন নি। সংসারে থেকে কি করে সংসার-জীবন যাপন করতে হবে তাও বলেছেন। তাহলেও যীশুর উপদেশে ত্যাগের উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। তার পরিণামে কি হয়েছে? পরিণাম এই হয়েছে যে, Protestant-রা ত্যাগের সেই আদর্শকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন আর ক্যাথলিক হয়তো সন্ন্যাসের আদর্শকে মেনে নিয়েছেন কিন্তু জীবনে অনেক সময় সেই আদর্শ অনুসরণ করতে পারেনি। এইজন্য কোনো একটা নিয়মকে সকলের উপর চাপিয়ে দিলে এবং সকলকেই সেই নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হবে বললে অনেকের পক্ষেই ধর্মজীবন যাপন করা সম্ভব হয় না। কাজেই যে যে পথের পথিক, যে যেরকম অধিকারী তারজন্য সেইরকম ব্যবস্থা দিতে হবে। ঠাকুর বলেছেন, যার যা পেটে সয়, যার যেরকম রুচি মা তাকে সেই রকম মাছ রান্না করে দেন। সেইরকম রকমারি সাধন পথ আছে। যার যেরকম রুচি যার যা পেটে সয় তার জন্য সেইরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা যদি না করা হয়, সাধনের ভিতরে যদি বৈচিত্র্য না থাকে, তাহলে হয় সে সাধন অনেকের নাগালের বাইরে হবে অথবা লোকে সেই সাধন করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে অবনত হয়ে থাকবে। মনে একটা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে সাধন করতে সে অক্ষম। এইরকম দুর্বলতা মানুষের উন্নতির প্রতিবন্ধক। যে যেপথে আছে সেই পথের উপর তার শ্রদ্ধা থাকা দরকার। গৃহস্থেরও নিজের পথের উপর শ্রদ্ধা থাকা দরকার। গার্হস্থ্য আশ্রমকেও বলা হয়েছে আশ্রম, সেটাকে একটা ভোগের জীবন বলে বলা হয়নি। আশ্রম মানে যাকে আশ্রয় করে মানুষ ধর্মজীবনে উন্নত হতে পারে। সন্ন্যাসাশ্রম যেমন আশ্রম তেমনি গৃহস্থের

আশ্রমও আশ্রম। সকলের পক্ষে সব পথ সমান উপযোগী নয়। যার পক্ষে সংসার উপযোগী তাকে সংসারের ভিতর দিয়েই যেতে হবে। অন্য ভাবে যেতে গেলে তার পক্ষে তা হানিকর হবে। আবার যার পক্ষে ত্যাগের জীবন উপযোগী তাকে যদি জোর করে সংসারাশ্রমের ভিতর নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তার জীবনটা বিষময় হয়ে যাবে। আমরা ঠাকুরের সন্তানদের দেখেছি কাকেও তাঁরা ত্যাগে উৎসাহ দিচ্ছেন, বলছেন, হ্যাঁ ত্যাগ করবে বই কি। আবার কাকেও বলছেন, সে কি! কোথায় যাবে ত্যাগ করে? সংসার ছেড়ে যাবে কোথায়? এর ভিতর দিয়েই ভাল ভাবে জীবন কাটাতে হবে। দুই রকম কথাই বলছেন। কথা দুটি আপাতবিরোধী বলে মনে হবে। কিন্তু অধিকারী ভেদে দুটিরই প্রয়োজন। সবাইকে এক কথা বললে হবে না। যে উত্তম বৈদ্য সে রোগ বুঝে, রোগীর অবস্থা বুঝে পথ্য নির্দেশ করে দেয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের এক বিশেষ বন্ধুর কথা স্মরণ হয়। তার ভিতরে খুব ত্যাগের ভাব ছিল কিন্তু তার গুরু তাকে বললেন, না তোমাকে সংসারের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ত্যাগ সকলের জন্য নয়। তখন তার পক্ষে এই কথাটা যেন অত্যন্ত আঘাত স্বরূপ বলে মনে হয়েছিল। অর্জুন যেমন বলেছেন, 'কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব'॥ (৩/১)—এই ভয়ঙ্কর কর্মে কেন আমাকে নিযুক্ত করছ? আমাদের বন্ধুরও মনে হচ্ছিল কেন তাকে এই ঘোর সংসারে প্রবেশ করতে বললেন? কিন্তু তারপরে শেষজীবনে সে বলেছে যে, আমরা তো বুঝি না, তাঁরা সর্বদর্শী তাঁরা বোঝেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, আমার অধিকার এর ভিতরেই ছিল, বাইরে নয়। তার জীবন যে খারাপ ছিল তা নয়, তবে সেই জীবন সংসারের ভিতরে থাকার উপযুক্ত ছিল। সংসার করেও ঈশ্বরের প্রতি তার অনুরাগ স্তিমিত হয়ে যায় নি। কিন্তু যদি ত্যাগের জীবন নিত হয়তো তার পক্ষে তা হানিকর হোত। ত্যাগীর

জীবনকে ঠাকুর খুব প্রশংসা করেছেন, এখানেও বলছেন, ত্যাগীর কথা আলাদা, তারা কামিনীকাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে। কিন্তু তার মানে কি এই যে তাদের আর সংগ্রাম করতে হয় না? সংগ্রাম উভয়কেই করতে হয়, তবে তাদের সংগ্রাম সূক্ষ্মস্তরের সংগ্রাম, এইজন্য সেই সংগ্রাম আরও প্রবল, আরও প্রচণ্ড আর যারা সংসারে থাকে তাদের সংগ্রাম অত সূক্ষ্ম নয়, স্থূল। তাই সে সংগ্রাম অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই ঠাকুর দেবেনবাবুকে সংসার ত্যাগ করতে পরোক্ষভাবে নিষেধ করলেন, তাঁর সংসার ত্যাগের কথা সমর্থন করলেন না। আবার ত্যাগীর কথায় বললেন, তাদের কথা আলাদা। তারা সব মনটা ঈশ্বরে দিতে পারে। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল, সংসারে যারা আছে তাদেরও মনে রাখতে হবে যে সব মনটা ভগবানকে দিতে হবে এটাই হল আদর্শ। সেই আদর্শকে ভুললে চলবে না। আমি হয়তো পারছি না তা বলে আদর্শটিকে নীচে নামিয়ে আনলে চলবে না।

সর্বত্যাগই আদর্শ

সকলেরই মনে রাখতে হবে যে সর্বত্যাগ হচ্ছে জীবনের আদর্শ। সংসারীও তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, যে সংসার ত্যাগী সেও তার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে। যে ত্যাগী সে যদি সেই চেষ্টাতে পূর্ণসফল নাও হয় তবুও সে একটা উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করে চলছে। এইজন্য ত্যাগীর জীবন এত সম্মানের। স্বামীজীর মত লোকও স্পষ্ট করে বলছেন, যে সাধু হয়েছে একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে সে সাধু হয়েছে। জীবনে একটা নতুন পথ অন্বেষণ করে চলা, গতানুগতিকতাকে পরিহার করে চলা এটা কম কথা নয়। খুব দৃঢ় একটা সংকল্প না হলে মানুষ করতে পারে না। সুতরাং সে এই সংকল্পে সিদ্ধ যদি না-ও হয় তাহলেও সে চেষ্টা করেছে

এইজন্য তাকে সম্মান দিতে হবে। আর একজন গৃহস্থ সে হয়তো ভাল লোক কিন্তু ভাল লোক হলেও ত্যাগের আদর্শ তার জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি সেজন্য সে সংসারী। সুতরাং তাকে সম্মান করা হবে ভাল লোক বলে কিন্তু একজন সাধুর চেয়ে তাকে উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না।

আবার শাস্ত্রে এমনও বলা হয়েছে যে, সংসারাশ্রম হচ্ছে অন্য সব আশ্রমের আধার কারণ সংসারাশ্রম অন্য সব আশ্রমকে পালন করছে। সংসারী যদি অন্নের সংস্থান না করে তাহলে ব্রহ্মচর্য কোথায় দাঁড়ায়? বানপ্রস্থ কিভাবে থাকবে? সন্ন্যাসীর জীবন কি করে চলবে? কাজেই চার আশ্রমের ভিত্তি হল এই সংসারাশ্রম কিন্তু ভিত্তি মানে সেটাই যে শীর্ষ তা নয়। তবে গৃহস্থেরও উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। তাদেরও মনে রাখতে হবে যে ত্যাগের আদর্শ আরও উচ্চ আদর্শ যা আমরা অনুসরণ করতে পারিনি, করার উপযুক্ত নই, কিন্তু যাঁরা সেই আদর্শ অনুসরণ করে চলেছেন তাঁদের চলার পথে আমাদের সাহায্য করা দরকার। এইজন্য শাস্ত্রে বলেছেন, সংসারাশ্রম হচ্ছে চতুরাশ্রমের—অপর তিনটি আশ্রমের ভিত্তি, পায়া। তবে ভিত্তি বলে একে শ্রেষ্ঠ বলা চলবে না, তাহলে উচ্চ আদর্শ লুপ্ত হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। একবার একজন গৃহস্থ ভক্তের ছেলে সাধু হতে চায়। ভক্তটি আমাকে ধরেছেন তাঁর ছেলেকে বোঝাতে হবে যে সন্ন্যাস অপেক্ষা সংসারাশ্রমই শ্রেয়। আমি বললাম, আমি যদি ছেলেকে বলি সংসারাশ্রমেও আদর্শে পৌঁছান যায়, ত্যাগের দ্বারাও আদর্শে পৌঁছান যায় তাহলে হবে তো? তিনি তাতে খুশী নন। তাহলে তো দুপথই খোলা রয়ে গেল। ছেলেকে বোঝাতে হবে যে ত্যাগের আশ্রমের চেয়ে সংসারাশ্রম শ্রেষ্ঠ। রাত বারোটা অবধি এই নিয়ে আমাকে বোঝাচ্ছেন। তারপরে আমি বললাম, দেখুন, আপনার

ছেলেকে এই কথা বোঝাতে হলে আমাকে সন্ন্যাস ত্যাগ করে বোঝাতে হবে। তখন তিনি চুপ করে রইলেন। বুঝলেন যে অতটা বলা সম্ভব নয়। আমরা বলব এক আর করব আর এক বললে তো হবে না। সন্ন্যাসাশ্রমে থেকে যদি বলি সংসারাশ্রম শ্রেষ্ঠ তাহলে সে কথার তাৎপর্য থাকে কি? তাহলে আমাকে সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়তে হবে। আর তার বিপরীত ক্রমে সংসারী যদি ত্যাগীর জীবন শ্রেষ্ঠ বলে তাহলে তাকেও কি সংসারাশ্রম ছাড়তে হবে? না, সে বলবে ঐ ত্যাগের আদর্শে সংসারে থেকেও পৌঁছান যায়। ঠাকুর তাই বলেছেন, তোমাদের অন্তরে ত্যাগ। অন্তরে ত্যাগ সকলের তো দরকারই। অন্তরে ত্যাগই হল আসল ত্যাগ একথা সকলে জানেন। কিন্তু যাঁরা ত্যাগের জীবন যাপন করছেন তাঁদের জন্য অন্তরে বাইরে ত্যাগ। সংসারীরা অনাসক্ত হয়ে সংসার করবে অর্থাৎ মনে করবে এ অবস্থায় আমাকে ঈশ্বর রেখেছেন, আমি ইচ্ছা করলেই এর থেকে বেরিয়ে যেতে পারি না তাতে কর্তব্যে ত্রুটি হয়। এইজন্য বলছেন, তোমাদের অন্তরে ত্যাগ। কর্তব্যে ত্রুটি করে তুমি সংসার ছেড়ে যেতে পার না।

পাগলের উপর আইন খাটে না

অনেক সময় আমরা এমন দেখেছি যে, একজনের জীবন ত্যাগের ভাবে ভাবিত অথচ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল তখন তাকে খুব সংগ্রাম করতে হয়; কিন্তু এই সংগ্রাম ছেড়ে গেলে চলবে না চালিয়ে যেতে হবে। না হলে সে এগোতে পারবে না কিন্তু প্রশ্ন হল তাহলে তো কারোরই সংসার ত্যাগ করা চলবে না। ঠাকুর তার উত্তরে বলেছেন, কর্তব্য কতদিন করতে হবে? যতদিন সংসার তোমার উপর নির্ভর করে থাকে ততদিন। কিন্তু চিরকালই যদি আমার উপর নির্ভর করে থাকে তাহলে কি হবে? তখন আর একটি খুব দরকারী কথা বলেছেন

—যে ভগবানের জন্য পাগল হয় তার কোনো কর্তব্য থাকে না। পাগলের উপর কোনো আইন খাটে না। অতএব যে পাগল হয়েছে তার উপর শাস্ত্রের কোনো আইন আর খাটবে না।

'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥' (গীতা ৩।১৭)

—এত কর্তব্যের কথা বলার পর ভগবান বললেন, যে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতে সন্তুষ্ট তার আর কোনো কর্তব্য নেই, সে সব কাজের বাইরে। ঠাকুর একথাই অন্যভাবে বলছেন, যে পাগল হয়েছে সংসারের আর কোনো কর্তব্য তার জন্য নয়। গোপীরা যখন ভগবানের বংশী-ধ্বনি শুনে ঘরবাড়ী ছেড়ে গেলেন, ভগবান তাদের বোঝাচ্ছেন তোমরা সংসার ছেড়ে চলে এসেছ এটা ভাল হয়নি। সেখানে তোমাদের কর্তব্য ছিল স্বামী পুত্রাদির পরিচর্যা করা, গুরুজনের সেবা করা, এসব ছেড়ে তোমরা চলে এসেছ, এতে তোমাদের নিন্দা হবে, কর্তব্যের হানি হবে, তোমরা ফিরে যাও। কিন্তু গোপীরা ফিরে যাননি। কেন যান নি? তারা বলছেন যে, আমাদের মন তোমাতেই নিবিষ্ট সেক্ষেত্রে কেবল শরীরটা ফিরে গেলে কি কাজ হবে? মন ছাড়া কি শরীর কোনো কাজ করতে পারে? এই হল পাগল হওয়া। পাগলকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। যে ভগবানের জন্য পাগল হয়েছে সংসারে তার কোনো কর্তব্য নেই।

'ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।' (৩।২২)

—ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই। কেন নেই? যেহেতু আমি কোনো কর্তৃত্ববুদ্ধি রাখি না।

'যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥' (১৮।১৭)

—যার অহংকার ভাব নেই, আমি করছি এই বুদ্ধি যার নেই,

কর্মেতে যার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, কর্মফলের কর্তারূপে যে লিপ্ত হয় না, সে যাই করুক তার ফলের দ্বারা তাকে লিপ্ত করা যায় না। সে সমস্ত লোককে হত্যা করেও হত্যাকারী হয় না। এটি শুধু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে একটা ভুয়া কথা মাত্র নয়। সে তখন কর্তব্যাকর্তব্যের পারে, তার উপর আর কোনো বিধি বা নিষেধ প্রযোজ্য নয়। বলছেন, বিধি কার পক্ষে প্রযোজ্য? যে কর্তা তার পক্ষে। আমি করি, আমি করতে পারি এই বোধ যতক্ষণ রয়েছে শাস্ত্র বলবেন, তুমি কর। নীতি বলবে আইন বলবে, তুমি কর; কিন্তু যখন সে আর করতে পারে না তখন নীতিও বলবে না তুমি কর, শাস্ত্রও বলবে না তুমি কর। এই হচ্ছে আসল রহস্য। ঠাকুর তাকেই বলেছেন, ভগবানের জন্য পাগল হওয়া। তেমন হলে তার জন্য আর কোনো বিধান নেই। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত যতক্ষণ আমি কর্তা এই বোধ আছে ততক্ষণ তিনি যত উচ্চস্তরেই উঠুন, ভগবানের জন্য তাঁর মনে যত ব্যাকুলতাই হোক না কেন কর্তব্যের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন না। যখন আমি কর্তা এই বোধকে পরিত্যাগ করেছেন তখন আর তার কোনো কর্তব্য থাকে না। চিরকাল সকলকে যে কর্তব্য করে যেতে হবে তা নয়। কোন্‌খানে কর্তব্য থেকে মুক্তি? কোন অবস্থায়? না, আমি কর্তা এই বোধ যখন চলে গেছে তখন। আর যিনি তিনগুণের অতীত হয়েছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তার পক্ষে বিধি কোথায় আর নিষেধ কোথায়? যদি আমি কর্তা এই বুদ্ধি না থাকে তাহলে তার আচরণের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না বা আচরণের ভিতর দিয়ে তাকে বিচার করা যায় না। যে শুদ্ধ-সত্ত্ব, 'আমি' বুদ্ধি রাখে না তার আর কোনো কর্তব্য নেই সুতরাং তার বিচারও অন্যদিক দিয়ে হবে। 'ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আচরণ যেমনই হোক তিনি ব্রহ্মজ্ঞ'—এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে, তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তখন তার শরীর দিয়ে দশটা খুনও হয়ে

গেলেও তিনি তার দ্বারা লিপ্ত হন না। কারণ তাঁর অহংভাব নেই। একটা তলোয়ার দিয়ে যদি একশোটা খুন করা হয় তাহলে সেই তলোয়ারের কি ফাঁসী হবে? কারণ তলোয়ারের অহংভাব নেই, সে তো করেনি। ঠিক সেইরকম জ্ঞানী পুরুষ যখন নিজেকে অকর্তা বলে মনে করেন তখন তাঁর কর্মের দ্বারা আর তাঁকে বিচার করা চলবে না। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত।

এখানে আবার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি তাঁর দ্বারা নানারকম দুষ্কর্ম ঘটবে? তার উত্তরে বলছেন যে, না তা ঘটবে না কারণ তিনি যে ভালকর্ম করেন তা ভাল কর্ম করব বলে করেন তা নয়, আর তিনি যে মন্দ কর্ম করেন না সেটাও করব না বলে সংকল্প করেছেন তা নয়। এমনিই তাঁর দ্বারা মন্দ কর্ম হয় না। কেন হয় না? যেহেতু মন্দ কর্মগুলো জ্ঞান বিরোধী তাই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে হতে তাঁর শুভকর্মের দ্বারা মন্দ কর্মের বাসনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেইজন্য জ্ঞানী পুরুষের দ্বারা নিন্দিত কর্ম আর অনুষ্ঠিত হবে না। ঠাকুর বলেছেন, তার বেতালে পা পড়বে না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে যে তালে তালে পা ফেলবেন তা নয়। নিজের ইচ্ছা বলে তাঁর কিছু নেই এমনিই পা যখন চলে তা কক্ষণো বেতালে চলে না। এইটি হচ্ছে তাঁর অভ্যাসের পরিণতি।

ঠাকুরের সব বেআইনী

ঠাকুরের কাছে গিরিশের আব্‌দারের শেষ নেই। অগাধ বিশ্বাস বলে তিনি ঠাকুরের উপর নির্ভর করেন। তিনি জানেন ঠাকুর ইচ্ছা করলে সব করে দিতে পারেন। এখানে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতি ত্যাগী ভক্তদের সম্পর্কে প্রশংসা করে বলছেন, ওরা জেনেছে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা। এখন আর এরা সংসারে লিপ্ত হবে না! 'যেমন

পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতরে বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই।' গিরিশ শুনে বলছেন, 'মহাশয়, ওসব আমি বুঝি না। মনে করলে সব্বাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী কি ত্যাগী সব্বাইকে ভাল করে দিতে পারেন। মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়—' এই হল গিরিশের কথা। ঠাকুর তাঁর কথা সংশোধন করে বলছেন, 'সার না থাকলে চন্দন হয় না। শিমূল আরও কয়েকটি গাছ, এরা চন্দন হয় না।' কিন্তু ঠাকুরের উপর গিরিশের বিশ্বাস এত প্রবল যে তিনি তা মানছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আইনে এরূপ আছে।' আর গিরিশ বলছেন, 'আপনার সব বেআইনি।' গিরিশের এই অদ্ভূত বিশ্বাসের কথা ভক্তেরা অবাক হয়ে শুনছেন। মণি ঠাকুরকে বাতাস করছিলেন, গিরিশের কথা শুনে এক একবার তাঁর হাত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গিরিশের কথার প্রতিবাদ না করে ঠাকুর বলছেন, 'হাঁ তা হতে পারে ; ভক্তি নদী ওথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল' অর্থাৎ ভক্তে যখন ভক্তিতে উন্মাদ হয় তখন তার প্রতি এইসব নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। তাই বলছেন, 'যখন ভক্তি-উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না!' কোনো নিয়ম কানুনের সে ধার ধারে না। তাই মাস্টারকে বলছেন, 'ভক্তি হ'লে, আর কিছুই চাই না!'

ভাব আশ্রয় করে সাধনা

তারপর ঠাকুর বলছেন, ভগবানকে ভক্তি করতে হলে 'একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্যফখ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সবও ছিল ; আবার মধুর ভাব।' রামাবতারে ঋষি মুনিদের ছিল শান্ত ভাব। তাঁরা রামকে ভগবৎ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সেইভাবে তাঁর উপাসনা করতেন। হনুমানের ছিল দাস ভাব। দশরথ, কৌশল্যা প্রভৃতির ছিল বাৎসল্য ভাব আর সুগ্রীব ও বিভীষণের ছিল

সখ্যভাব। কৃষ্ণাবতারে ওসবও ছিল, আবার ছিল মধুর ভাব। যারা রস অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, মধুর রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য—সব রসেরই সমন্বয় হয়েছে। ঠাকুর বলছেন, 'শ্রীমতির মধুর ভাব—ছেনালী আছে, সীতার শুদ্ধ সতীত্ব—ছেনালী নাই।' সীতার ভাবের মধ্যে যে পার্থক্য করছেন এর ভিতর শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের কোনো প্রশ্ন নেই। সীতার ভাব সতীত্বের ভাব। শ্রীরামচন্দ্রকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন তিনি, এই ভাব। শ্রীমতির যে ভাব—শ্রীকৃষ্ণকে জার বুদ্ধিতে দেখা—সেভাব সেখানে নেই। যে ভাবটি যার পক্ষে উপযোগী সে সেই ভাব অবলম্বন করে। এর ভিতরে কোনটি শ্রেষ্ঠ, কোনটি নিকৃষ্ট এই স্তর বিভাগ হয় না। যার যে ভাব সেটি তার পক্ষে উত্তম। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, যে ভাবই হোক তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য ভাব আছে। যেমন, ভগবানকে যখন কেউ নিজের আত্মারূপে দেখে তার ভিতরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—কোনোটিই হয়তো পড়ে না, ভক্ত এবং ভগবান সেখানে এক হয়ে যায়। কাজেই অন্য দিক দিয়ে দেখলে সে ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব আছে কিন্তু সকলে তো সেইভাবের অধিকারী নয় কাজেই একটি ভাব তাঁর উপর আরোপ করে, তাঁকে ভাবনা করা এটি হল ভক্তদের পক্ষে প্রশস্ত পথ।

প্রসঙ্গ ক্রমে ঠাকুর সেই পাগলীর কথা, বললেন যে তাঁর উপর মধুরভাব আরোপ করত। কিন্তু ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, আমার সমস্ত স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি। পাগলী তা বুঝত না। এইজন্য তার অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হোত। কিন্তু ভক্তেরা যাঁরা তার ভাব বুঝতেন তাঁরা তাকে শ্রদ্ধা করতেন যদিও ঠাকুরকে বিরক্ত করত বলে কেউ তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাই গিরিশ বলছেন যে 'সে পাগলী—ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক্ আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে!'

এইখানে মনে রাখতে হবে যে, গোপীরা ভগবানকে কান্তরূপে দেখতেন বলে তাঁকে ভগবৎ বুদ্ধিতে দেখতেন না তা নয়। কারণ ভাগবতে রয়েছে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর যখন বিলাপ করছেন তখন বলছেন, 'ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্' (ভাগবতম্ ১০. ৩২. ৪)—তুমি কেবল গোপীগণের আনন্দদায়ক শ্রীকৃষ্ণ নও, অখিল প্রাণিসমূহের অন্তরাত্মারূপে তুমি তাদের অন্তর দেখছ। সুতরাং তিনি যে সকলের অন্তরাত্মা এ বিষয়ে গোপীদের যে জ্ঞান ছিল না তা নয়, কিন্তু গোপীরা তাঁকে সেইরূপে দেখতেন না, তাঁকে প্রিয়বুদ্ধিতে দেখতেন, কান্তবুদ্ধিতে দেখতেন। এটি হল গোপীদের ভাব কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। যদি তা না জানতেন তাহলে সেটা জার বুদ্ধি হোত। জার বুদ্ধি নয়, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইষ্টবুদ্ধি ছিল, কিন্তু ভগবানে কান্তভাব তাদের ছিল। এই ভগবৎ ভাব যদি তাঁদের না থাকত, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেবল মানুষরূপেই দেখতেন তাহলে ভগবানের উপাসনা করে তাঁদের পরাভক্তি লাভ হোত না। নারদ ভক্তিসূত্রে বলছেন, ব্রজগোপীরা যদি ভগবৎ বুদ্ধিতে তাঁকে না দেখতেন, তাহলে তাঁরা জাররূপে তাঁকে দেখতেন মাত্র, তাতে তাঁদের কল্যাণ হোত না। যদিও ভাগবতে এ কথাও বলা আছে গোপীরা জারবুদ্ধিতে তাঁকে উপাসনা করেও পরম কল্যাণ লাভ করেছিলেন। তার মানে হচ্ছে তাঁর উপরে সর্বপ্রকার ভাব আরোপ করা চলে। আর জারবুদ্ধি বিশেষ করে এইজন্য যে তাতে যে উন্মাদনা আছে, তীব্রতা আছে তা আর অন্য কোথাও নেই। এইজন্য এখানে জারবুদ্ধি গোপীদের কাছে আত্মলাভের উপায় এবং গোপীদের এই ভাবই সমস্ত ভাগবতের ভিতরে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে মনে রাখতে হবে যার পক্ষে যেটি উপযোগী তার সেই ভাবটিই অবলম্বনীয়। অন্যের পক্ষে যা উপযোগী, অনুকরণ করে তা করতে গেলে তাতে কল্যাণ

হয় না। যার যে ভাব আছে সেইটিই তার কাছে পরম কল্যাণ লাভের উপায়। হনুমানের দাস্যভাব সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাবের থেকে নিকৃষ্ট একথা বলা যায় না। হনুমানের যে ভাব—ভগবানের জন্য সমস্ত দেহমন অর্পণ করা—সে ভাবের তুলনা কি অন্যত্র আছে? কাজেই কোনো ভাবটিকেই আমরা ছোট বলে মনে করতে পারি না। ভক্তি শাস্ত্রে দাস্যভাবের আদর্শ দেখাবার জন্য যেন হনুমানের উৎপত্তি। আদর্শ দাস কিরকম হতে হয় হনুমান নিজের জীবন দিয়ে তা দেখাচ্ছেন। এইরকম একটি একটি ভাবের আদর্শ শাস্ত্রে দেখান আছে। যার পক্ষে যেটি অবলম্বনীয় সে সেইটি অবলম্বন করে ঐ চরম আদর্শকে পাবার চেষ্টা করবে। এই কথাটুকু এখানে মনে রাখতে হবে।

তারপরে গিরিশ বলছেন, 'মহাশয়, কি বলবো! আপনাকে চিন্তা ক'রে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি!' কিরকম করে দোষগুলি গুণে পরিণত হয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাচ্ছেন সেটি। তার আলস্য যা চেষ্টার বিরতি এখন তা ঈশ্বরে নির্ভরতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলস্য এখন আর তাঁর দোষ নেই গুণে পরিণত হয়েছে। 'পাপ ছিল তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি' অর্থাৎ আমি নিষ্পাপ বলে যে অহঙ্কার করব সে অহঙ্কার আর নেই। কাজেই আলস্য তাঁর কাছে কল্যাণকারী কারণ তা নির্ভরতায় পরিণত হয়েছে। আর পাপ তাঁর কাছে কল্যাণকারী কারণ তা তাঁর অহঙ্কার দূর করেছে।

নিরঞ্জনের তীব্র বৈরাগ্য কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অপরের ভাব বোঝবার চেষ্টা করেননি। পাগলীর ভাবকে বুঝতে না পেরে তিনি তার উপর বিরক্তি প্রকাশ করছেন, বলছেন, 'আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।' রাখাল বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'কি বাহাদুরী! ওঁর সামনে ঐসব কথা!'

অর্থাৎ যদিও পাগলী মধুর ভাব অবলম্বন করে ঠাকুরকে সেই দৃষ্টিতে দেখে এবং ঠাকুরও তাঁর মাতৃভাব বলে ঐ ভাবকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, তবু রাখাল জানেন যে, ঠাকুরকে যে যেভাবেই ভালবাসুক না কেন তাতেই তার কল্যাণ হবে। তাই বলছেন, ওঁর সামনে ঐসব কথা! অর্থাৎ ঠাকুর কিছু না বললেও মনে ক্ষুণ্ণ হবেন, কারণ সে পাগলী হলেও ভক্ত, সে একটা ভাব আশ্রয় করেছে। সেই ভাবকে প্রশ্রয় না দিলেও ঠাকুর ভক্তরূপে তাকে সমাদর করেন। এই কথাটি রাখাল বোঝাতে চাচ্ছেন।

তারপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে অর্থের মূল্য বলছেন, 'কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন করলে একদিন হয় তো সব বেরিয়ে যায়।' ঠাকুর এই তুটি কথা বার বার বলেছেন, কামিনী ও কাঞ্চন। কাঞ্চন মানে কি? যার দ্বারা আমরা ভোগের বস্তু সংগ্রহ করতে পারি তাকে বলি কাঞ্চন বা অর্থ। অর্থ হল কাম্য বস্তু লাভের উপায়, কিন্তু পরে সেটিই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে টাকা সংগ্রহ করেই আনন্দ পায়। সেই টাকা যে তাদের ভোগের উপকরণ দিতে পারে সে-কথাটা আর মনে থাকে না এবং সেই টাকা দিয়ে ভোগের উপকরণ সংগ্রহও করে না। কেবল অর্থ ই সংগ্রহ করে চলে এবং জমিয়ে রাখে। ঠাকুর বলছেন, একেই বলে কাঞ্চনে আসক্তি। কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্তি—এই তুটি আসক্তিই মানুষের ভিতরে প্রবল।

তারপরে বলছেন, অর্থ উপার্জন করে সৎব্যয় হওয়া দরকার। 'যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধুভক্তের সেবা করে, দান করে তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।' আর তা না হলে খালি যদি টাকা জমিয়ে রাখে তাতে কোনো লাভ হয় না, একদিন সব টাকা কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তখন সেই টাকার শোকে তুঃখ করে মরে।

বলছেন, 'আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে'। অর্থাৎ জমির জল যাতে বেরিয়ে না যায় তার জন্য মাটি উঁচু করে দেয় চারপাশে। 'যারা খুব যত্ন করে চারদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙে যায়। যারা একদিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়।' অর্থাৎ অর্থ কেবল সংগ্রহ করলেই হয় না যাতে তার সদ্ব্যয় হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। ঠাকুরসেবা সাধুভক্তের সেবা, দান, এসব হল অর্থের সদ্ব্যবহার। অর্থকে যখন আমরা উদ্দেশ্য বলে মনে করি, উপায় বলে নয় তখনই অর্থের আকর্ষণ আমাদের বদ্ধ করে। অর্থ যখন শুধু নিজের ভোগের উপাদান সংগ্রহ করবার উপায় নয়, ঠাকুর-সেবা, সাধুসেবা, লোকের প্রয়োজনে বা গরীবকে অর্থদান—এইসব করার উপায় হয় তখন অর্থের একটা উপযোগিতা আছে। সেই অর্থ মানুষের আসক্তির কারণ হয় না।

তারপর ঠাকুর বললেন, 'আমি ডাক্তার, কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন রক্ত পুঁজ!' মনে রাখতে হবে ঠাকুর এইখানে সেইরকম ডাক্তারদের কথাই বলছেন যারা রোগীর বিপদের সময় চাপ দিয়ে অর্থ আদায় করে। না হলে চিকিৎসা করে রোগীর কাছ থেকে কোনো অর্থ না নিলে ডাক্তারের চলবে কি করে? জীবিকার জন্য পরিমিত অর্থ নিলে দোষ হয় না কিন্তু লোকের বিপদের সুযোগ নিয়ে চাপ দিয়ে অর্থসংগ্রহ করার তিনি বিরোধী। যারা ভক্ত, অর্থের সদ্ব্যবহার করে তাদের ঠাকুর দোষ দিচ্ছেন না। মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুর কখনও ঐ চোখে দেখেননি বা তাঁকে দোষ দেননি। কারণ প্রথমতঃ মহেন্দ্রলাল সরকার রোগীদের কাছ থেকে কখনও চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতেন না, দ্বিতীয়তঃ টাকা যা পেতেন তার সদ্ব্যবহারও তিনি করতেন। লোকের কল্যাণের জন্য তা ব্যয় করতেন। কাজেই সেরকম

ডাক্তারদের সম্পর্কে ঠাকুরের একথা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আমাদের ভাষায় যাদের বলি চশমখোর ডাক্তার, যারা লোকের বিপদে, দুঃখে তাদের উপর চাপ দিয়ে অর্থ আদায় করে তাদের কথাই ঠাকুর বলছেন। শুধু ডাক্তার নয় উকিলের কথাও বলেছেন। লোকে বিপদাপন্ন হয়ে উকিলের কাছে যায়। উকিলরা যদি সেই বিপদের সুযোগ নিয়ে অন্যায্য ভাবে অর্থসংগ্রহ করে তাহলে তাদেরও ঐ একই দোষ হয়। বলছেন, উকিলরাও লোকের সেবা হিসাবে তাদের কাজ করতে পারে। ডাক্তার যেমন ওষুধপত্র দিয়ে সেবা করে, উকিলও তেমনি আইন পরামর্শ দিয়ে লোকের কল্যাণ করতে পারে। সেইরকম উকিল হলে তার দোষ নেই কিছু। **P. R. Das** ছিলেন **C. R. Das**-এর দাদা। সেই **P. R. Das** বহু টাকা রোজগার করতেন কিন্তু নিজের জন্য ব্যয় করতেন অতি অল্পই। খুব সাধারণ ভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন কিন্তু উপার্জিত সমস্ত টাকাই দান করে ফেলতেন। এমন কি এত দান করতেন যে তাঁকে দেনায় পড়তে হত। পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আয় হত ষাট হাজার টাকা তাঁর দানে খরচ হয়ে যেত। এইরকম দানশীল যাঁরা তাঁরা উকিল, ডাক্তার যে-ই হোন, তাঁর পক্ষে ওটা দোষ নয়। দোষের হল লোকের বিপদকে সুযোগ বলে মনে করা।

পাঁচ

২. ২৭. ১-৭

গুণাতীত বালক

আর একদিনের প্রসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থার কথা মাস্টার শশী রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। মাস্টার বলছেন, 'তিনি ত গুণাতীত বালক', তিনগুণের অতীত, কোন গুণের বশ নন। রাখাল দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 'যেমন একটা টাওয়ার। সেখানে বসে সব খবর পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেউ যেতে পারে না, কেউ নাগাল পায় না।' অর্থাৎ ঠাকুর যে অবস্থায় আছেন, মনের যে স্তরে অবস্থান করছেন, সেখান থেকে তিনি অপর সকলের ভাব বুঝতে পারেন, সব দেখতে পান কিন্তু তাঁর স্বরূপকে কেউ বুঝতে পারে না। কারণ সেই স্তরে কেউ পৌঁছতে পারে না। মাস্টার বলছেন, ঠাকুর বলেছেন 'এ অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে। বিষয় রস নাই, তাই শুষ্ক কাঠ শীঘ্র ধ'রে যায়'। ঠাকুরের মতো তীব্র বৈরাগ্যপূর্ণ মন হলে ঈশ্বর দর্শন হতে পারে। বিষয়ে মন মগ্ন হয়ে থাকে বলে লোকের ঈশ্বর সম্বন্ধে উদ্দীপনা জাগে না।

তারপর শশী বলছেন, 'বুদ্ধি কত রকম, চারুকে বলছিলেন। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়, সেই ঠিক বুদ্ধি। যে বুদ্ধিতে টাকা হয়, বাড়ী হয়, ডেপুটির কর্ম হয়, উকীল হয় সে বুদ্ধি চিঁড়ে ভেজা বুদ্ধি।' অর্থাৎ এমন নিকৃষ্ট স্তরের দই যা দিয়ে কেবল চিঁড়ে ভেজান যায়, তার কোনো স্বাদ নেই। সে দই উঁচুদরের দই নয়। যে বুদ্ধিতে ভগবান লাভ হয়

সেই বুদ্ধি শুকনো দই-এর মতো উৎকৃষ্ট। ঠাকুর আরও বলেছেন, সা চাতুরী চাতুরী। সেই বুদ্ধিই ঠিক বুদ্ধি যাতে ভগবান লাভ হয়।

কালী তপস্বী, পরে যিনি স্বামী অভেদানন্দ হয়েছেন তাঁর কথা হচ্ছে। ঠাকুরের কাছে তিনি বলেছিলেন, 'কি হবে আনন্দ? ভীলদেরও আনন্দ আছে।' অর্থাৎ আনন্দ শব্দটিকে তিনি সাধারণভাবে গ্রহণ করে সকল আনন্দই পরিহার্য ভাবছেন কারণ যা মনকে প্রসন্ন করে তাকেই তিনি আনন্দ মনে করছেন। সাংসারিক আনন্দও মনকে প্রসন্ন করে কাজেই আনন্দ মাত্রই যে কাম্য তা নয়। সুখ দুঃখ ভাল মন্দ এ সবের পারে যেতে হবে, এই কথাই কালী বলছেন। যেমন বুদ্ধদেব বলেছেন, এই যে দুঃখময় সংসার, এর পারে গেলে দুঃখের নিবৃত্তি হবে। আমরা এই দুঃখের নিবৃত্তিই চাইছি। কিন্তু ভক্ত এবং জ্ঞানীরা বলেন, দুঃখের নিবৃত্তিটা নেতি বাচক শব্দ। শুধু এটুকু মানুষকে যথেষ্ট প্রেরণা দিতে পারে না। কালী তপস্বী বুদ্ধের মতবাদ নিয়ে চর্চা করছেন বলে মনে করছেন আনন্দ কি হবে? ঠাকুর বলেছেন, 'সে কি? ব্রহ্মানন্দ আর বিষয়ানন্দ এক?' অর্থাৎ আনন্দ শব্দ দিয়ে তুমি যে সকল আনন্দকে একসঙ্গে করে বলছ সেটা ঠিক নয়। বিষয়ানন্দ থেকে ব্রহ্মানন্দ আলাদা। সব আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ভগবদানন্দ।

মাস্টার বললেন, 'কালী এখন বুদ্ধদেবকে চিন্তা করেন কিনা তাই আনন্দের পারের কথা বলছেন।' রাখাল তার উত্তরে বলছেন, ঠাকুরের কাছেও বুদ্ধদেবের কথা তুলেছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'বুদ্ধদেব অবতার, তাঁর সঙ্গে কি ধরা?' অর্থাৎ সাধারণ লোকের জীবনের জন্য কি তাঁর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে? 'বড় ঘরের বড় কথা।' অসাধারণ ব্যক্তি যিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবহার একরকম হবে, সাধারণ লোকের ব্যবহার অন্যরকম হবে। তাই কালী যখন বলছিলেন, ঈশ্বরের শক্তিই তো সব, যে শক্তিতে ঈশ্বরের আনন্দ সেই শক্তিতেই বিষয়ানন্দ। ঠাকুর তার

উত্তরে বলেছেন, 'সে কি ? সন্তান উৎপাদনের শক্তি আর ঈশ্বরলাভের শক্তি কি এক ?' সাধারণ বিষয়লাভের শক্তি আর ভগবান লাভের শক্তি মূলতঃ একেবারে পৃথক, সে কথাই ঠাকুর বলছেন।

সকল স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব

মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের সঙ্গে নানারকম রঙ্গরস করতেন। ঠাকুরের অসুখে ভক্তদের অনেক খরচ হচ্ছে মনে করে ঠাকুর বলছেন, 'বড় খরচা হচ্ছে।' মহেন্দ্রলাল সরকার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এখন দেখ, কাঞ্চন চাই।' ঠাকুর কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেন বলেই কাঞ্চনের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে তার উত্তর দিতে বলছেন। নরেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার আবার বলছেন, 'কাঞ্চন চাই আবার কামিনীও চাই।' রাজেন্দ্র ডাক্তার আবার ইন্ধন জুগিয়ে বলছেন, 'এঁর পরিবার রেঁধে বেড়ে দিচ্ছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ একটু হেসে স্ত্রীলোককে জঞ্জাল বললে ডাক্তার সরকার বলছেন, 'জঞ্জাল না থাকলে তো সবাই পরমহংস।' ঠাকুর তাঁর নিজের অবস্থার কথা বলছেন, 'স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্‌লে অসুখ হয় ; অর্থাৎ অস্বস্তি বোধ হয়। 'যেখানে গায়ে ঠেকে সেখানটা ঝন্‌ঝন্ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো'। ডাক্তার তা বিশ্বাস করছেন, তবু বলছেন কিন্তু না হলে চলে কই ? অর্থাৎ তোমার যে এরকম অবস্থা হয় সেটা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু কামিনী কাঞ্চন না হলে চলে না। ঠাকুর আবার বলছেন, 'টাকা হাতে করলে হাত বেঁকে যায় ! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। টাকাতে যদি কেউ বিদ্যার সংসার করে,—ঈশ্বরের সেবা—সাধু ভক্তের সেবা করে,—তাতে দোষ নাই।' এরূপ উদাহরণ দেবার জন্য ঠাকুরের এই জীবন। কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি কি করে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হয় তারই দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে দেখাচ্ছেন।

তারপরে বলছেন, 'স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা ! তাতে

ঈশ্বরকে ভুলে যায়।' ঠাকুরের কথাগুলি বিশেষ করে অনুধাবনযোগ্য। স্ত্রীলোক মাত্রই যে দোষী তা নয়। তাদের নিয়ে মায়ার সংসার করলে মায়া ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। তাই তিনি বলেছেন, এর থেকে দূরে যাও। যিনি জগতের মা তিনিই স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন, এটি ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। সকল স্ত্রীলোককে ঠিক মা বোধ হলে তবে বিদ্যার সংসার করতে পারে। ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না। অর্থাৎ যখন সব নারীতে ভগবানের সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় তখন ঠিক ঠিক সকলের প্রতি মাতৃভাব আসে। তার আগে পর্যন্ত মাতৃভাব মানুষের অভ্যাস করতে হয়, আরোপ করতে হয়। মা বলে তাদের ভাবা। এতে মনের ভিতরে এমন একটা ভক্তিভাব, শুদ্ধভাব আসবে যাতে কোনমতে লালসা জাগবে না। ঠাকুর বার বার বলেছেন, সর্ব স্ত্রীতে মাতৃভাব। মা রূপে দেখবে সকলকে। এটি সাধন করতে করতে মনের ভিতর যত অশুদ্ধ ভাব সব দূর হয়ে যায়। সাধনের অবস্থায় এটি অভ্যাস করতে হয়। আর অভ্যাস যখন স্বভাবে পরিণত হবে তখন আর মনের ভিতর কোনো অশুভ ভাব উঠবে না। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে ঠাকুর বলছেন, 'ঈশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি বস্তু বোঝা যায় না।' যতদিন ঈশ্বর দর্শন না হয় ততদিন মনের ভিতরে কখনও কখনও এই ভাব উঁকি মারবে যে স্ত্রীলোক ভোগের বস্তু। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন হলে তাঁরই সত্তা সর্ব স্ত্রীতে উপলব্ধি হবে। স্ত্রীলোক সর্বশক্তির আকর, সে জগন্মাতার প্রতীক এই বুদ্ধি, এই দৃষ্টি ঈশ্বর দর্শন ছাড়া হয় না।

জীবনের উদ্দেশ্য

রাজেন্দ্র উপহাস করে বলছেন, 'সেরে উঠে আপনাকে হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারী করতে হবে। আর তা-না হলে বেঁচেই বা কি ফল?'

অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য হল হোমিওপ্যাথি **practice** করা। তাই নরেন্দ্রনাথ হেসে বলছেন, **'nothing like leather'** অর্থাৎ চামড়ার মতো আর কিছু নেই। যে মুচির কাজ করে সে বলে, চামড়ার মতো উৎকৃষ্ট জিনিস এজগতে আর কিছুই নেই। এটি একটি গল্পের কথা রহস্য করে বলা হচ্ছে। কথিত আছে, রোমের উপর বিদেশী আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায় শহরটিকে রক্ষা করার উপায় স্থির করবার জন্য সভা ডাকা হয়েছে। সেই সভায় যে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সে বললে, খুব শক্ত করে চারদিকে পাথর দিয়ে বেড়া দিয়ে দাও। যে কাঠের মিস্ত্রী সে বললে, খুব শক্ত করে কাঠ দিয়ে চারিদিক ঘিরে দাও। এইরকম এক একজন এক একরকম বলছে। একজন মুচি সেখানে ছিল সে বলল, **nothing like leather** অর্থাৎ চামড়ার মতো আর কোন জিনিসই নেই। চামড়া দিয়ে যদি ঘিরে দাও আর কিছুতেই সেখানে কেউ ঢুকতে পারবে না।

লোকের নিজের পথ, নিজের আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ বলে মনে করে। ডাক্তার রাজেন্দ্র মনে করছেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা—এটাই যেন জীবনের একমাত্র সার বস্তু। অবশ্য উপহাস করেই বলছেন। কথা হচ্ছে এই, আমরা নিজে যা করি, মনে করি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। ঠাকুরের দৃষ্টিতে কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরলাভ, অন্য সব জিনিস তাঁর কাছে গৌণ। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন, ভগবানের জীবদেহ ধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন্মুক্তির রস আস্বাদন করা। দেহের ভিতর দিয়ে যখন তিনি মুক্তিলাভ করেন তখন তাঁর জীবন্মুক্তের অবস্থা, সেই জীবন্মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করবার জন্য ভগবানের দেহধারণ। অবতার আসেন সকলের দুঃখ দূর করবার জন্য। কিন্তু মুক্ত জীব যাঁরা তাঁরা কি জন্য আসেন, তাঁদের জীবনের কি উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তির রস আস্বাদন করা।

গৃহীদের প্রতি উপদেশ

এই পরিচ্ছেদে ঠাকুর বিশেষ করে পুরুষদের সতর্ক করছেন মেয়েদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন, তাদের ঘৃণা করবে না, মাতৃমূর্তিরূপে দেখবে। এর আগে মহেন্দ্রলাল বলেছিলেন, তাঁর কাঞ্চন চাই আবার কামিনীও চাই। তারা চলে যাবার পর ঠাকুর নিজের কথায় বলছেন, 'আমার যে কি অবস্থা তা জানে না, মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝন্‌ঝন্ করে।' মেয়েদের ছাড়া চলবে না যারা বলে তারা ঠাকুরের অবস্থা চিন্তা করতে পারে না। বৈরাগ্য যাঁদের প্রবল তাঁদের এসব প্রয়োজন হয় না।

এই প্রসঙ্গে ভবনাথের সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধটিও ভাববার। ভবনাথ ঠাকুরের ভক্ত, নরেন্দ্রের বিশেষ বন্ধু। বয়স ২৩/২৪ হবে, বিবাহ হয়েছে। সংসারে প্রবেশ করেছে বলে ধর্মজীবনে আর উন্নতি হবে না মনে করে যদি ভীত হয় তাই ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলছেন, 'ওকে খুব সাহস দে।' তারপর বলছেন, সংসারে থাকবে কিন্তু সংসারের মায়াতে ভুলবে না। ভগবানকে স্মরণ করে থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করবে। তাকে পরিহার না করে উভয়ে যাতে ভগবানের পথের পথিক হয়, এইভাবে চলার চেষ্টা করবে। তাতে সংসারে শান্তি থাকবে এবং দুজনেরই ভগবৎ পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যারাই সংসারে প্রবেশ করেছে বা করছে তাদের মনে এবিষয়ে একটা দারুণ সংশয় ও শঙ্কা থাকে। বিশেষ করে যারা ভগবানের পথে চলার একটু স্বাদ পেয়েছে তাদের আরও বেশী আশঙ্কা যে, সংসার তাদের সাধনার পথে বিঘ্ন ঘটাবে কি না। আশঙ্কার কারণ অবশ্য যথেষ্টই আছে। বিবাহিত পতিপত্নী একভাবের না হলে শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং তারা একভাবের হবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই ঠাকুর ভবনাথকে সাহস

দেবার কথা বলছেন। কারণ সংসারে ঢুকলে প্রতিকূলতা যে আসবেই তা নয়। এই প্রসঙ্গে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে ঠাকুরের আগে যে কথা হয়েছিল তা স্মরণীয়। মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করছেন, স্ত্রী যদি বিপরীত ভাবের হয় তাহলে কি করণীয়? ঠাকুর বলছেন, তাকে বুঝিয়ে তোমার পথে আনবার চেষ্টা করবে। মাস্টারমশাই বললেন, যদি তাতেও না বোঝে তখন কি করব? ঠাকুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলছেন, তাহলে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে। মাস্টারমশাই তখন খুবই চিন্তিত। ঠাকুর একটু পরে আবার বলছেন, দেখ, যে ঠিক ঠিক আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকে, ভগবান তার সব অনুকূল করে দেন। কথাটি সকলেরই মনে রাখার মতো। ভগবানের পথের পথিককে সংসারে সমস্ত জীবন সংগ্রাম করে চলতে হবে এবং সে সংগ্রাম এমন হবে যে কেউ কাউকে অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষা করবে না, পরস্পরকে নিজেদের ভাবে আনবার অর্থাৎ ভগবৎ পথে আনবার চেষ্টা করবে। এটা পতিপত্নী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য যদি তারা সমধর্মী না হয়। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকবে—ভগবান যে সব অনুকূল করে দেন এই বিশ্বাস মনে রেখে এগোতে হবে। সংসারের ভয়ংকরতার জন্য হতাশ হলে চলবে না। সংসারে থেকেও ভগবানকে লাভ করা সম্ভব সে কথা মনে রেখে এ পথে চলার চেষ্টা করতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই এই দৃষ্টি থাকবে যে ভগবান সকলের মধ্যে রয়েছেন।

সাধারণভাবে ঠাকুর স্ত্রী পুরুষকে পরস্পর থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, কিন্তু যেখানে ভগবানের ইচ্ছায় তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেখানে তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে। আবার যেখানে কোনো পুরুষ স্ত্রীকে পরিহার করে চলতে চায় সেখানে ঠাকুর বলছেন, তা করবে মাতৃ-দৃষ্টিতে। এইরকম মেয়েরাও পুরুষের প্রতি পিতৃভাব বা সন্তানভাব আনবার চেষ্টা করবে যাতে মনের ভিতর কোন আসক্তির উদ্ভব না হয়। একথা ঠাকুর অনেক জায়গায় বলেছেন।

ভক্তেরা ঠাকুরের জন্য রোজ রোজ মালা আনেন। ঠাকুর নিজে সে মালা পরেন আবার ভক্তদের প্রসাদ দেন। সুরেন্দ্র এসেছেন, তাঁকে ঠাকুর মালা দিলেন। সুরেন্দ্রেরও ঠাকুরের প্রতি গভীর ভালবাসা। ঠাকুরের গরমে কষ্ট হবে তাই খসখসের পর্দা এনেছেন এবং যাবার সময় ভবনাথকে নির্দেশ দিচ্ছেন টাঙিয়ে দেবার জন্য।

হীরানন্দ ও ঠাকুর

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঠাকুরের সঙ্গে হীরানন্দের সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। হীরানন্দ সিন্ধুদেশের লোক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। অত্যন্ত সৎ চরিত্র ও সৎ স্বভাবের হওয়ার জন্য সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ও তাঁকে সাধু হীরানন্দ বলতেন। ঠাকুরের কাছে তিনি বেশী না আসতে পারলেও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। ঠাকুরের অসুখ শুনে অতদূর থেকে দেখতে এসেছেন, ঠাকুরও তাঁকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সিন্ধুবাসীরা ভক্তিভাবাপন্ন, বিশেষকরে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন। আবার অধিকাংশেরই শ্রদ্ধা অদ্বৈতবাদের প্রতি। তাদের আরও বৈশিষ্ট্য সর্বধর্মের প্রতি তাদের একটা অনুরাগ আছে, কোন ধর্মের প্রতি দ্বেষভাব নেই। মন্দির মসজিদে যায়, আবার গ্রন্থসাহেব ঘরে ঘরে পাঠ করা হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিয়েছে। হিন্দুদের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদির মতো আচার-নিষ্ঠা নেই। অনেকে তাদের এজন্য আধা মুসলমান আধা হিন্দু বলেন। মুসলমানদের সঙ্গেও তাদের প্রীতির সম্বন্ধ আছে। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী আছে বলেই ঠাকুরকে হীরানন্দের খুব ভাল লেগেছে। ঠাকুরের আদর্শের সঙ্গে তাঁর মিল আছে, তাই তাঁর প্রতি হীরানন্দের অগাধ শ্রদ্ধা।

ভক্ত কেন দুঃখ পায়

হীরানন্দ প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, ভক্তের এত দুঃখ কেন? তাঁর মনে হয়েছে ঠাকুরের এত ভক্তি, এত শুদ্ধি, কিন্তু তাঁর কেন এত কষ্ট? বোধহয় এই জন্যই তাঁর এই প্রশ্ন। নরেন্দ্র তার উত্তরে বললেন, জগতের যে ব্যবস্থা আছে তা ভাল নয়, আমি এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করতে পারি। হীরানন্দের মতে দুঃখ এবং সুখ পরস্পর এমন সম্বন্ধযুক্ত যে একটি না থাকলে অন্যটির অনুভূতি হয় না। দুটিই এজন্য প্রয়োজন। একটি চিত্র আঁকতে হলে যদি উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল দুটো রঙ থাকে তবে তা সম্পূর্ণ হয়। বিচিত্রতা না থাকলে যেমন চিত্র হয় না, সংসার রচনার ক্ষেত্রেও বিচিত্রতা তেমনি অপরিহার্য। নরেন্দ্র বললেন, সবই ঈশ্বর এই বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। ঈশ্বর সুখ দুঃখ নিজে সৃষ্টি করেছেন, ভোগও করছেন নিজেই। ঠাকুর যেমন বলছেন, হে রাম, তোমার নিজের দুর্গতি তুমি নিজেই করেছ। যদি কাকেও শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর দুঃখ সৃষ্টি করে থাকেন তবে তাঁকে নিষ্ঠুর বলব। কিন্তু তিনি নিজে ইচ্ছে করে দুঃখ ভোগ করার জন্যই যদি দুঃখ সৃষ্টি করে থাকেন তবে দোষ দেব কাকে? সুতরাং সব দুঃখ, সব বৈষম্য ব্যাখ্যাত হয় এই একটি উপায়ে যে সর্বত্রই তিনি। নরেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে ঠাকুর সন্তুষ্ট। হীরানন্দকে নরেন্দ্র সম্পর্কে বলছেন, 'যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।' হীরানন্দ উৎসুক হয়ে শান্তভাবে ঠাকুরের কথাগুলি শুনছেন। তাই ঠাকুর হীরানন্দকে দেখিয়ে মাস্টারমশাইকে বললেন, 'কি শান্ত! রোজার কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে।' হীরানন্দের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের স্পষ্ট প্রকাশ ফুটে উঠছে।

ঠাকুরের ব্রহ্মলীন অবস্থা

এরপর ঠাকুরের আত্মপূজা। ভক্তদের প্রদত্ত ফুল মাথায়, হৃদয়ে,

নাভিতে স্পর্শ করছেন, বালকভাব। বলছেন, একটা মহাবায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন ঈশ্বরের অনুভূতি হয়। এখন মন ঊর্ধ্বগামী হয়েছে আর নীচে নামছে না। শরীর থেকে আত্মা ভিন্ন। শরীর জড়-পদার্থ তার কোন ক্রিয়া নেই, ব্রহ্ম সেখানে বিদ্যমান বলে ক্রিয়াশীল দেখাচ্ছে। দেহটা যেন খোল তার মধ্যে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বিরাজিত। কেবল অন্তরে নয়, বাইরেও তিনি ঈশ্বরকে দেখছেন। কেবল অন্তরে ভগবানকে দেখা ধ্যানীর চিহ্ন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মকে অন্তরে বাইরে সর্বত্রই দেখেন। সাধককে মন অন্তর্মুখ করে তাঁকে অন্তরে অনুভব করতে হয় আর যিনি অন্তরে বাইরে সর্বত্রই ভগবানকে অনুভব করেন তিনি আর মনকে কোথা থেকে সরাবেন? সর্বত্রই তো তিনি! ঠাকুর তাই দেখছেন অখণ্ড, যার সীমা নেই। আমরা বস্তুকে খণ্ড করে, ভাগ করে দেখি। কিন্তু অখণ্ড বস্তু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে তাকে ভাগ করা যায় না। তাকেই বলছেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। দেহের ভিতরে বাইরে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সমুদ্রের মধ্যে ঘট ডোবান আছে। ঘটের বাইরে ও ভিতরে একই সমুদ্রের জল। ঘট দেখে মনে হচ্ছে ঘটের জল আলাদা, আসলে সর্বত্র একই বস্তু পরিব্যাপ্ত। আকাশের দৃষ্টান্ত আরও সুন্দর, গৃহাকাশ আর বাহ্যাকাশ, দেয়াল দিয়ে যেন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কিন্তু আকাশ এমন বস্তু যে দেওয়াল দিয়ে তাকে পৃথক করা যায় না। দেওয়ালের ভিতরে বাইরে একই আকাশ। আকাশটি হচ্ছে অখণ্ডের দৃষ্টান্ত। সেইরকম দেহের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্রই তিনি। ঠাকুর খোল বলছেন যেটিকে সেটিও সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঠাকুরের স্নেহ বিশ্বগ্রাসী, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেখানে আপন পর বলে কিছু নেই, সবাই তাঁর আত্মীয়। প্রত্যেকটি জীব এক হিসাবে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন খোল। সেই খোলের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মই প্রকাশিত

দেখতে পাচ্ছেন। চামড়াটা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে অখণ্ডকে আলাদা করা হয়েছে। আসলে অখণ্ডকে আলাদা করা যায় না। বলছেন, গলার ঘা-টা তখন একপাশে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ আমাকে আর কোনো কষ্ট দিতে পারছে না। তার দিকে আর দৃষ্টি যাচ্ছে না। এবার বেদান্তের ছাঁকা কথা বললেন, জড়ের সত্তা চৈতন্যে লয় হয়, চৈতন্যের সত্তা জড়ে লীন হয়ে থাকে। জড়ের যেখানে গুণ ও আকার আছে, সেখানে চৈতন্য তার দ্বারা গুণবিশিষ্ট হয়ে আকারিত হচ্ছে। এই জড় দেহটাতে রূপগুণাদি আরোপ করে আমরা বলছি, আমি কালো, আমি সাদা, আমি লম্বা, আমি বেঁটে। এগুলি সব জড়ের ধর্ম যা চৈতন্যে আরোপ করে আমরা ঐরকম বলছি। আসলে দেহটার ধর্ম চৈতন্যে আরোপ করা হচ্ছে। আর চৈতন্যের সত্তা জড়েতে আরোপিত হচ্ছে। প্রকাশমান চৈতন্য জড়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা মনে করছি জড়টা নিজে প্রকাশিত। রোগ শরীরের ধর্ম, সেগুলি আত্মাতে আরোপ করে আমরা বলি আমার রোগ হয়েছে, সুখদুঃখ হয়েছে। জল আর অগ্নি এমনভাবে মিশে আছে আমরা বলি জলে হাত পুড়ে গেল কিন্তু পোড়ে জলের তাপের দ্বারা, জলের দ্বারা নয়। তেমনি 'আমি জানি' বলে দেহতে 'আমি' বুদ্ধি যখন করছি তখন দেহ জানে না, আত্মাই জানে। আবার দেহের স্থূলত্ব কৃশত্ব আত্মাতে আরোপ করে দেখছি, আমি মোটা আমি রোগা।

দেহের এত কষ্টের মধ্য দিয়েও যে ঈশ্বরের সঙ্গে এমন যোগ হতে পারে ঠাকুর এই দৃষ্টান্ত যেন জগতের কাছে ধরছেন—মাস্টার মশাই এই কথা বলছেন। হীরানন্দ সমর্থন করে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার কথা বললেন। ঠাকুর বলছেন, মাস্টার কি এটা উপলব্ধি করেছেন যে রোগভোগ লোকশিক্ষার জন্য ? উপলব্ধি না করে থাকলে এটা অনুমান মাত্র।

ঠাকুর অপরকে যখন বলছেন চৈতন্য হোক, তখন সেই চৈতন্যের অনুভূতিতে বাধা সৃষ্টি করছে যে দুষ্কর্ম বা পাপের বোঝা তা তিনি নিজের উপর নিয়ে মানুষকে কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দিচ্ছেন, তবে তাদের চৈতন্য হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, 'অবস্থা বদলাচ্ছে, মনে করিছি চৈতন্য হউক, সকলকে বলবো না।' কিন্তু ঠাকুর তা পারছেন না। মাস্টারমশাইকে বলছেন, আপনি সকলকে বলবেন না। কেবল যার উপযোগী অবস্থা হয়েছে তাকে বলবেন, তার বাধাটি দূর হয়ে যাবে। সকলের বোঝা বয়ে কষ্ট পাবেন না। কিন্তু ঠাকুর তো বোঝা বইতেই এসেছেন, সকলের কষ্ট গ্রহণ করতেই এসেছেন। কাজেই তিনি বলবেনই। দৈব প্রেরিত হয়ে, লোক কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা প্রেরিত হয়ে তাঁকে একাজ করতেই হবে, জগতের সকলের দুঃখ বহন করে যেতেই হবে।

শান্তি পাবার উপায়

হীরানন্দ ঠাকুরকে বলছেন, শরীর নিয়ে এত চিন্তা করেন কেন, যা হবার তা হবে। মাস্টারমশাই ঠাকুরের সঙ্গ একটু বেশীদিন করেছেন, তাই উনি বোঝেন যে ঠাকুরের ভাবনা ভক্তদের জন্য, নিজের জন্য নয়। ভক্তদের জন্যই তাঁর দেহধারণ, যতদিন দেহ থাকবে ভক্তদের কল্যাণ হবে। দেহ না থাকলে কল্যাণ কার্যে ব্যাঘাত হবে বলে ঠাকুর নিজের শরীর, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত।

নরেন্দ্র শরৎকে বলছেন, 'তোর শান্তি হয়েছে, মাস্টারমহাশয়ের শান্তি হয়েছে, আমার কিন্তু হয় নাই।' নরেন্দ্রের ভাব হচ্ছে শান্তি হোক আর না হোক, যে পথ আশ্রয় করেছি তা ধরে থাকতেই হবে। আমরা একটু ভগবানের নাম করেই বলি কই ভগবান লাভ তো হল না? যেন একদিনেই ভগবানলাভ হয়ে যায়। অনেকেই আমাদের জিজ্ঞাসা

করেন, দীক্ষা তো নিয়েছি এখনও তো শান্তি হল না। সাধারণ লোকে মনে করে ভগবানকে ডাকার উদ্দেশ্য শান্তিলাভ, সুখ সমৃদ্ধি লাভ। কিন্তু শান্তি লাভ দীক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ভগবান লাভ ; তাঁকে ডাকা। শান্তি আসে আসবে, না আসে জোর করে সাধন করে যেতে হবে। ভগবানকে ডাকার ফলে মনে বরং আরও অশান্তি আসে এবং সে অশান্তি যাকে আমরা শান্তি বলি তার চেয়ে অনেক ভাল। সাধকদের জীবনে দেখা যায় ভগবানকে না পাওয়ার জন্য তাঁদের প্রাণে কি অশান্তি, কি তীব্র বেদনা।. সাংসারিক দুঃখ অশান্তির যে অনুভূতি আমাদের আছে তাকে সহস্র গুণ করলেও এই অশান্তির সঙ্গে তুলনা হয় না। এত অসহ্য বেদনা। কিন্তু সে অশান্তি থেকে মুক্ত হতে তাঁরা চান না। তাঁরা চান ভগবানকে নিয়ে একেবারে মগ্ন হয়ে থাকতে, তাতে শান্তি বা অশান্তি, সুখ বা দুঃখ যাই আসুক না কেন। এগুলি তাঁদের কাছে তুচ্ছ। শান্তি পাবার জন্য যখন আমরা ভগবানকে ডাকি সেখানে ভগবান আমাদের উপায়, উদ্দেশ্য নন। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের কাছে ভগবান উদ্দেশ্য, উপায় নন। সাধারণতঃ এ জিনিসটি বোঝা কঠিন। আমরা ভগবানকে ডাকি সংসারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য, আর যদি মনে একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয় তো শান্তির জন্য। কিন্তু মনের শান্তি সাধনপথে এগোবার চিহ্ন নয়। অবশ্য শান্ত লোক দেখলে মনে হয় সে ভগবানের পথের পথিক। তবে প্রকৃত শান্ত বলা যায় তাকেই যার ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের পিছনে ছুটছে না, মন চঞ্চলতা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু সে শান্তির ভিতরেও মনে তীব্র বেদনা থাকবে। ভগবানের দিকে যেতে যেতে প্রথমদিকে হয়তো মনে একটু শান্তি আসে। কিন্তু যত সেই পথে এগোবে ততই মনের বেদনা তীব্র হবে। Christian Mystic-দের প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, যে পথ দিয়ে যেতে হবে সে পথ মরুভূমির মতো, বিশ্রামের স্থান নেই, গাছের ছায়া নেই, তীব্র পিপাসা

তবু পথ চলতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, কষ্ট বলে বিরত হলে চলবে না। আমাদের শাস্ত্র বলছেন, ভগবানের দিকে যাবার পথ ক্ষুরের ধারের মতো, তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পা ক্ষত-বিক্ষত হবে, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সে দুঃখ কষ্টের তুলনা জগতে নেই, সে দুঃখকে ভয় পেলে হতাশ হলে চলবে না। আশায় বুক বেঁধে অথবা তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে, সুখ দুঃখকে উপেক্ষা করে চলতে হবে।

নরেন্দ্র যে বলছেন এঁদের শান্তি হয়েছে তাঁর হল না তার মানে এই নয় যে সাধনপথে সবাই এগিয়ে আছেন আর নরেন্দ্রনাথ পিছিয়ে আছেন। আসল কথা নরেন্দ্রের মধ্যে সেই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে, যে অশান্তির আগুন বুকে নিয়ে তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। সাধারণ অশান্তির সঙ্গে এর তুলনা হয় না, সাধককে এই অশান্তির ভিতর দিয়ে যেতে হবে, তার জন্য আগে থেকে মনের প্রস্তুতি চাই।

আমরা বহুজনের কাছে যে শুনি, আমি শান্তি পাচ্ছি না, সে অশান্তি সংসারের নানা বিষয়ে যে আকাঙ্ক্ষা আছে তা মিটছে না বলে। মন যা চাইছে সেগুলি পাচ্ছে না। মনে করে বাসনা পূর্ণ হলেই শান্তি হবে। কিন্তু শান্তি তাতে হয় কি? শাস্ত্র বলছেন, সাধকরা বলছেন, কামনা বাসনা ভগবান থেকে দূরে যাওয়ার পথ, কাছে যাওয়ার নয়। সুতরাং শান্তি কামনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় একথা মনে রেখে জেনে শুনে এ পথে চলতে হবে। প্রথমে শুনলে মনে আঘাত লাগবে, সে কি! আমরা তো শান্তির জন্যই ভগবানের নাম করি। তাদের যদি বলা হয় এতে অশান্তি শতগুণ বাড়বে তাহলে কি তারা সাহসে বুক বেঁধে আর সে পথে এগোতে পারবে? কাজেই প্রথমে তাদের বলা যায় শান্তি হবে, কিন্তু আমরা যাকে শান্তি বলি সে যে সেরকম শান্তি নয় একথা বুঝবে

কে? আমরা যে ভগবানের নাম করেও শান্তি পাইনা তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে আমাদের মনে রয়েছে অসংখ্য কামনা। কিন্তু মুখে বলি আমি সংসারে কিছুই চাই না, কেবল শান্তি চাই—এ একেবারে বাজে কথা। সংসারে সবই চাইছি আর মনে করছি শান্তিই আমার কাম্য। কেউ কেউ ভাবে ভগবানের দিকে একটু মন গেলে শান্তি হয়। কিন্তু তাতে যদি বিষয় আশয় রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে এই অশান্তিকে বরণ করতে পারে এমন সাহস কতজনের? এজন্য এ পথে যাওয়া বড় কঠিন। আসলে আমরা শান্তি বলতে বুঝি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ, রোগ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি, দুঃখ শোক থেকে মুক্তি। কিন্তু এগুলি যে শান্তি নয়, একথা কে বোঝাবে? ইন্দ্রিয় যখন বিষয়কে পায় আপাত দৃষ্টিতে মনে করে শান্তি হয়েছে, কিন্তু তা তো প্রকৃত পক্ষে হয় না। একটা বিষয় পাওয়া হল তো আর একটা বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগে, মনে এরকম হাজার রকমের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যেমন, মানুষের মনে কিছু খাবার জন্য ইচ্ছা হয়েছে, সেটা তৃপ্ত হলে আবার আর একটা, সেটা পেলে আর একটা, আবার ফিরে মনে হবে, অনেকদিন তো এ জিনিসটা খাইনি—এর কোন শেষ নেই। যত ভোগ করতে থাকব ততই দেখব তৃপ্তি আসছে না। কাজেই ভোগের বস্তু পরিপূর্ণরূপে থাকলেও তৃপ্তি হয় না, শান্তি হয় না। কারণ এ শান্তি ভগবানকে নিয়ে নয়, যারা এ থেকে বিপরীত পথে চলেছে শান্তি তাদেরই।

বাইরে থেকে লোক মনে করে ভগবানের নাম করলে আনন্দে থাকা যায়, কিন্তু সে আনন্দ যে আমরা পেতে পারি না, কেউ দিলেও সহ্য করতে পারব না কারণ আমাদের মনে বিষয় তৃষ্ণা প্রবল। ভগবানকে নিয়ে আনন্দের দৃষ্টান্ত উপনিষদে দিয়েছেন—'যুবা স্যাৎ সাধু যুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ' (তৈ. ২.৮.১)—অর্থাৎ যুবা পুরুষ হবে, সৎস্বভাব

হবে, শাস্ত্রাদি পাঠ করেছে এমন হবে, আর তার জন্য পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ থাকবে তবেই সে সংযম সহকারে অটুট যৌবন নিয়ে ভোগ করতে পারবে, আর তা পার্থিব আনন্দের পরাকাষ্ঠা হবে। যুবা হবার কারণ তাদেরই ভোগ করার সামর্থ্য পরিপূর্ণভাবে থাকে কিন্তু তার সঙ্গে সাধু কথাটি বলেছেন। সৎস্বভাব না হলে ভোগের মধ্যেও আনন্দ পাবে না। অসংযমী অসৎস্বভাব ব্যক্তি এই পৃথিবীটাকে ভাল করে ভোগ করতে পারে না। ভগবানকে নিয়ে আনন্দ করা যায় তখনই যখন বিষয়াকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়, মন ভগবান ছাড়া আর কিছু চায় না। যখন সমস্ত মন ভগবানে নিবিষ্ট হয় তখন আর চেষ্টা করে ইন্দ্রিয় নিরোধ করতে হয় না, স্বতঃই নিবৃত্ত হয়ে যায়। কারণ তখন ভগবান ব্যতীত আর কিছু আস্বাদযোগ্য বলে মনে হয় না। শান্তি প্রকৃতপক্ষে তখনই পাওয়া যায় যখন মন ভগবান ছাড়া আর কিছু চায় না। সে অবস্থা কি দুদিন ভগবানের নাম করলেই পেয়ে যাব? এ কি কখনও সম্ভব?

অনেক সময় হয় কি মানুষ সংসারে নানাভাবে আঘাত পেয়ে অশান্ত চিত্ত নিয়ে আসে, বলে, ভগবানের কথা শুনতে এসেছি যাতে শান্তি পাই। সে শান্তি খুব সাময়িক। ঠাকুর যেমন বলেছেন, তপ্ত অঙ্গারে জলের ছিটে। জ্বলন্ত কয়লায় জলের ছিটে সঙ্গে সঙ্গে উবে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয় সব মিথ্যা, এ সবের জন্য বিচলিত হয়ে লাভ কি? কিছু পরেই সে ভাব চলে যায়, পূর্বের অশান্ত অবস্থা ফিরে আসে। অনেক সময় লোকে প্রিয়জনকে হারিয়ে আমাদের কাছে আসে, তাদের অবস্থা যথার্থই বেদনাদায়ক, কিন্তু উপশমের যে উপায় তারা ভাবছে সে উপায় যথার্থ নয়। মনের ভিতর থেকে বাসনা নির্মূল করলে তবে এ অশান্তি যাবে। এ কথা শুনলে লোকে ভাববে, এ কেমন কথা, মনের অশান্তি দূর করবার জন্য এলাম, আর এঁরা বললেন ওতে অশান্তি

দূর হবে না, আগে বাসনা দূর কর। বাসনা সহজে দূর হবে না, কাজেই এ পথকে কেউ পছন্দ করবে না। যদি বলতে পারতাম, রোগ হয়েছে সারাবার ব্যবস্থা হবে, কেউ মৃত হলে তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া যাবে তাহলে মনে খানিকটা আশা আসে। কিন্তু এরকম ব্যর্থ আশা সৃষ্টি করা অত্যন্ত কপটতা। কি করে বলা যাবে যাকে হারিয়েছি তাকে আবার পাওয়া যাবে? আমরা অনেক সময় বলি তারা ঠাকুরের কাছে আছে, সেখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে গেলে তবে তো পাওয়া যাবে? ঠাকুরের কাছে পাওয়া যাবে মানে আমরা সকলেই তাঁর মধ্যে রয়েছি। যখন সেখানে ফিরব সকলকেই পাব। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—যাঁকে পেয়ে অন্য কিছুকে আর বড় লাভ বলে মনে হয় না, যাঁকে পেলে পরিপূর্ণতা লাভ হয়। আত্মীয়বিয়োগ ব্যথার দুঃখ শোক ভুলবার জন্য আমরা তীর্থ করতে যাই, ভগবানের নামও করি। নিজেকে নানাভাবে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করি, এগুলি কতকটা উপায় বটে কিন্তু সাময়িক প্রলেপ মাত্র। অন্তরের দাহের নিবৃত্তি এর দ্বারা হবে না। একমাত্র বাসনার নিবৃত্তি হলেই এ দাহের নিবৃত্তি হবে। কারণ 'আমি', 'আমার' বুদ্ধি প্রবল বলেই আমাদের দুঃখ শোক। কাকেও হারালে কেউ গিয়েছে বলে আমরা দুঃখ করি না, 'আমার' গিয়েছে বলে দুঃখ করি। যে গিয়েছে তার জন্য নয়, 'আমার' জন্য। আমার কি হবে?—মানুষের এই ভাষার দ্বারাই বোঝা যায় তাদের আকুলতা নিজের জন্য। কাজেই যতক্ষণ মনে বাসনা আছে ততক্ষণ শান্তির কোন আশা নেই। বাসনার তো শেষ নেই, নানাভাবে সে মাথা চাড়া দিচ্ছে। যেমন, দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুর নানারূপ ধারণ করছে। একরূপে দেবীর হাতে নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একরূপে অসুরের আবির্ভাব হল। অবশেষে মহিষের রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করবার আগেই দেবী তাকে বধ করলেন। সেইরূপ

মনের বাসনাও দূর করতে চাইলে সে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে হাজির হয়। মহিষাসুরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণের মতো মনের ভিতর বিভিন্ন রূপ ধারণের যে বীজ 'বাসনা' তাকে যদি উৎপাটিত করা যায় তাহলেই তার আর রূপ ধারণ সম্ভব হয় না। এইটিই আসল কথা, দুঃখের বীজ 'বাসনা'কে নিবৃত্ত করতে পারলে আর দুঃখের কারণ থাকে না।

বুদ্ধদেব একথা অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে বলেছেন, সমস্ত জগৎটা ক্ষণিক সুতরাং দুঃখময়। এই দুঃখের কারণ হচ্ছে বাসনা, তাই তিনি বাসনা ত্যাগ করতে বলেছেন। পিঙ্গলার দৃষ্টান্ত দিয়ে অবধূতও বলেছেন বাসনা ত্যাগ করলেই সুখী হবে। কিন্তু দুদিন ভগবানের নাম করলেই বাসনা যাবে না, তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। মহিষাসুরের সর্বরূপকে সংহার করে তার বীজকে দগ্ধ করতে হবে, তবে বাসনা আর মনে অঙ্কুরিত হবে না। সে যুদ্ধ যতই কঠিন হোক তাতে ভয়ে পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। একথাটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

স্বামীজী বলেছেন, তাঁর শান্তি হয়নি, এ সামান্য কথাটি যে কি ভয়ঙ্কর তা তিনিই বুঝেছেন, অপরে নয়। তিনি গাইতেন, '......দরদ না জানে কোঈ......' একের মনের দরদ, দুঃখ, ব্যথা অন্যে ততক্ষণ জানবে না যতক্ষণ না তার কাছে তা প্রকট হচ্ছে এবং যখন প্রকট হবে, অনুভূত হবে তখন বোঝা যাবে এই ব্যাকুলতা এল, এবার অরুণোদয় হবে। তখনই মানুষের সত্যের সম্মুখীন হবার সাহস হবে, যোগ্যতা হবে। তার আগে হবে না।

আমাদের একটি সাধু বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। পরে চিকিৎসা ছেড়ে তপস্যা করতে লাগলেন। সারা জীবন কঠোর সাধনা করে জীবনের শেষে বলছেন, লোকে বলে লেখাপড়ার জন্য যে পরিশ্রম করতে হয় তা করলে ভগবান লাভ হয়। কিন্তু লেখাপড়ার জন্য যে

পরিশ্রম করেছি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী পরিশ্রম করেছি ভগবান লাভের জন্য, তবু তো হল না। এ ব্যথা বুঝবে কে? এ মর্মান্তিক বেদনা তাঁর সাধনের শেষের অবস্থা। কাজেই আমরা যখন সাধন করতে যাই, দু-একবার একটু ভগবানের নাম করেই বলি, এখনও শান্তি হল না— এ যে কত বড় অর্বাচীনের মতো কথা তা এই সাধুর দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারি। তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ ছিলেন বলে তাঁর সমস্ত জীবন জানি। কত কঠোর সাধনা, কি তীব্র ত্যাগ বৈরাগ্য ছিল এবং শেষ কালে ঐ কথা বলছেন। শরীর জীর্ণ, শীর্ণ, রোগগ্রস্ত মৃত্যুর সম্মুখীন, তখনও মনে এই আকুলতা।

আমরা জানি এর কিছুই বৃথা হয় না। ঠাকুরও বলেছেন, একদিনও যদি ভগবানের জন্য চোখের জল ফেলে থাক তো জেন তা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু কি নিদারুণ হতাশার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা অকল্পনীয়। আমরা একটু করেই ভাবি কিছু হচ্ছে না, কেউ কেউ বলেন দুবছর দীক্ষা নিয়েছি, কিছু হল না তো—যেন হওয়াটা হাতের মুঠোয় এসে যাবে কোন অলৌকিক উপায়ে, একটা ভেল্‌কি হয়ে যাবে। ভেল্‌কি কিছু নেই, অনন্তকাল ধরে সংগ্রাম করবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এ পথে পা বাড়াতে হবে। ভাল করে এটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অনেকে মনে করে দীক্ষায় কিছু গোলমাল হয়েছে, মন্ত্রে কোথাও ভুল আছে। আসল কথা বোঝে না। ত্রুটি সেখানে নয়, ত্রুটি আমার অন্তরের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়নি। কোনো মূর্তি বা আলো দেখতে পেলে মনে হোত এইবার কিছু হচ্ছে। এগুলি যে অতি তুচ্ছ জিনিস, অশেষ সংগ্রাম করে এর থেকে যে অনেক এগিয়ে যেতে হয় তা বুঝি না। কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে যেতে হবে, পিপাসায় বুক ফেটে যাবে, এক ফোঁটা জল পাওয়া যাবে না, তবু চলার থেকে বিরত হলে চলবে না। সাধনকে এইজন্য সংগ্রাম বলা হয়েছে। রামপ্রসাদ বলেছেন, 'আয় মা সাধন

সমরে।' এই দুর্দান্ত সংগ্রামে আমি একা, কেউ সাথী নেই সাহায্য করবে। বাইরে থেকে একেবারে প্রথমে কেউ একটু সূচনা করে দেবে হয়তো; তারপর আর সহায় কেউ নেই। আমাকে একা এগোতে হবে বুকে বল নিয়ে। প্রচলিত কথায় আছে—'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।' বড় কঠিন সংগ্রাম, পরাজয় বার বার হবে, ভয় পেলে চলবে না। পরিণামে জয় সুনিশ্চিত একথা শাস্ত্র বলেছেন, সাধকরা বলেছেন। এ তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, কিন্তু গোড়া থেকে কেবল তাঁর উপর নির্ভর করে চেয়ে থাকলে এগোন আমাদের সম্ভব হবে না। একটু পোষাকী সাধনা কিন্তু তাঁকে পাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এটা প্রথমেই বুঝে নিতে হবে। তাঁকে পাবার জন্য কিছুই করিনি, আর আশা করছি কিছু হবে এ হয় না।

তারপরের কথা হচ্ছে সমস্ত করেও যখন ব্যর্থতা বুঝব, মনে আর কোনো আশার সঞ্চার হচ্ছে না, সাধনার অহংকার পরিপূর্ণরূপে চূর্ণ হয়ে যাবে তখন হয়তো তাঁর কৃপা হবে। কিন্তু হবে বলে আগে থেকে ভরসা করে থাকলে হবে না, করে যেতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে। শেষ পরিণামে হয়তো সকলে সেখানে পৌঁছতে পারব না। এই জীবনে নয়, পরজীবনে নয় কিন্তু অনন্ত জীবন যদি লাগে তাতেও পশ্চাৎপদ হলে চলবে না। যেমন শান্তিরাম সাধনা করতে করতে নারদকে বলেছিলেন, ভগবানকে জিজ্ঞাসা কোরো, কবে তাঁকে পাব? ভগবান বলেছিলেন তাকে বলতে যে তেঁতুল গাছের নীচে সে সাধনা করছে সেই তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে তত জন্ম পরে পাবে। শান্তিরাম শুনে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। অর্থাৎ যেদিনই হোক একদিন হবে তো! সকল দুঃখ সহ্য করে সেদিনের জন্য এগোতে হবে। এ কি কম ধৈর্যের কথা। শাস্ত্র উপমা দেন শবরীর প্রতীক্ষার। সকল উদ্যম নিয়ে ঐ প্রতীক্ষা, সাধন সংগ্রামের পরিণতি। তখন দর্শন হবে তার আগে নয়

এবং তার জন্য এক জীবন নয় দরকার হলে অসংখ্য জীবন দিতে হবে। এই হল সাধনা।

ঠাকুর ও ভক্তবৃন্দ

এখানে মাস্টারমশায় কেদারের কথা বলছেন। কেদার খুব ভক্তিমান, ঠাকুরের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আসেন। কর্ম উপলক্ষে ঢাকায় থাকেন বলে সর্বদা আসতে পারেন না। ঠাকুরের প্রতি কেদারের এত ভক্তি যে তিনি ঠাকুরের বিষয় নিয়ে আর তর্ক করতে চান না। নরেন্দ্রকে একসময় বলেছিলেন, 'এখন তর্ক কর বিচার কর ; কিন্তু শেষে হরিনামে গড়াগড়ি দিতে হবে।' অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ ভক্তির ভাব স্ফূরিত হবে। ঠাকুরও কেদারকে কত সম্মান দিতেন, নরেন্দ্রকে বলছেন কেদারের পায়ের ধূলা নিতে।

সুরেন্দ্রের কথা উঠল, সুরেন্দ্রের অভিমান হয়েছে। ঠাকুরের সেবার জন্য তিনিই বেশীর ভাগ টাকা দেন তবু ভক্তেরা অন্যের কাছে টাকা চায় কেন? এই অভিমানের বশে একবার তিনি বলেছিলেন, ঠাকুরের যুবক ভক্তেরা টাকার অপব্যয় করছেন, তাদের ব্যয় সংকোচ করা উচিত। এতে যুবক ভক্তেরা খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, তবে রে, এই কটা টাকা দেয় বলে এইরকম কথা বলে? তোরা আমাকে নিয়ে যেখানে রাখবি আমি সেখানেই থাকব। এখানে থাকতে হবে না। এইভাবে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র খুবই ভক্ত, ঠাকুরও তাঁকে স্নেহ করতেন খুব।

এখানে আর একটি কথার উল্লেখ আছে। গিরিশবাবু মাস্টার-মশাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি নাকি ঠাকুরের বিষয়ে কি লিখেছ? আমায় দেবে? মাস্টারমশাই বলছেন, না, আমি নিজে না

বুঝে কারুকে দেব না। আমি নিজের জন্য লিখছি, অন্যের জন্য নয়। তারপর বলছেন, আমার দেহ যাবার সময় পাবে। অবশ্য তাঁর দেহ যাবার সময় অবধি অপেক্ষা করতে হয়নি। ঠাকুরের দেহ যাবার পর শ্রীম ঠাকুরের সন্তানদের তাঁর লেখা দেখিয়েছেন এবং স্বামীজী থাকতে থাকতেই তা প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর সেদিনের সাধারণ বর্ণনা রয়েছে। একটি ভক্ত এসেছেন, সঙ্গে পরিবার ও একটি সাত বছরের ছেলে। একবছর হল একটি অষ্টম বর্ষীয় সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। ঠাকুর সেই পুত্রশোকাতুরা স্ত্রীলোকটিকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থাকতে বলছেন। একসময় মাস্টারমশায়ের স্ত্রীও সন্তান হারিয়ে পাগলের মতো হয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁকেও শ্রীশ্রীমার কাছে থাকতে বলেছিলেন। এই দুটি পরিচ্ছেদে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহারের বর্ণনা আছে।

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। ঠাকুর গিরিশকে বলছেন নরেন্দ্রের সঙ্গে তর্ক করতে। ঠাকুর ভক্তদের কখনও কখনও তর্ক করতে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু যখন জেদাজেদি করে একপক্ষের দ্বারা অন্য-পক্ষকে শুধু খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে তর্ক হোত তখন তিনি বিরক্ত হতেন। যদি সত্যকে জানবার জন্য আগ্রহ করে পরস্পর ভাবের বিনিময় করা হোত সে তর্কে ঠাকুরের সমর্থন ছিল। তাতে নিজের ভাবটিও পরিষ্কার হয় এবং বিচার শুদ্ধ হয়, বিশ্বাস বাড়ে ও দৃঢ় হয়। এই জন্য শাস্ত্রেও তর্কের স্থান আছে। শাস্ত্রে আছে, 'শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য'। আত্মাকে জানার উপায় স্বরূপ বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে শুনতে হবে, মনন বিচার করতে হবে আর ধ্যান করতে হবে। এ তিনটি উপায় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রবণ ছাড়া আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে ধারণা আসে না। অনেক

সময় আমরা ভাবি যা তত্ত্ব তা আপনিই আমাদের ভিতর থেকে ফুটে উঠবে। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে তা হয় না। এজন্য শ্রোতব্য বলে শাস্ত্রের বিধান আছে। কিন্তু শুধু শুনলেই হবে না। শুনলাম আর সে সম্পর্কে কিছু চিন্তাই করলাম না তাহলে হবে না। মন্তব্য অর্থাৎ মনন করতে হবে। তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় যাতে দূর হয় তার জন্য তর্ক বা বিচার করতে হবে এবং নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ তর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত পেলাম সেই বিচারসিদ্ধ বস্তুতে মনকে নিবিষ্ট করতে হবে। এই নিবিষ্ট করে রাখার উপর শাস্ত্র খুব জোর দিয়েছেন। কাজেই মননের পরেই প্রয়োজন নিদিধ্যাসনের। কেন না, মনের ভিতর যে বিপরীত সংস্কারগুলি আছে সেগুলিকে দূর করবার জন্য বিচারসিদ্ধ বস্তুতে মনকে স্থির করে রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই ভ্রমজ্ঞান দূর হয়ে রজ্জুকে রজ্জু বলে জানার পরেও সাপের সংস্কারটা মন থেকে যেতে চায় না। বিচার করে রজ্জুর সংস্কারকে দৃঢ় করতে হবে যাতে সাপের সংস্কার একেবারে চলে যায়। ঠিক সেইরকম বিচার করে জানা গেল এই জগৎটা ব্রহ্ম। যা কিছু দেখছি সবই ব্রহ্ম। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কিন্তু চোখে দেখছি এই জগৎটা স্থূল, নশ্বর। সুতরাং জগৎ ব্রহ্ম কি করে হবে এই সংশয় আসে। বিচার করে করে সিদ্ধান্তে এসে সেই সিদ্ধান্তটিকে দৃঢ় করে রাখতে হবে। তাহলে ক্রমশ পুরাণো এই জগৎ সংস্কারটা চলে যাবে। আত্মাকে যে অনাত্মবস্তু বলে মনে হচ্ছে সেই সংস্কারটা থাকবে না। উপনিষদে আছে—

'প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ মু. ২. ২. ৪

—প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার, সেটি যেন ধনু। শর হল আত্মা, জীব বা জীবাত্মা। তাকে লক্ষ্যে যেতে হবে, লক্ষ্য হল ব্রহ্ম। তারপর 'অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্'—প্রমাদহীন হয়ে এই লক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে

খুব সতর্কতার সঙ্গে। এরজন্য চাই একাগ্রতা। তারপর বলছেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হলেই শেষ হল না, 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'—শর যেমন লক্ষ্যে গেঁথে থাকে সেইরকম মনকে, জীবাত্মাকে সেই লক্ষ্যে গেঁথে রাখতে হবে। এই তন্ময়তা, এই দৃঢ়তা, এরই নাম নিদিধ্যাসন।

এরূপ ধ্যান বা তত্ত্বে মনকে স্থির রাখতে না পারলে বিপরীত সংস্কারগুলি যায় না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা মনে করি হঠাৎ যেন ভেল্কির মতো ব্রহ্মদর্শন হবে। সঙ্গে সঙ্গে জগৎবোধটা চলে গিয়ে ব্রহ্মবোধ এসে যাবে। শাস্ত্র বলছেন, তা হয় না। আমাদের জগৎ-বোধটা এত দৃঢ় যে হাজার বিচার করেও ব্রহ্মবোধটা স্থায়ী হয় না, আবার বিপরীত সংস্কার এসে মনকে আচ্ছন্ন করে। তাই মনকে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে গেঁথে রাখতে হবে। একে বলে নিদিধ্যাসন। সেটা সম্ভব হয় বার বার অভ্যাসের দ্বারা। অভ্যাস না করলে বিপরীত সংস্কার ক্ষয় হয় না। আমরা মনে করি নির্বিকল্প সমাধি হলেই সব হয়ে গেল। কিন্তু তা নয়, সেই সমাধিরও অভ্যাস করতে হবে। সমাধিতে বার বার মন বসলেও আবার নেমে পড়ে। সেই জন্য বার বার তাকে তুলতে হয়। এইটিই অভ্যাস। তোতাপুরী এই কারণেই বলেছিলেন, ঘটি না মাজলে ময়লা হয়ে যায়। এ জন্যও সাধন ধ্যান ভজন এগুলির দরকার। ঠাকুর অবশ্য বলেছিলেন সোনার ঘটি হলে মাজতে হয় না, কিন্তু এটি অন্য দৃষ্টিতে ঠাকুর বলেছিলেন। তার মানে এই নয় যে ব্রহ্মজ্ঞের অভ্যাস করতে হয় না। সে কথা কখনও বলেননি। ধ্যানাদি তিনিও করতেন। যদিও সেটি ছিল তাঁর স্বাভাবিক সংস্কার। আমরা ঠাকুরের সন্তানদের কাছে থেকে এই রকম দেখবার সুযোগ পেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ স্বামী শিবানন্দের কথা মনে পড়ছে। তিনিও ঐরকম মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে যখন তখন যেখানে সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁদের মনের স্বাভাবিক গতি ছিল ঐ দিকে। বরং জোর করে বিষয়ের দিকে

তাঁদের মনকে নামিয়ে রাখতে হোত। এই স্বাভাবিক ভাবটি আসার মূলে ছিল ঐ অভ্যাস।

আমরা মনে করি কোনোরকম করে অনুভূতিটা এসে গেলেই হল। সে অনুভূতি বস্তুটি কি? শাস্ত্র বলছেন, জ্ঞান মাত্রই অজ্ঞানের নিরসন করে না। সংশয়-বিপর্যয়রহিত জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞানের ভিতর আর সংশয় আসে না বা বিপরীত কোনো ভাবনা আসে না সেই জ্ঞানই অজ্ঞানের নিরসনকারী। সংশয় বিপর্যয় দূর করার জন্য যিনি জ্ঞানী পুরুষ তাঁকেও অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস কতদূর করতে হবে তার সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সীমারেখা টানা নেই। গোপালের মা ঠাকুরকে বলেছিলেন, গোপাল, আমার তো এত দর্শন হোল, এখন আমি কি করব? ঠাকুর বলছেন, কি আর করবে? গোপালের নাম করবে। যে ভগবানকে অনুভব করেছে, বিষয় যার কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে সে কি নিয়ে তার বাকী জীবনটা কাটাবে? যাঁকে সে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন বলে বুঝেছে তাঁকে নিয়েই থাকবে। আসলে ঐ ভাবকে দৃঢ় করবার জন্য, যাতে আর পূর্ব সংস্কার মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারে তাই অভ্যাস রাখতেই হয়। সুতরাং ভগবানের অনুভূতি হলে আর কিছু করণীয় থাকে না তা নয়, থাকে। তখনও নিদিধ্যাসনের দরকার হয়। প্রশ্ন হতে পারে যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হলে আর নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন কি? তার উত্তর আগেই বলেছি। কোন জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়? যে জ্ঞান সংশয়-বিপর্যয় রহিত সেই জ্ঞানের দ্বারা। যে জ্ঞানের দ্বারা সংশয় দূর হয়েছে, সৎ-কে, অসৎ বলে মনে হয় না, সেই জ্ঞান দরকার। সেই জ্ঞান লাভ করতে হলে সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এই দৃষ্টি দিয়ে দেখেই বলেছেন, ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ। ব্রহ্মবিদ্, হলেন যিনি জেনেছেন, ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্ হলেন যিনি সেই জ্ঞানকে নিঃসংশয়িত

রূপে জেনেছেন। আর তারও বড় কথা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ, যিনি সর্বদা সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে ব্যবহার করেন। শাস্ত্রের কথা, 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' (মু. ২.২.৮)—সেই পরমতত্ত্বকে জানলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ সমস্ত বাসনা দূর হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। এইজন্য অভ্যাসের কথা বলা আছে। অবশ্য অন্য একটা মতও আছে, যে, একবার সেই তত্ত্বের অনুভূতি হয়ে গেলে আর ভ্রমের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তার বিপরীত কথাও বলা আছে, 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'—অর্থাৎ লক্ষ্যভেদ হয়ে গেলেই হয় না, যাতে তাঁর থেকে মনটা আর বিক্ষিপ্ত না হয়, বিচ্যুত না হয় তার জন্য অভ্যাস করতে হবে। সুতরাং শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। শুনতে হবে, মনন করতে হবে, নিদিধ্যাসন করতে হবে, ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিতির অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস ছাড়া এই স্থিতি লাভ হয় না। এইজন্য বলছেন, 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ'। লক্ষ্যে পৌঁছেও সাধন করা দরকার। এইজন্য ঠাকুর গোপালের মাকে নাম করে যাবার জন্য বলছেন। তা না হলে তাঁর জীবনটা চলবে কিভাবে? হয়তো জড় হয়ে যাবে। জ্ঞানীদের দেহ জড় হয়ে গেলে সেই দেহ আর স্থায়ী হয় না। তখন আর তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দেওয়ার লোক থাকে না। জ্ঞানী পুরুষেরা দেহকে আঁকড়ে ধরেও থাকতে চান না, আবার তাকে পরিহারও করতে চান না। দৈবাধীন হয়ে, দৈব প্রেরিত হয়ে ব্যবহার করতে থাকেন। আর সেই দেহের দ্বারাই জগতের কল্যাণ হয়। এইরকম জ্ঞানী পুরুষ যদি জগতে না থাকেন, মাঝে মাঝে জগতে না আসেন তা হলে এই ভগবৎ তত্ত্ব আমাদের কে দেখাবে, কে শেখাবে? যতদিন না শাস্ত্রবাক্য জীবনের দ্বারা প্রমাণিত হয় ততদিন শাস্ত্র কেবল কথা মাত্র। এঁদের জীবনের দ্বারাই শাস্ত্রবাক্য প্রাণবন্ত হয়। তাই তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্রও যেমন দরকার আবার সেগুলি জীবনে প্রতিভাত হয়েছে এমন জীবনও দরকার।

স্বামীজী ঠাকুরকে 'বেদমূর্তি' বলতেন। বেদের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান যেন মূর্তি ধারণ করে রয়েছে। এই মূর্তজ্ঞান যদি না থাকে তাহলে মানুষের ভিতরে সেই জ্ঞানের প্রভাব পড়ত না, কেবল গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থেকে যেত। যেমন একটি আলো থেকে অন্য আলো জ্বালা যায়, তেমনি জ্ঞানী পুরুষের জীবন দ্বারাই অন্য জীবনে সেই জ্ঞানের প্রবাহ চলে। আর তার রেশ অনেকদিন ধরেই চলে। কাজেই যাঁরা শাস্ত্রকে প্রাণবন্ত করেন তাঁরা যদি জগতে না আসেন তাহলে শাস্ত্র কখনও লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ভগবানকে বারে বারে আসতে হয়। একবার তাঁরা এলে সেই আলো অনেকদিন ধরে কাজ করে। সেই দীপটি যখন স্তিমিত হয়ে আসে আবার নূতন করে তাকে জ্বালতে হয়, তখনই তাঁকে আবার আসতে হয়, এলেই সেই আলো নূতন করে জ্বলে ওঠে।

তাই বলা হয় শুধুশাস্ত্র আমাদের সব সংশয় দূর করতে পারে না, বিবেক বৈরাগ্য জাগাতে পারে না। শাস্ত্র কেবল সিদ্ধান্তগুলিকে পুঁথির পাতায় লিখে রাখে। অবশ্য পুঁথির পাতায় থাকারও প্রয়োজন আছে। তা না হলে জ্ঞানীর সিদ্ধান্ত যে তাঁর মনঃকল্পিত উদ্ভট একটা সিদ্ধান্ত মাত্র নয় তা যাচাই করা যাবে কি করে? শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে দেখতে হয়। আবার শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও যে নিছক কল্পনা নয়, তা যে সত্য, তা প্রামাণিত হয় এইসব জীবনের ভিতর দিয়ে। কাজেই এই দুইটি পরস্পরের পরিপূরক। শাস্ত্রেরও প্রয়োজন আছে, সিদ্ধপুরুষেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং এইসব জীবন্মুক্ত বা বিজ্ঞপুরুষ কিংবা ঈশ্বরকল্প পুরুষ বা অবতার, এদের ব্যবহারের ভিতর দিয়ে জগতের কল্যাণ হবে, তা না হলে তাঁরা যে অবতার তা প্রমাণিত হবে না। স্বামীজী বলেন, কোনটি ঠাকুরের কথা আর কোনটি নয় তা বিচার করবার একমাত্র কষ্টিপাথর হচ্ছে কথাগুলি জগৎকল্যাণকর কি না তা

দেখা। ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কাজ জগতের কল্যাণের জন্য। যদি দেখ তার দ্বারা জগতের কল্যাণ হচ্ছে তাহলে ধরে নেবে যে তা ঠাকুরের কথা। তা না হলে ঠাকুরের কথা রূপে কেউ চালিয়ে দিতে চাইলেও বুঝবে এটা ঠাকুরের কথা নয়। ঠাকুর বলেছেন, শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মেশানো আছে। কারণ শাস্ত্রকার কি বলেছেন সে কথা তো জানবার উপায় নেই, লিপিকার কি লিখেছেন তাই দেখবার জিনিস। লিপিকারের কোনো প্রমাদ যদি কোথাও থাকে তাহলে শাস্ত্রের ভিতরেও সেই প্রমাদ ঢুকে যাবে। এখন আমরা কোনটিকে গ্রহণ করব? যুক্তির সাহায্যে বিচার করে দেখে নিতে হবে এবং অনুভবের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে হবে। এই শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব তিনটি যদি মিলে যায় তাহলে সেইটিই হবে অভ্রান্ত। তা না হলে সন্দেহ জনক।

প্রশ্ন হচ্ছে আমার সীমিত বিচারশক্তি দিয়ে আমি কতটুকু বুঝতে পারি? উত্তর হচ্ছে, যতটুকু বুঝতে পারি ততটুকুই গ্রহণ করব এবং তারপর এগিয়ে চলব। ক্রমশ আমার বুদ্ধি যত শুদ্ধ হবে তত আরও ভাল করে বুঝতে পারব। কাজেই বিচারসহ নয় এমন জিনিস শাস্ত্র বললেও নেব না।

মীমাংসা শাস্ত্রের এক জায়গায় এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, শ্রুতি যদি কোথাও প্রত্যক্ষবিরোধী কোনো কথা বলে তাহলে শ্রুতিবাক্যকে গ্রহণ না করে প্রত্যক্ষকে মানতে হবে। শ্রুতিবাক্যকে গ্রহণ করলে প্রত্যক্ষবিরোধী কথাকে মেনে নেওয়া হবে। তবে যুক্তি-বিরোধী কোনো কথা শ্রুতি অবশ্যই বলবে না। অবশ্য মীমাংসাদি সম্বন্ধে আর একটি বিষয় খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে, সেটা হল, শ্রুতি অলৌকিক প্রমাণ। যে বিষয়ের অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না এমন বিষয়েই শ্রুতি অলৌকিক প্রমাণ। 'অজ্ঞাত জ্ঞাপকং শাস্ত্রম্'। শাস্ত্র অজ্ঞাত

বিষয় জানিয়ে দেয়। অজ্ঞাত বস্তু মানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়। ইন্দ্রিয় যাকে জানতে পারে না, অতীন্দ্রিয় যে বিষয়, সে বিষয়েই শাস্ত্র প্রমাণ, প্রত্যক্ষ বিষয়ে নয়। ব্রহ্মকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করতে পারছি না, শাস্ত্র সেখানে প্রমাণ। স্বর্গ, নরক আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলে ধরতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিরোধী কথা শাস্ত্র বললেও মানব না। সুতরাং এইটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে শাস্ত্রের প্রমাণ হচ্ছে অলৌকিক বিষয়ে, যে বিষয়াদি আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি না। বিজ্ঞানের সঙ্গেও যদি শাস্ত্রের কোথাও বিরোধ হয় তাহলেও মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ আর শাস্ত্র ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের প্রমাণ।

সুতরাং লৌকিক বিষয়ের অনুভব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা হবে আর অতীন্দ্রিয় বিষয়কে শাস্ত্রের দ্বারা জানতে হবে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়। তাহলে প্রশ্ন হল বিচার কি ভাবে করতে হবে? আমরা যে বলছি জগৎটা ব্রহ্ম এ তো প্রত্যক্ষবিরোধী কথা হয়ে গেল। আমরা দেখছি জগৎটা স্থূল, বিকারী, আর শাস্ত্র বলছে ব্রহ্ম স্থূল নয়, বিকারী নয়। তাহলে ব্রহ্ম জগৎ হতে পারেন না। কাজেই শাস্ত্র এখানে আমাদের প্রত্যক্ষবিরোধী কথা বলছে। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তটি যে জগৎটা ব্রহ্ম, এ কি তাহলে মিথ্যা? না, তা নয়। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে মিথ্যা নয় একথা খুব বিচার করে দেখান হয়েছে। জগৎটাকে আমরা যে ভাবে দেখছি এই জগৎটা সেইভাবে প্রত্যক্ষের বিষয় এবং সত্য। কিন্তু 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই সিদ্ধান্ত লৌকিক স্তর বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর থেকে করা হয়নি। অতি সূক্ষ্মবিচার বা অতীন্দ্রিয় স্তর থেকে বিচার করে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।' কাজেই এই শাস্ত্রবাক্যটি সত্য কি না তা দুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করা যায়। যখন অতীন্দ্রিয়

অনুভব থেকে বলা হয় তখন বাক্যটি সত্য এবং প্রত্যক্ষবিরোধী নয়। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা বিচার করা হয় তখন কিন্তু বাক্যটিকে সত্য বলে মনে হয় না। কাজেই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনেক সময় আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে মানতে গিয়ে অন্ধের মতো চললে হবে না। যেখানে বুদ্ধি কাজ করে সেখানে আমাদের বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে। বুদ্ধিকে একেবারে ভোঁতা করে রেখে অন্ধের গোলাঙ্গুল ধরে বৈকুণ্ঠে যাবার মতো চললে হবে না। অন্ধকে বলা হয়েছে তুই গরুর ল্যাজটা ধরে থাক, গরু তোকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবে। গরু অন্ধকে যে দিকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধ সেদিকেই যাচ্ছে আর ভাবছে আমি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি। ওরকম হলে চলবে না। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে। শাস্ত্র যা বলছে তর্কবিচার করে দেখতে হবে তা সত্য হতে পারে কি না। এভাবে বিচার করতে করতে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি জন্মাবে, তখন আমরা বুঝতে পারব যে শাস্ত্র যা বলছে তা অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা, এই জগতে আমরা যা অনুভব করছি তার বিরুদ্ধে নয়। জগৎটাকে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রত্যক্ষ করছি, এখানে আমাদের সত্যগুলি প্রত্যক্ষের ভিতর সীমিত হয়ে আছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্যকে বুঝতে হলে যে তত্ত্বের সাহায্যে তা বুঝব তা যাতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অভ্যাসের সাহায্যে তাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। এই হল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

পরিশিষ্ট—(১)

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও মঠের সূচনা

পরিশিষ্ট অংশে মাস্টারমশায় ঠাকুরের সান্নিধ্যে যে সব ভক্তেরা এসেছেন তাঁদের অবস্থার সুন্দর বর্ণনা করেছেন। এইসব যুব ভক্তদের লক্ষ্য তখনও স্থির হয়নি, অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের উন্মেষ হলেও বাড়ী থেকেই আসা যাওয়া করতেন। কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরের সেবায় যখন তাঁদের রাতের পর রাত কাটাতে হোত সাধনার পর্ব তখন থেকেই শুরু হয়। ঠাকুরের স্থূল শরীর যাবার পর কাশীপুরের বাগানবাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু সুরেন্দ্রের খরচে বরাহনগরে একটা ভূতুড়ে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল। ভক্তেরা অনেকেই আবার সেখানে এসে জুটলেন কিন্তু সেখানে তাঁদের খাওয়া পরার কোনো সংস্থান ছিল না। তবে সকলের মন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকত। এই সময়ে শশী মহারাজ মায়ের মতো যত্ন করে সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতেন। যে দিন যা জুটত তাই ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তাঁরা প্রসাদ পেতেন। এমনও হয়েছে যে শুধু তেলাকুচা পাতা সিদ্ধ করে তাঁরা ভাতের সঙ্গে খেয়েছেন। এ কথা মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ খেয়েছি, তা বলে কি রোজ খেয়েছি? কখনও কখনও ভক্তেরা ভাল খাবারের ব্যবস্থাও করে দিতেন।' তবে সাধারণত তখন ঐরকম অভাবের সংসারই ছিল। ভক্তের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হলে অন্নসংস্থানও যখন অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন অনেকেই তীব্র বৈরাগ্যবশত বেরিয়ে পড়তেন তীর্থভ্রমণে। শশী মহারাজ কিন্তু কখনও মঠ ছেড়ে কোথাও যাননি, মঠে থেকে একনিষ্ঠ

ভাবে ঠাকুরের সেবা করেছেন। অন্য সকলের কাছে মঠ ছিল একটি ধর্মশালার মতো, অন্য জায়গা থেকে শ্রান্ত হয়ে এসে মঠে কয়েকদিন বাস করলেন, আবার বেরিয়ে পড়লেন তীর্থভ্রমণে।

এঁদের পরিব্রাজক জীবনটিও বড় সুন্দর। সকলে চলে গিয়েছেন নানা জায়গায়, কেউ কারও সঙ্গে যেন সম্পর্ক রাখতে চান না। একান্ত ভগবৎ চিন্তা করবেন এই ভাব তখন সকলেরই মধ্যে প্রবল। কিন্তু ঠাকুরের একটি অপূর্ব অদৃষ্ট নিয়মে তাঁরা কেউই একাকী বেশীদিন থাকতে পারতেন না, যোগাযোগ হয়ে যেত এবং বেশী করে হোত যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তখন অন্যরা এসে তাঁর সেবায় লাগতেন। স্বামীজী নিজেও বলেছেন, আমি কতবার ভেবেছি নির্জনে পাহাড়ে ধ্যানস্থ থেকে জীবনটা কাটিয়ে দেব কিন্তু সেখান থেকে বার বার ঠাকুর আমায় টেনে এনেছেন। কারও অসুস্থতার সংবাদ শুনলেই তাঁকে সব ফেলে চলে এসে তাঁর পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এইরকম বারবার তাঁকে আসতে হয়েছে।

বরাহনগর মঠে থাকার সময় স্বামীজীকে মাঝে মাঝে বাড়ী যেতে হোত। তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়ী বিষয়সম্পত্তি নিয়ে শরিকেরা সব মামলা করেছেন তার তদ্বির করতে যেতে হোত। বাড়ী থেকে ফিরে এলে কেউ মামলার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি চাইতেন না এইসব সাংসারিক ব্যাপারে তাঁর ভাই-দের মন ভারাক্রান্ত হয়। একাকী সব কষ্ট সহ্য করতেন। সাংসারিক অভাবেও এই সময় তাঁকে জর্জরিত হোতে হয়েছে। অনেকদিন এমন হয়েছে যে, বাড়ী গিয়ে দেখেছেন খাদ্যাভাব। তখন মা বোনেদের আহারে ভাগ না বসিয়ে 'নেমন্তন্ন আছে' বলে তিনি চলে এসেছেন। আবেদন পত্র নিয়ে অফিসে অফিসে ঘুরেছেন, কোথাও চাকরী হয়নি। বিদ্যাসাগরের স্কুলে একবার চাকরী পেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য শিক্ষকেরা চক্রান্ত করে

বিদ্যাসাগর মশায়কে জানালেন যে উনি ছেলেদের পড়াতে পারেন না। তখন বিদ্যাসাগর মশায়ও মাস্টারমশায়ের মাধ্যমে স্বামীজীকে সেই কথা শুনিয়ে দিলেন। শুনে স্বামীজী বললেন, আমি তো বেশ খেটে-খুটে পড়াবার চেষ্টা করি, তবু কেন এমন বলে জানি না। এত প্রতিভা অথচ ঠাকুর তাঁর এই পরিণাম করেছেন। সাংসারিক জীবনে অত দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন বলেই জগতের দুঃখ তিনি এমন নিবিড় ভাবে অনুভব করতে পেরেছেন।

ঠাকুরের সন্তানদের জীবনের দিক্‌নির্ণয় তখনও হয়নি, কি তাঁদের করণীয় তা তখনও তাঁরা স্থির করতে পারেননি। কিন্তু এই লক্ষ্যে তাঁরা স্থির ছিলেন যে তাঁরা জপধ্যান করবেন, ভগবান লাভ করবেন। আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, ভগবান লাভ কি তখনও তাঁদের হয়নি? উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আমরা দেখেছি ঠাকুর থাকতেই স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়েছিল। সুতরাং হয়নি তা নয় কিন্তু এইটা আমাদের একটা শিক্ষণীয় বিষয় যে উচ্চ অবস্থাতে গিয়েও মন স্থিতিশীল হয় না। এইজন্য সাধন দরকার। মহাপুরুষের কৃপায় হঠাৎ সেই উচ্চভূমিতে মন উঠতে পারে কিন্তু তাতে প্রতিষ্ঠিত হোতে হলে সাধন দরকার। একবার যে আস্বাদন পেয়েছেন তাতেই চিরকালের জন্য মন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে বাঁধা হয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু সেইটিকে সর্বদা জাগিয়ে রাখবার জন্য সাধনার দরকার। তীব্র সাধনা দ্বারা সে অবস্থায় স্থিতিলাভ করতে হয়।

তাছাড়া তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাতে হবে এজন্যও তাঁরা এইরকম কঠোর সাধনা করে চলেছেন। এইসময় মাঝে মাঝে তাঁরা ভিক্ষায় বেরোতেন, সবসময় তাও করতেন না। একবার স্বামী সারদানন্দ গিয়েছেন ভিক্ষা করতে, তাঁর তখন হৃষ্টপুষ্ট শরীর ছিল, তাই দেখে একজন বলছেন, এতবড়

শরীরখানা, গাড়ীর কণ্ডাক্টরী করতে পার না? তিনি হেসে চলে গেলেন। এরকম অভ্যর্থনাও সময় সময় পেতে হয়েছে। তখনকার দিনে বাঙলাদেশে সাধু সন্ন্যাসীর কথা লোকে বেশী জানত না। ত্যাগী সাধুদের এরকম কোন সঙ্ঘ তখনও হয়নি। কাজেই সাধু জীবনের সঙ্গে সাধারণের বেশী পরিচয় ছিল না। আমরাও ছেলেবেলায় ভাবতাম জটা থাকবে, চিমটে থাকবে, লেংটি পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তবে সে সাধু। সাধুরা আমাদেরই মতো জামাকাপড় পরবে একথা ভাবতেও পারিনি। ওঁরা তো ঐরকম বেশবাস পরে কখনও বেরোতেন না। একখানা কাপড় চাদর পরে বাইরে বেরোতেন, কিন্তু ভিতরে তীব্র বৈরাগ্য, অপরিগ্রহের চূড়ান্ত। অনায়াসলব্ধ আহারে দিন কাটাচ্ছেন, কখনও হয়তো কিছুই জোটেনি। এইরকম এক অনাহারের দিনে একজন বলছেন, এস, আজকের দিনটা আমরা ধ্যান করে কাটিয়ে দিই। তারপর শশী মহারাজ এক ভক্তের বাড়ী গিয়ে ঠাকুরের জন্য কিছু চেয়ে নিয়ে এসে ভোগ দিলেন ও পরে সকলকে একটু একটু প্রসাদ ভাগ করে দিলেন। এই তিতিক্ষা সম্পর্কে ঠাকুরের এক সন্তানের কাছে শোনা যায় যে, সেই তিতিক্ষা, কঠোরতা দেখলে ভূতও পালিয়ে যায়। এই কঠোর তিতিক্ষার ভিতর দিয়ে দিন কাটিয়েও তাঁদের মন কিন্তু আনন্দে পরিপূর্ণ থাকত। তারপর পরিব্রাজক হয়ে এক একজন বেরিয়ে পড়লেন, ভারতের নানাস্থানে ঘুরলেন। তখনও এইরূপ কঠোর তিতিক্ষু জীবন যাপন করেছেন। কোনো সহায়সম্পদ ছিল না, খাওয়াদাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছ থেকেও তাঁর পরিব্রাজক জীবনের এরকম অনেক গল্প আমরা শুনেছি। একবার বলছেন, চলেছি তো চলেছি, কোন লক্ষ্য নেই, কোথায় যাব কিছু ভাবিনি। যেতে যেতে হয়তো কোন গ্রামে বসে পড়লাম, খাবারও কিছু পাওয়া গেল। আবার কোন

জায়গায় হয়তো একখানা ভাগবত পেলাম, পেয়েই পড়তে বসে গেলাম। ভাগবতখানা শেষ করে ফেললাম। তারপর সেই গ্রাম থেকে চলে গেলাম। ঐরকম, কেবল উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরা। একেবারে যেন ভগবৎ-ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলা। ভাগবতে যেমন আছে— শুকদেব যাচ্ছেন, কোথায় চলেছেন কেন যাচ্ছেন কোনো সংকল্প নেই। এঁদের জীবনও অনেকটা সেইরকম। স্বামী অখণ্ডানন্দ এইরকম অবস্থায় একসময়ে রাজস্থানের এক মন্দিরে ছিলেন। ভক্তেরা তাঁকে নানা জিনিস উপহার দিত, মন্দিরের পুরোহিত সেগুলো নিতেন। পুরোহিত ভাবছেন ভক্ত সমাগম আরও বৃদ্ধি করতে হলে কিছু তো দেখান দরকার। কিন্তু অখণ্ডানন্দজী দিনের বেলা ওখানকার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে এসে পড়তেন আর রাত্রিতে ধ্যান করতেন। ভক্তেরা দেখতেন সাধুজী বই পড়ছেন। সবাই চলে গেলে তিনি ধ্যানে বসতেন। পূজারী তাঁকে বার বার বলতেন, আরে ধ্যান-ট্যান তো দর্শনার্থীদের আসার সময়েই করতে হয়। এইসব ছোট-খাট দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে বোঝা যায় তখন তাঁদের জীবন কিভাবে কাটত। স্বামীজীর জীবনেও এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। পাহাড়ে পর্বতে সম্পূর্ণ নিঃসহায় ভাবে চলেছেন একান্তে নির্ভয়ে। একদিন অভুক্ত অবস্থায় এক ষ্টেশনে বসে পড়েছেন কেউ একজন খাবার নিয়ে এসে বলছেন, রামজী আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। স্বামীজী অবাক, কে রামজী? কেউ তো ওখানে তাঁকে চেনে না, কে খাবার পাঠালে? লোকটি বললেন, তিনি দুপুরে ঘুমিয়েছিলেন, তিনবার একই স্বপ্ন দেখলেন যে রামজী বলছেন, আমার ভক্ত অনাহারে রয়েছে তুই তাঁর সেবা না করে খেয়ে দেয়ে ঘুমচ্ছিস্? তিন বারের পর তিনি আর থাকতে না পেরে খাবার নিয়ে স্বপ্নে দেখা জায়গায় এসে স্বামীজীকে দেখতে পেলেন। এরকম ঘটনা আরও আছে। কেউ হয়তো কোনো সময় রেলের একখানা টিকিট করে

দিয়েছেন তাঁর পথশ্রমের কষ্ট লাঘব করাবার জন্য। বৃন্দাবনে গিয়েছেন, স্নানের সময় বাঁদরে তাঁর একমাত্র কৌপীনখানা নিয়ে চলে গেল। আর দ্বিতীয় কৌপিন নেই যে সেটা পরে চলতে পারবেন। একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় শহরের ভিতরে কি করে যাবেন ভেবে অস্থির। রাধারানীর উপর অভিমান হল,—রাধারানীর রাজ্যে এইরকম ব্যবস্থা? এখানেই দেহত্যাগ করব। তারপর আবার সেই কৌপীনটি বাঁদরেরা ফেরৎ দিয়ে গেল। মহাপুরুষদের জীবনের এইরকম ছোটখাট ঘটনায় তাঁদের অন্তরের ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এখানে মাস্টারমশায় তারই একটু আভাস দিয়েছেন মাত্র।

স্বামীজী এই যে বলছেন, ভগবান নাই বোধ হচ্ছে, যত প্রার্থনা করছি একবারও জবাব পাই না, এটা হচ্ছে অভিমানের কথা। ভগবানের প্রতি ভক্তের অভিমান। একান্ত আপনবোধ হলে তখন অভিমান হয়। রামপ্রসাদের গানে আছে,

> 'মাকে আর ডাকিসনারে ভাই
> থাকলে এসে দিত দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই।'

কত অভিমানের কথা, কতখানি অনুরাগ এলে তবে এরকম মনে হয়। স্বামীজী বলছেন, যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাই নাই। কত দেখলাম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে, কত কালীরূপ আরও অন্যান্য রূপ। তবু শান্তি হচ্ছে না। কথাগুলি আমাদের ভাববার মতো। একটু আধটু স্বপ্ন দেখেই আমরা ভাবি আমার বেশ একটু অনুভূতি হয়েছে। ওসব কিছু নয়। স্বামীজী সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, কত রূপ দেখেছেন, কত মন্ত্র দেখেছেন, তবুও শান্তি হচ্ছে না। কারণ কত বড় আধার, সে আধার কেবল এইটুকু ভাবে ভরে না। সর্বক্ষণ সমস্ত প্রাণমন তাঁতে ভরে থাকবে এইটিই তাঁর কাম্য। শুধু ভিতরে নয়, বাইরে ভিতরে সর্বত্র তাঁকে দর্শন করতে চান। কোনো

বিগ্রহে, কোনো একটি স্থানে বা হৃদয়ে তাঁকে অনুভব করা—শুধু এইটুকুতে তাঁর মন ভরছে না। সর্বভূতে তিনি আছেন এই শোনা কথাটিকে জীবনে অনুভব করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। কঠোর সাধনা ছাড়া এই লক্ষ্যে স্থিতি হয় না।

যদিও এঁরা খুব পবিত্র সংস্কার নিয়ে জন্মেছিলেন, অবতারের পার্ষদ, তবু এঁদেরও অতি কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। যে বস্তু যত দুর্লভ তা পেতে গেলে অনুরূপ সাধনাও করতে হবে—এইটিই তাঁরা সাধনা করে দেখিয়ে গিয়েছেন। উপনিষদে যে আছে 'শরবৎ তন্ময়ো-ভবেৎ—অর্থাৎ তীর যেমন লক্ষ্যে বিঁধে থাকে সেইরকম মনকেও তাঁতে স্থির রাখতে হবে। তাঁদের সাধনার ভিতর দিয়ে এইটিই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

আর একটা জিনিস ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে লক্ষ্য করবার মতো, সেটা হল তাঁদের পরস্পরের প্রতি প্রবল অনুরাগ। এই অনুরাগের কারণ হচ্ছেন ঠাকুর স্বয়ং। তাঁকে সকলে ভালবাসে, তাই তাঁর আপন জন যারা তারাও পরস্পরকে ভালবাসে। এই ভালবাসা অসাধারণ যার কোনো তুলনা হয় না এবং এরই ভিতর দিয়ে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই ভালবাসা যতদিন দৃঢ় থাকবে ততদিন সঙ্ঘের স্থিরতা। পরস্পরের প্রতি অনুরাগ শিথিল হলে সঙ্ঘশক্তি কমে যাবে। আমরা ঠাকুরের সন্তান—এই সম্বন্ধ রক্তের সম্বন্ধের চেয়েও গভীর। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীও সেইরকম। ভক্তেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে, পরস্পরকে সুখে দুঃখে সাহায্য করবে, সমবেদনা জানাবে। এইভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ বজায় রাখবে। এদের সম্বন্ধ একটা বিশেষ সম্বন্ধ। সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র দত্ত, মাস্টারমশাই, গিরিশবাবু, এঁরা এই সঙ্ঘের গোড়া থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এঁরা চিরকাল পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন কারণ

তাঁরা জানতেন যে ঠাকুর এঁদের সবাইকেই ভালবাসেন, কাজেই তাঁরাও পরস্পরের ভালবাসার পাত্র।

মঠের যখন প্রতিষ্ঠা হল, সুরেন্দ্র বলছেন, আমরা তো বাড়ীতে জ্বলে পুড়ে মরি এখানে আমাদের একটু জুড়োবার জায়গা হবে, একটু মনের ক্লান্তি দূর করব, অপবিত্রতার হাত থেকে মুক্ত হব। এইজন্য মঠ করা দরকার। বাস্তবিক মঠ, আশ্রম এগুলি কেন? না, সেখানে গিয়ে মানুষ একটা পবিত্র ভাব পাবে, পবিত্র জীবন যাপনের প্রেরণা পাবে। তাঁরা তো লোকালয়ে মঠ আশ্রম না করে পাহাড়ে পর্বতে কাটিয়ে দিতে পারতেন। ঠাকুরের নিয়ন্ত্রণ অনুসারে তাঁরা তা করেননি। ঠাকুর চেয়েছেন তাঁরা সংসারের সঙ্গে থেকে সংসারীদের পথ দেখাবেন। যদি সংসারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকতেন, তাতে সংসারীদের কিছু উপকার হোত না। তাঁদের জীবন কেবল তাঁদেরই জন্য হোত, জগতের কোন কাজে লাগত না। বৌদ্ধ ধর্মে আছে বোধিসত্ত্বরা মুক্তি চান না, তাঁরা জন্মে জন্মে দেহধারণ করেন অপরের কল্যাণের জন্য, অপরকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবার জন্য। স্বামীজী এইজন্য বলেছেন, বুদ্ধকে আমি খুব উঁচুতে স্থান দিই কারণ তিনি নিজের জন্য কিছু করেন নি, নিজের মুক্তিও চান নি, জগৎকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর সাধনা। এইটি দেখবার জিনিস যে, অবতারের আবির্ভাব নিজের জন্য নয়, সকলের জন্য। তাই বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করে ভাবলেন, এই জ্ঞান কাকে দেব? প্রথমেই তাঁর সেই পাঁচ শিষ্যের কথা মনে হল যাঁরা বুদ্ধকে তিতিক্ষা থেকে নিবৃত্ত হতে দেখে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই জন্য তিনি বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথে এলেন। তাঁর সৌম্যমূর্তি দেখে অভিভূত শিষ্যরা পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ করে তাঁর চরণে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের সাহায্যে এবং নিজেও সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করলেন। এই হচ্ছে বুদ্ধের বুদ্ধত্ব যা কেবল আত্মমুক্তি

বা সমাধিস্থ হয়ে থাকার জন্য নয়। জগৎকে এই তত্ত্ব দেবার জন্য। যীশুও তাঁর শিষ্যদের ধর্মপ্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।, ঠাকুরও স্বামীজীকে এবং তাঁর অন্যান্য সন্তানদের এইভাবে তৈরী করেছেন। স্বামীজীকে নিজের মুক্তি কামনার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। স্বামীজী সেই ভর্ৎসনা ভোলেননি। সমস্ত জীবন চরকীর মতো ঘুরেছেন জগৎ কল্যাণের জন্য, যেখানেই গিয়েছেন জগৎ কল্যাণ তাঁর দ্বারা আপনিই হয়েছে।

এইরকম যাঁরা পূর্ণ তাঁরা নিজেদের পূর্ণতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, অপরকেও তার অংশ দেবার জন্য কাতর হন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী আছেন যারা নিজের মুক্তিতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যান, তাদের আধার অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু ঠাকুর তাঁর সন্তানদের সেইরকম ভাবে তৈরী করেননি। তাই তাঁরা গুরুভাইদের নিয়ে এক সঙ্ঘ গড়ে তোলেন এবং সেই সঙ্ঘকে ঠাকুরের বাণী প্রচারের যন্ত্র করে গিয়েছেন। এটি কম কথা নয়। তখনকার দিনে এরকম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা কারো ছিল না। ঠাকুরের ছিল কিনা পরিষ্কার বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই ছিল কারণ তিনি প্রেরণা না যোগালে তাঁরা করলেন কি করে? অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, আমার শরীরটা কেন যাচ্ছে না জানিস? তোরা রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াবি এইজন্য এই শরীরটাকে ছাড়তে পারছি না। সাংসারিক বন্ধন যেমন থাকে সেইরকম একটা বন্ধনের মধ্যে তিনি সন্তানদের রাখতে চাইছেন। এটি বেশ বোঝা যায়, কারণ একজায়গায় বলছেন, তোমরা সকলে আমার সামনে বস, ভগবানের নাম কর, আমি দেখি—বলে আনন্দ করছেন। এই যে একসঙ্গে সকলকে দেখার ইচ্ছা, তাঁর সেই ইচ্ছাই পরে পূর্ণতা লাভ করল সঙ্ঘ রূপে। স্বামী শিবানন্দ বলেছিলেন, সঙ্ঘের কল্পনা আমাদের কখনও ছিল না। আমরা সাধু হব, তপস্যা করব। এই জানতাম, তার বেশী কিছু ভাবিনি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর প্রথমে প্রায় সকলে বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলেছেন, তোরা কি এইজন্য এসেছিস? তোরা কি ভুলে গেলি জীবনের উদ্দেশ্য? এমনি করে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁরাও আবার বাড়ী ছেড়ে মঠে আশ্রয় নিলেন। এইভাবে মঠের যে ধারা আরম্ভ হয়েছিল সেই ধারার স্রোত এখনও চলছে এবং ক্রমে আরও সুদূর প্রসারী হবে। ঠাকুরের ইচ্ছা ফলীভূত হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে এটা বেশ বোঝা যায়। পরিকল্পনা করে তাঁর সন্তানেরা নিজেরা যে একটা কিছু গড়ে তুলেছেন তা নয়, যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে করে এসেছেন এবং সেইভাবেই এর গতি আজও অব্যাহত ভাবে চলে আসছে।

মঠের ভক্তদের বৈরাগ্যের অবস্থা

গোড়ার দিকে মঠে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ঠাকুরের যে সব সন্তানেরা ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসেন তাঁরাই প্রথম বরাহনগর মঠকে অবলম্বন করে। অন্যান্য ভক্তেরা মাঝে মাঝে এসে দু চারদিন থাকতেন এবং সকলে মিলে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আলোচনাতেই অতিবাহিত করতেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে সকলের ভার দিয়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র তাই সকলের চিন্তায় অস্থির। কোথায় কোন ভাই চলে গেল তার জন্য চিন্তা হচ্ছে, তাই বলছেন, 'এখানেও মায়া। তবে আর সন্ন্যাস কেন'?

তারপরের চিত্র থেকে তাঁদের তীব্র বৈরাগ্যের ভাব জানতে পারি। সকলে বৈরাগ্যবশতঃ অন্যত্র তপস্যা করতে চলে যেতে চাইছেন, একমাত্র শশী মহারাজেরই অন্যত্র যাবার ইচ্ছা ছিল না। অনেকে বলেন, শশী মহারাজ যদি সেসময় ঠাকুরকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে না থাকতেন তাহলে এই মঠ হোত কিনা সন্দেহ। শশী বলছেন, 'আমি সন্ন্যাস-ফন্ন্যাস মানি না। আমার অগম্যস্থান নাই। এমন জায়গা নাই যেখানে আমি

থাকতে না পারি।' অর্থাৎ এমনভাবে তিনি ঠাকুরের ভাবে নিবিষ্ট হয়েছেন যে কোনো পরিবেশই তাঁকে চঞ্চল করতে পারে না। রাখাল মহারাজ বলছেন, 'চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।' নর্মদার দিকে তাঁর খুব টান ছিল। আমরা মঠে আসার পর থেকে শুনছি যে নর্মদা অতি পবিত্র স্থান, সাধনের স্থান। ঠাকুরের সন্তানেরা একথা প্রায়ই বলতেন। দীর্ঘকাল পরে সেই নর্মদা দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নর্মদার উৎপত্তিস্থান অমরকন্টকে আমাদের একটি আশ্রমও হয়েছে, যদিও বেলুড়ের সঙ্গে আইনত সংশ্লিষ্ট নয়, প্রাইভেট আশ্রম। পরিবেশটি খুব সুন্দর, চারদিকে পাহাড়, পাহাড়ের উপর আশ্রমটি। চারিদিকে তপস্যার ভাব সেখানে। তিনটি কুণ্ড থেকে নর্মদার জল বেরিয়ে এসে ঝির ঝির করে একটি খাদের মধ্যে পড়ছে। নদীতে ঘাট বাঁধিয়ে দিলে পুণ্য হয় তাই ভক্তেরা কেউ কেউ ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। জলের গভীরতা সেখানে খুব কম, কিছু পরে গিয়েই নদীর স্রোত বেড়ে গিয়েছে তখন তা জলপ্রপাতের আকারে নীচে পড়ছে। এই নর্মদাই সমুদ্রে পড়বার আগে বিশাল আকার ধারণ করেছে, গঙ্গার মতোই বড় নদী, কিন্তু উৎপত্তিস্থলে ওইরকম ঝিরঝির করে জল পড়ছে দেখা যায়। এই হল নর্মদার স্থান, তপস্যার ক্ষেত্র। এখন অবধি এই স্থানটি তপস্যার অনুকূলই আছে, আধুনিক সভ্যতা সেখানে উৎপাত করেনি। বসতি খুব কম, চারিদিকে গভীর জঙ্গল। আগে ঐসব অঞ্চলে প্রচুর বাঘ ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। সেই নির্জনে নর্মদার মন্দির তারই মাইল খানেকের মধ্যেই আমাদের আশ্রম। সাধুরা নর্মদায় তপস্যা করেন তা একটি স্থান নয়, ভিন্ন ভিন্ন। সাধুদের ভিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই সেজন্য যেসব জায়গায় ভিক্ষার অনুকূলতা আছে সেসব জায়গাতেই তাঁরা থাকেন। এখনও আমাদের মঠ থেকে যাঁরা সেখানে তপস্যা করতে যান, তাঁরা প্রধানত নর্মদার তীরবর্তী ওঙ্কারেশ্বরে গিয়ে থাকেন।

সেই জায়গার কথাই রাখাল মহারাজ বলছেন—'চল, নর্মদায় বেরিয়ে পড়ি।' নরেন্দ্র বলছেন, 'বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়?' এটি বেদান্তের কথা—জ্ঞান কারো হয় না, জ্ঞান ভিতরেই থাকে আবৃত হয়ে। তাকে সেই আবরণ থেকে মুক্ত করতে হবে। একজন বলছেন, 'তাহ'লে সংসার ত্যাগ করলে কেন?' নরেন্দ্র বলছেন, 'রামকে পেলাম না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো!' ভাব হচ্ছে, যখন বৈরাগ্য প্রবল, ভগবানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় তখন ভগবানকে পেলাম না বলে সংসারকে আশ্রয় করা সম্ভব হয় না। এগুলি উল্লেখ করা এইজন্য যে, অনেক সময় সাধন করতে করতে অনেকেরই মনে হয়, ভগবানকে তো ডাকছি কিন্তু কিছু তো হল না। এখন কিছু যদি না-ও হয় তাহলে কি জীবনটাকে অন্য খাতে চালাতে হবে? তা হয় না। এইটি মনকে বিশেষ করে বোঝাতে হবে। আর এও বলা যায়, কিছু যে হল না তা নয়, ভগবানের নাম করা তো হল। ভগবানের নাম করছ, তাঁর জন্য মন ব্যাকুল হচ্ছে এর চেয়ে বড় কথা আর কি হতে পারে? একটি কথা আছে, পাওয়ার চেয়ে চাওয়া বড়। তীব্র ব্যাকুলতাই ভগবানের আস্বাদন। ভগবানের জন্য মন যে ব্যাকুল হয়, ছট্‌ফট্‌ করে, তাঁকে ছাড়া জীবন বিস্বাদ মনে হয়, এই অবস্থাটি ভগবানকে আস্বাদন করার অনুকূল অবস্থা। বৃন্দাবনে গোপীদের এই অবস্থা হয়েছিল। সাধুদের মধ্যে যাঁরা খুব তীব্র বৈরাগ্যবান তাঁদের ভিতরেও এই অবস্থা দেখা যায়। তাঁরা ঐ ব্যাকুলতাকে ধরে রাখতে চান। শুনেছি বৃন্দাবনে খুব বৈরাগ্যবান সাধক যারা, তারা কীর্তনের সময় মাথুর শোনেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে তাঁর বিরহে গোপীদের নিদারুণ বিচ্ছেদ বেদনাকে অবলম্বন করে যেসব করুণ রসাত্মক পদ রচিত হয়েছে তাকে মাথুর বলে। ভক্ত বৈষ্ণবেরা মাথুরে কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবনের বেদনা বিশেষ করে ব্রজগোপীদের বেদনার কথা শোনেন। মিলনের গান তাঁরা

শোনেন না, উঠে চলে যান। অর্থাৎ তাঁরা ঐ বিরহ ব্যাকুলতাটিকে অন্তরে ধারণ করে রেখে দেন। তাই বলছেন, 'রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে থাকবো?' ভগবানকে পাওয়া যাবে না বলে কি জীবন অন্যধারায় প্রবাহিত করতে হবে? না, সেই ভগবদ্ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হবে?

আরও একটি কথা বললেন, কথাটি ছোট কিন্তু ভিতরে গভীর অর্থ আছে। একজন বলছেন, 'আমায় একটা ছুরি দেরে? আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।' কথাটা রহস্য করেই বলেছেন কিন্তু এটি তাঁর অন্তরের বেদনা। নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে বলছেন, 'ঐখানেই আছে হাত বাড়িয়ে নে।' অর্থাৎ এই 'আমি'-কে নিঃসংশয়িতরূপে দূর করা—এর জন্য বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। 'আমি' তো ভিতরেই আছে এবং দূর করবার উপায়ও ভিতরেই রয়েছে। 'আমি' দূর হলেই যন্ত্রণার অবসান। 'আমি' মানে অহঙ্কার, যা সব যন্ত্রণার মূলে। আমাদের মনকে একটু অন্যভাবে চালিত করলেই 'আমি'-র থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। তাই বলছেন, ছুরি বাইরে নয়, হাতের কাছেই আছে। অর্থাৎ 'আমি'-কে দূর করতে বাইরের কোন উপকরণের দরকার হয় না নিজেরই চেষ্টার দরকার। নরেন্দ্র বলছেন, 'এখানেও মায়া! তবে আর সন্ন্যাস কেন?' অর্থাৎ বাড়ীঘর ছেড়ে মায়ার রাজ্য কাটিয়ে যাঁরা মঠে এসে বাস করছে তাঁরা মায়ামুক্ত হয়ে সাধনা করবে এই তো কাম্য কিন্তু এখানেও ভক্তদের বা গুরুভাইদের মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। রাখাল বলছেন, তিনি একটি বইতে পড়েছেন যে সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকতে নেই তাতে 'সন্ন্যাসীনগর' হয়ে যায় অর্থাৎ তাঁদের তীব্র বৈরাগ্যে যেন ভাঁটা পড়ে যায়। কারণ এখানেও পরস্পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবতে হয়, কখনও বা 'আমি' কে বড় করা হয়। কিন্তু শশীর বক্তব্য হল, ভগবানকে যদি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে থাকি তো যেখানেই থাকি না কেন পরিবেশ

আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কোনো জায়গাই আর আমার সাধনপথের প্রতিকূলতা করতে পারে না।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের কথা

এরপর রামবাবুর কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা উঠল। নরেন্দ্র রাখালকে বললেন, রামবাবু মাস্টার মহাশয়কে 'একজন ট্রাষ্টি করেছেন।' মাস্টার-মশাই বলছেন, 'কই, আমি কিছু জানি না।' পরের কথা আমরাও জানি না। মনে হয় রামবাবুর ইচ্ছা ছিল কিন্তু করে উঠতে পারেননি। তবে এটুকু শোনা যায় যে রামবাবুর শরীর তাগের পর এই বাগানবাড়ী নিয়ে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে স্ত্রী-কন্যাদের বিরোধ বাধে। রামবাবুর কয়েকজন ত্যাগী সন্তান ছিলেন। আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস না হলেও রামবাবু তাঁদের সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। ত্যাগী বলে আশ্রমের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাঁরা এই জায়গায় ছিলেন। ঠাকুরের পূজাদি হোত। রামবাবুর পুত্র ছিল না, স্ত্রী ও মেয়েরা নাকি এই সম্পত্তি দাবী করেছিলেন। ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে স্ত্রী কন্যাদের এই বিবাদ কোর্ট পর্যন্ত উঠেছিল। মামলায় পরে ঠিক হয়, যেহেতু আশ্রমের ভাবে এটি গড়ে উঠেছে এবং রামবাবুরও এইরকম ইচ্ছা ছিল অতএব এতে কারও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।

এরপর ঠাকুরের আরতির বর্ণনা আছে। ঠাকুরের আরতিতে বর্তমানে যে গানটি গাওয়া হয়, তখন তা হোত না। আরতির স্তবও তখন রচিত হয়নি, কাশীতে শিবের আরতিতে যে গান গাওয়া হয় স্বামীজী তাই এখানে প্রবর্তন করেছিলেন। ঠাকুরের পূজাপদ্ধতি তখনও রচিত হয়নি। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ শশী মহারাজ সংস্কৃতে মন্ত্র রচনা করে ঠাকুরকে পূজা করতেন। স্বামীজী কর্তৃক ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রটি অনেক পরে রচিত হয়েছে।

তারপর দেখা যাচ্ছে মণির রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। তিনি উঠে চারিদিকে ঘুরছেন। ভাবছেন, 'সকলই রহিয়াছেন; সেই অযোধ্যা, কেবল রাম নেই।' সকলেই ঠাকুরের অদর্শনজনিত বেদনায় পীড়িত। আগে কাশীপুরের বাগানে ভক্তেরা এলে আনন্দের হাট বসত, এখন সকলের মনে দারুণ বেদনা।

যোগবাশিষ্ঠ প্রসঙ্গ

অন্য একদিন যোগবাশিষ্ঠ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে। অনেকে বলেন, যোগবাশিষ্ঠ এত জ্ঞানপ্রধান যে গৃহস্থদের পক্ষে অনুকূল নয় কিন্তু গৃহস্থরাই বেশী পড়েন। ত্যাগের আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করা, সমস্ত জগৎটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া সন্ন্যাসীদের পক্ষেও কঠিন। এই আদর্শ জীবনে কাজে লাগান কয়জনের পক্ষেই বা সম্ভব? আসলে জগৎ মিথ্যা বলব আর ব্যবহারে তার বিপরীত আচরণ করব, এ কপটতার দ্বারা সাধন পথে অগ্রগতি সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে পঞ্চবটীর সেই বেদান্তবাদী সাধুর কথা স্মরণ হয়, যাঁর চরিত্র সম্বন্ধে লোকের মনে কিছু সংশয় উঠেছিল। সে সম্বন্ধে সাধুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এ জগৎটাই যখন মিথ্যা তখন আমার সম্বন্ধে যা শোনেন তাও মিথ্যা। ঠাকুর তাতে খুব বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন অর্থাৎ এটি বেদান্তের অপব্যবহার। বেদান্তে জগৎটাকে মিথ্যা বলে, তার মানে এই নয় যে, আমরা যথেচ্ছাচার করব সেগুলিও মিথ্যা বলে আমাকে স্পর্শ করবে না। এই জগৎটা মিথ্যা হলেও সেটা পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। কিন্তু যখন ব্যবহার করছি তখন এটিকে অন্ততঃ সাময়িকভাবে সত্য বলে ধারণা করে তার থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবেই তো এই জগতের মিথ্যাত্ব প্রতীত হবে। জগৎটাকে যখন আমরা ব্যবহার করছি তখন তো মিথ্যা

বলে বোধ হয় না। সত্য বলেই বোধ হয়। সুতরাং সত্য বলে অনুভব করার ফলে যে বন্ধনের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই বন্ধনকে অতিক্রম করবার জন্য সাধনাকে অবলম্বন করতে হবে। মাণ্ডূক্য কারিকাতে বলা হয়েছে—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।

ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ (মা. কা. ২।৩২)

অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য হচ্ছে এই যে, বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য মনের নিরোধ অর্থাৎ মনকে নিরুদ্ধ করবার যে চেষ্টা, বাসনাকে মুক্ত করে, ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে মুক্ত করবার যে চেষ্টা, সে মিথ্যা। 'ন চ উৎপত্তি' অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তিও মিথ্যা। যে জ্ঞান নিত্য তার আবার উৎপত্তি কি করে হবে? সুতরাং উৎপত্তিও মিথ্যা, বন্ধনও মিথ্যা। কারণ সত্যসত্যই তো আত্মার কখনও বন্ধন হয় না এবং বন্ধন যখন মিথ্যা তখন সাধনাও মিথ্যা। কিসের জন্য সাধনা? 'ন মুমুক্ষু'—মুক্তিকামী বলে যে কেউ আছে তাও নয়। মুক্তিকামী হওয়াটাও স্বপ্নের কথা। আর মুক্তি, তাও মিথ্যা কারণ বন্ধন যদি সত্য হয় তবে তো মুক্তি সত্য হবে। তাহলে বন্ধন, সাধনা, মুমুক্ষুত্ব, মুক্তি, এগুলি সবই মিথ্যা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—রাজার ছেলের বাঘের স্বপ্ন দেখে ভয়ে ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু ঘুম ভেঙে যাবার পর দেখল বনজঙ্গল বাঘ কিছুই নেই। সে রাজপ্রসাদে মায়ের কোলে শুয়ে আছে। এই জেনে সে হেসে ফেলল অর্থাৎ তার মুক্তি হল। ঠিক সেইরকম এই সংসারেও কতরকম বিভীষিকা আমাদের আক্রমণ করছে, অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় পাচ্ছি না, বেরোবারও কোনো পথ পাচ্ছি না। ভয়ে সন্ত্রস্ত হচ্ছি। সমস্তটাই যেন একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন। এই দুঃস্বপ্ন যখন ভেঙে যাবে তখন আমরা জানব বন, জঙ্গল, বাঘ নেই, বাঘের তাড়াও নেই। সবগুলি তখন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। এইটিই হচ্ছে পারমার্থিক সত্য। কিন্তু পারমার্থিক সত্য মনে করে যদি নিষ্ক্রিয়

হয়ে বসে থাকি তাহলে সেই পারমার্থিক সত্য কি প্রকৃতই আমাদের ভয় থেকে মুক্ত করবে? কারণ আমাদের সংস্কার তার বিপরীত দিকে রয়েছে। আমরা মনে করি জগৎটা ভয়ঙ্কর জঙ্গল, ভয়ানক বিভীষিকা চারিদিকে। ঘোর বন্ধনের মধ্যে পড়ে আমরা ছটফট করছি। এই বন্ধন থেকে মুক্তির চেষ্টা হল সাধন। সাধনা করে যখন জঙ্গলের বাইরে যেতে পারব অর্থাৎ সংসারকে অসৎ বুঝতে পারব তখন বাস্তবিকই এই জগতের কোন অর্থ থাকবে না, জগতের ভয়েরও কোন অর্থ থাকবে না। ভয় থেকে মুক্তিরও কোনো অর্থ থাকবে না। কিন্তু যতক্ষণ ভয় আছে, যতক্ষণ আমরা এই বিভীষিকা দেখছি ততক্ষণ এর থেকে নিষ্কৃতির জন্য আমাদের চেষ্টা করতেই হবে, যদিও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই চেষ্টারও কোন সার্থকতা নেই। এটা বেদান্তের কথা, কিন্তু মুখে বেদান্তের কথা বললেই তো হবে না, সাধনার দ্বারা সেই সত্যকে উপলব্ধি করলে তা সার্থক হয়ে উঠবে। যোগবাশিষ্ঠতে যে ভাবে তত্ত্বটিকে বোঝান হয়েছে তা হল এই যে, পরমার্থ একাধারে দেশ কাল প্রভৃতি—এই সব কিছুরই অতীত। দেশকালের গণ্ডীর ভিতরে থেকে জগৎটাকে এখন একরকম করে বোধ করছি, পরক্ষণে আবার অন্য পরিবেশে অন্যরকম বোধ করছি। আসলে এগুলি সব স্বপ্ন পরম্পরা, সব মিথ্যা। সাধনার দ্বারা এই স্বপ্ন পরম্পরাকে ভাঙতে হবে। তবেই স্বপ্ন যে মিথ্যা এই বোধ হবে এবং তার থেকে যে ভয় সে ভয় থেকে আমরা মুক্ত হব। শাস্ত্রে বার বার এই প্রশ্ন উঠেছে, যখন জগৎই নেই তখন জগৎকে দূর করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে কেন? তার উত্তর হচ্ছে—জগৎ নেই হতে পারে কিন্তু জগৎ ভ্রম তো আছে। এই ভ্রমটা আমাদের অনুভূত বিষয় সুতরাং এটিকে মন থেকে সরাতে হবে। এইজন্য সাধনের প্রয়োজন। সাধন ছাড়া এই ভ্রম দূর হয় না। এইজন্য আচার্য শঙ্কর ব্যবহারিক সত্যকে স্বীকার করেছেন। ব্যবহারিক ভূমিতে যতদিন আমরা অবস্থিত থাকব ততদিন এই

সংসার আমাদের ব্যাকুল করে তুলবে। সাধনার দ্বারা ব্যবহারিক ভূমিকে অতিক্রম করে পারমার্থিক ভূমিতে পৌঁছাতে হবে। সেই স্তরের কথায় আছে—

> ন নিরোধো চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
> ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥
>
> মাণ্ডূক্যকারিকা ২.৩২

ঠাকুর যেমন বলতেন, আমি সোঽহং সোঽহং বললাম আর যেমনকার তেমনই ব্যবহার করতে লাগলাম তাহলে তো কোন লাভই হল না। আসলে মুক্তির চেষ্টা তখনই আসবে যখন বিভীষিকাময় জগৎটা আমাকে গ্রাস করতে আসছে এই ভয়ের অনুভূতি হবে। তাই বন্ধনের অনুভব হতে হবে, তারজন্য তীব্র বেদনা বোধ করতে হবে, তবেই বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা হবে। অতএব শাস্ত্রকে অনুসরণ করে সাধককে এই মুক্তির ইচ্ছাকে ধরে এগিয়ে যেতে হবে এবং মুক্তির আস্বাদন করতে হবে। তখনই সাধক বুঝতে পারবে যে এই সমস্তটাই এক বিরাট স্বপ্ন, যেমন রাজার ছেলে ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারল যে অরণ্য, বাঘ, বাঘের তাড়া এ সবই স্বপ্ন।

এই যোগবাশিষ্ঠের প্রসঙ্গে মঠে একবার কথা হচ্ছিল যে, যা সন্ন্যাসীর ধর্ম তা গৃহস্থরা আলোচনা করেন আর যা গৃহস্থের অলোচনার বিষয় যেমন গীতা তা সন্ন্যাসীরা পড়েন। গীতায় অর্জুনকে ভগবান বার বার বলছেন, যুদ্ধ কর। একটা ভাব আশ্রয় করতে বলছেন কিন্তু কাজ থেকে বিরত হতে বলেননি। নিজের নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করার যে নির্দেশ, সে তো গৃহস্থের প্রতি নির্দেশ। সন্ন্যাসীরা সেই নির্দেশ আলোচনা করেন অবশ্য সন্ন্যাসীরা এর ভিতর থেকে কিছু উপদেশ যে

পান না তা নয়। তাহলেও কাজে প্রবৃত্ত করবার প্ররোচিত করবার জন্যই গীতা। যার জন্য অর্জুন বলছেন,

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (১৮।৭৩)

ঠাকুর বলছেন, গীতার তাৎপর্য হল ত্যাগ, কর্মফল ত্যাগই গীতার শেষ কথা, কিন্তু সন্ন্যাসীর আদর্শ হচ্ছে যে ত্যাগ তা অন্তরে বাইরে ত্যাগ—যা গীতায় বলা হচ্ছে। আর যোগবাশিষ্ঠে জগৎকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে যা গৃহস্থদের পক্ষে অনুসরণ করা একেবারে অসম্ভব।

ভক্ত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুরের স্থূল দেহের অবসানের পর ভক্তেরা বরানগর মঠে কিভাবে কালাতিপাত করতেন তারই কয়েকটি চিত্র মাস্টারমশাই এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভক্তদের মধ্যে কেবল ঠাকুরকে নিয়ে বা ধর্ম-প্রসঙ্গেই কথা হত। অন্য কথা বা সাংসারিক বিষয়ের কথা ছিল না বললেই চলে। এখানে দেখা যাচ্ছে বরানগর মঠ থেকে সকলে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য তখন কলের জল হয়নি, কাজেই গঙ্গাস্নান ছাড়া স্নানের কোন উপায়ও ছিল না। তাই সকলে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। মাস্টারমশাই ছাতা নিয়ে যাচ্ছেন দেখে নরেন্দ্র একটু কটাক্ষ করলেন। স্নানের পরে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে নরেন্দ্র দেখলেন ফুল নেই কাজেই সচন্দন বেলপাতা, ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে প্রণাম করে দানাদের ঘরে গিয়ে বসলেন। স্বামী-শিষ্য সংবাদে উল্লিখিত আছে বেলুড় মঠে স্বামীজী পূজা করতে বসে পুষ্পপাত্রে যত ফুল বেলপাতা ছিল সব একসঙ্গে নিয়ে দুহাতে করে ঠাকুরকে নিবেদন করে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন। পূজায় না আছে মন্ত্র-

তন্ত্রের আড়ম্বর, না আছে কোন বিধি-নিষেধের বালাই। ধ্যানসিদ্ধ সাধু তিনি, একসঙ্গে সব নিবেদন করে দিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। এই স্বামীজীর পূজার ধারা ছিল।

তার পরে মাস্টারমশায় বরানগর মঠটির বর্ণনা খুব বিস্তারিত ভাবে দিলেন। কোথায় কে থাকত, কোন ঘরে কি হোত, কোন কাজে কোন ঘর লাগত ইত্যাদি। বরানগর মঠ যাঁরা দেখেননি তাঁরা মনে মনে যেন এই চিত্রটি কল্পনা করতে পারেন এমন করে বলা হয়েছে।

তারপরে ধর্মপ্রচারের কথা উঠল। মাস্টার নরেন্দ্রকে বলছেন, 'বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।' নরেন্দ্র বলছেন, বেত খাবার ভয়ে কেন? তাতে মাস্টার বলছেন, ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু না জেনে অপরকে তাঁর সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গেলেই বেত খেতে হবে। অর্থাৎ যা আমি নিজে জানি না, তা অপরকে বলবো কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী যে কথাটি বললেন, তা মনে রাখবার মতো। যে ঈশ্বরকে জানে না সংসারের আর পাঁচটা ব্যাপারে সে জানল কেমন করে? এককে জানার নামই জ্ঞান, আর তা না জানাই হল অজ্ঞান। যে ভগবানকে জানে না সে সংসারের জিনিসও কিছু জানে না। কারণ সংসারে যে বিভিন্ন ব্যবহার আমরা করি সেগুলি ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, সেগুলিতে দোষ হচ্ছে কি না এ কি করে বুঝব? বিদ্যাসাগর যদি বলেন, তিনি কিছুই জানেন না তাহলে তাঁর ব্যবহারের দ্বারা তা যেন প্রতিপন্ন হচ্ছে না। তিনি ভালকাজ কাকে বলে জানেন, দয়া মায়া পরোপকার জানেন, ইস্কুল করা, অপরকে সাহায্য করা এগুলি জানেন অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানেন বলেই এগুলি জানেন। স্বামীজীর বক্তব্য হচ্ছে যে একটা ঠিক বোঝে সে সব বোঝে। কোনোটাই যদি না জানা থাকে তাহলে তার ব্যবহার হয় না। আমরা যতটা পারি বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবহার করি। কাজেই যখন আমরা ব্যবহার

করছি তখন আমরা কিছু বুঝি না অথচ ব্যবহার করছি এ কথা বলা চলে না। সংসারের বিষয় বুঝি আর ভগবানের বিষয় বুঝি না তাহলে সংসারের বিষয় কি ভাল করে বোঝা হয়েছে? তাও হয়নি। সুতরাং ভাব হচ্ছে এই যে, ঈশ্বরের বিষয় আমি কিছু জানি না এই যে কথাটি এর ভিতরে দীনতা থাকা ভাল, অভিমান থাকা ভাল নয়। অর্থাৎ আমি প্রকাশ করছি জানি না বলে, কিন্তু অপরে প্রকাশ করে না যে তারাও জানে না। কাজেই বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানেন না, এই কথার ভিতরে যেন তাঁর একটু অপরের প্রতি তিরস্কারের ভাব আছে। যে বেত খেতে হবে বলে আমি ভগবানের কথা বলি না অপরে যেন সেই বেত খাবারই যোগ্য, এ কথা মনে হচ্ছে। স্বামীজী বলতে চাচ্ছেন, ঈশ্বরকে না জানা এটা খুব অহংকার করবার মতো কথা নয়। ঈশ্বরকে জানি না এর জন্য মনের ভিতরে যদি ব্যাকুলতা থাকে, জানবার আগ্রহ থাকে তাহলে ঈশ্বরকে জানি না, এ কথাটি আর বড় করে বলার প্রয়োজন হয় না। জানি না যে এর জন্য বেদনা বোধ হওয়া উচিত। শুধু বিদ্যাসাগরের নয় এ সকলেরই কথা। 'ভগবানকে জানি না'—এই কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলাম বা তাঁর সম্বন্ধে কোনো আলাপ আলোচনা করলাম না, কিন্তু ভগবানকে জানি না বলে মনের ভিতরে একটা আত্মগ্লানি, বেদনা, জানবার আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে তাহলে ঐ জানি না বলার ভিতরে কোন জোর থাকে না। ও যেন অভিমানের কথা যে আমিও জানি না, তোমরাও জান না। সুতরাং তোমরা যে জানি বলে মনে কর, এটা তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীজী বলছেন, যে একটা বোঝে সে অপরটাও বোঝে। যে ভগবানকে বোঝে সেই সংসারে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বুঝতে পারে। কষ্টিপাথর হচ্ছে এই ভগবদ্‌জ্ঞান যা ঠাকুর মাস্টারমশাইকে একদিন বলেছিলেন—যখন মাস্টারমশাই বললেন যে

তাঁর পত্নী অজ্ঞান, তখন ঠাকুর বললেন, আর তুমি জ্ঞানী? অর্থাৎ তুমিও অজ্ঞান এ কথাটা বোঝ না। যদি ভগবানকে জানাই জ্ঞান হয় তাহলে তাঁর পত্নী যেমন অজ্ঞান, মাস্টারমশাই নিজেও তেমনি অজ্ঞান। তখন মাস্টারমশাই কথাটি বুঝলেন। এখানে তারই উল্লেখ করে স্বামীজী বলছেন। ভাবটা হচ্ছে এই আমরা ভগবানকে জানি না সত্যি কিন্তু জানবার জন্য আমাদের অন্তরে ব্যাকুলতা আছে কি? যদি তা না থাকে তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্য। ভগবান এমন একটি বস্তু যা আমাদের একান্ত জানবার মতো অর্থাৎ যে জ্ঞানের উপরে আমাদের শুভ অশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে। সেই জ্ঞান আমাদের নেই অথচ আমরা সংসারে বিজ্ঞের মতো ব্যবহার করি। এটি আমাদের অজ্ঞানের পরিচায়ক। আমরা যদি বুঝি যে ভগবানকে না জানা পর্যন্ত কিছুই জানা হয়নি তাহলে যথার্থই আমাদের দৈন্য প্রকাশ পাবে। তা না করে বিদ্যাসাগর বলছেন যে ভগবানের বিষয়ে বলি না কারণ ও বিষয়ে জানি না। স্বামীজী ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, বিদ্যাসাগর মশাই যে সমস্ত সৎকাজ করছেন এগুলি যে সৎকাজ তা তিনি জানলেন কেমন করে? 'এখানে কথার ভিতরে বিশেষ একটি রহস্য আছে। সৎকাজ কাকে বলা হয়? যা মানুষকে ঈশ্বরের অভিমুখী করে, আর তা যা না করে তাই হল অসৎ কাজ, মিথ্যা কাজ। সেগুলি আমাদের অজ্ঞানকে বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সংসারের যে কোন বিষয়ে আমরা যখন নিজেদের বিজ্ঞ বলে পরিচয় দিতে যাই, তখন প্রথমে বিচার করতে হবে সংসারের ভালমন্দ কি আমরা জানি? সংসারের ভালমন্দ জানতে হলে ভগবানকে জানতে হবে। জেনে তাঁকে পাবার, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্য যা অনুকূল সেইটিই ভাল কাজ আর তার প্রতিকূল যা সেগুলিই মন্দ কাজ, এই ভাবে ভালমন্দ বোঝার কষ্টিপাথর পাওয়া যাবে। তা না পাওয়া পর্যন্ত কোনটি

ভাল কোনটি মন্দ, কোনটি শুভ কোনটি অশুভ আমাদের স্থির করা সম্ভব নয়।

আমরা অনেক সময় বলি, সংসারে সৎকাজ করবে। তখনই মনে প্রশ্ন আসে সৎকাজ কোনটি? ধরা যাক—পরোপকার করা সৎকাজ। কেউ যদি আবার প্রশ্ন করে পরোপকার করা সৎকাজ কেন? তাকে বোঝান কি সহজ হবে? সহজ হবে না। কিজন্য পরোপকার দয়া সৎকাজ, কিজন্য সত্যকথা বলা সৎকাজ—এই সৎ অসৎ বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে এর কষ্টি পাথর কি? কি দিয়ে আমরা স্থির করব কোনটি সৎ কোনটি অসৎ? ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তিনি তাই পরিষ্কার করে বলছেন, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সমস্ত অজ্ঞান। সুতরাং তাঁকে জানার পথে যা সাহায্য করবে তাই হল সৎকাজ আর যা তা না করবে তা অসৎ কাজ, বৃথা সেগুলি। এই হল ভালমন্দের কষ্টি পাথর।

তারপরে যোগবাশিষ্ঠের কথা উঠল। মাস্টারমশাই যোগবাশিষ্ঠ আগে পড়েছিলেন। যোগবাশিষ্ঠে একেবারে ছাঁকা জ্ঞানের কথা, অদ্বৈত বেদান্তের কথা। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ মিথ্যা, দেশ কাল সব মিথ্যা। কাহিনী বর্ণনার ভিতর দিয়ে এটি যোগবাশিষ্ঠে বলা আছে। মানুষ যেন একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্নের ভিতরে আবার কত স্বপ্ন, এইরকম করে মায়িক রাজ্যের যে অসঙ্গতি তা পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। একটি কথা এই প্রসঙ্গে মঠে প্রচলিত আছে যে যোগবাশিষ্ঠ হল একেবারে শুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তের কথা, যা কেবল সন্ন্যাসীরাই চর্চা করতে পারেন এবং তাঁরাই চর্চা করবার যোগ্য। কারণ সর্বত্যাগ ছাড়া এই বেদান্তের তত্ত্ব ধারণা হওয়া কঠিন। ধারণা হওয়া মানে ভাষণ দেবার জন্য যতটুকু ধারণা সেরকম নয়। ধারণা মানে তাঁকে সত্য বলে বোধ হওয়া, তার সিদ্ধান্তগুলিকে নিঃসংশয়িত রূপে গ্রহণ করা এবং সেইভাবে জীবনকে চালান

যা একমাত্র সন্ন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব। যাঁরা সর্বত্যাগী, যাঁদের সংসারের কোন বাঁধন নেই, সংসারের হিসেব-নিকেশ করে যাঁদের চলতে হয়না; তাঁরাই যোগবাশিষ্ঠের তত্ত্ব ধারণা করার যোগ্য। সংসারী বলতে কেবল বিবাহিতদের কথা বলা হচ্ছে না, সন্ন্যাসীরাও যখন সংসারের কাজ করেন তাঁরাও এক হিসাবে সেই সংসারের কাজের ভিতর দিয়েই চলেন। তাঁদেরও দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন করতে হয়, তার জন্য সাধনা করে মনকে তৈরী করতে হয়। যখন সমস্ত ত্যাগ হয়ে যাবে জগৎ মিথ্যা হয়ে যাবে, জগতের সব সম্বন্ধ মায়িক বলে গ্রহণ করা হবে এবং সেই অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করা হবে, কোন সংশয় বিপর্যয় থাকবে না, তখনই ঠিক ঠিক যোগবাশিষ্ঠের তত্ত্ব ধারণা করার উপযুক্ত হওয়া যায়। যাঁরা যোগবাশিষ্ঠের—যাকে কাঠ অদ্বৈত বলা হয়, uncompromising, কোনরকম আপোস নেই যেখানে—চর্চা করেন, সেরকম ভাবে অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে সংসারের কাজ করা সম্ভব নয়। অথচ সংসারীদের ভিতরে যোগবাশিষ্ঠের খুব প্রচলন আছে। মনে হয় সেইজন্য একটু কটাক্ষ করে বলা হয় যে, যারা যে বিষয়ের অধিকারী নয়, জীবনকে সেভাবে চালাতে পারে না তাদের সেই জিনিসের আলোচনা কেবল আলোচনাতেই পর্যবসিত হয়, জীবনে প্রয়োগ করা যাবে না।

তারপরের প্রসঙ্গে আছে, নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনতে বললেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করছিলেন। নরেন্দ্র তাকে একটু রহস্য করে বলছেন, 'আগে ঠাকুর ও সাধু সেবা করে preparation কর। তারপর ধ্যান।' এমন সময় প্রসন্ন এলেন। তিনি তীব্র বৈরাগ্য বশত চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে বৈরাগ্যের তেজ বেশীদিন টিঁকল না পথশ্রান্ত হয়ে ফিরে এলেন। এইরকম অভিজ্ঞতা অনেকেরই জীবনে হয়েছে। মনে হয় বৈরাগ্য খুব সহজ, তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাব, কিন্তু

তারপর দেখা যায় শরীর সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া ঠাকুরের সন্তানদের অপরের কাছে ভিক্ষা করবার অভ্যাস নেই। কাজেই ভিক্ষা করে যে অর্থ বা অন্ন, বস্ত্র জোটাবেন সে সামর্থ্যও নেই। কাজেই কষ্ট আরও বেশী। ভিক্ষা করলে অনেক সময় লোকে ভুল বোঝে, সহযোগিতা পাওয়া যায় না। যদি দৈবাৎ কেউ সহযোগিতা করেও অন্য দশজন তার বিপরীত আচরণ করে। কেউ এই ত্যাগের জীবনের কথা বুঝতে পারে না। না পারার কারণ হচ্ছে তখন ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের বাহ্য চিহ্ন কিছু ছিল না। প্রসন্ন সাধারণ পোষাকে বেরিয়েছিলেন তাই তাঁকে সন্ন্যাসী বলে সমাদর বা সহযোগিতা করা উচিত বলে কারও মনে হয়নি। কাজেই প্রসন্ন পারলেন না, ফিরে এলেন। আসল কথা বাংলাদেশে তখন সন্ন্যাসীর সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল না। সন্ন্যাসী বলতে গঙ্গাসাগরের সময় যে সমস্ত জটাধারী বা চিমটেধারী সাধু দেখা যেত তাদেরই লোকে জানত। সাধুরা যে আবার কাপড় পরে, তাদের যে আবার খেতে হয় তা তাদের মনে হোত না। বাঙালীরা সন্ন্যাসী বলতে বৈষ্ণব বৈরাগী এদেরও বুঝত, কিন্তু এঁরা সন্ন্যাসী নন গৃহস্থ। তবে তাঁরাও ভিক্ষাবৃত্তি করে থাকতেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তা আবার লেখাপড়া জানা, সমর্থ শরীর অথচ ভিক্ষা করতে যায় এ তাঁরা কল্পনা করতে পারতেন না, সেইজন্য এইরকম অসুবিধা ঠাকুরের অনেক সন্তানকে ভোগ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য এখন আর সে দিন নেই। এখন বাংলাদেশে ঠাকুরের নাম সর্বত্র প্রচারিত। পরিচয় না দিলেও সন্ন্যাস জীবনের প্রতি সাধারণের একটা শ্রদ্ধার ভাব জন্মেছে যদিও আমরা তার বিপরীত কথা অনেকের মুখে শুনি এবং শুনে বেশ মুখরোচক ভাবে সেগুলির আলোচনাও করি। তাহলেও সাধারণ লোকের সন্ন্যাসীদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে। দু-চার জন হয়তো ব্যতিক্রম কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। তার একমাত্র

কারণ ঠাকুরের আদর্শের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকের হয়েছে। এই ধরণের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনেও হয়েছে, আর এখনও আমাদের সাধু ব্রহ্মচারী যাঁরা তপস্যা করতে বেরিয়ে যান তাঁদের অনেকের অভিজ্ঞতার কথাও শুনি। একজায়গায় দুটি পয়সা ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম গঙ্গা পার হবার জন্য। এক পয়সা করে তখন পারাণী দিতে হোত। একজন পরামর্শ দিলেন, হাওড়া ব্রীজ দিয়ে হেঁটে চলে যাও না বাবা। তা এই ভাবও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু আবার যত্ন করেছেন শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন এমন লোকও অজস্র আছে।

সন্ন্যাসাশ্রম ও সংসারাশ্রম—কোন্‌টি শ্রেয় ?

শশীর বাবা এসেছেন ছেলেকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। অধিকাংশ বাপমায়েরই মতো শশীর পিতাও বলছেন, বাড়ীতে থেকে ধর্মকর্ম করুক না। তাতে কেউ দোষ দিচ্ছে না। অবশ্য কতক্ষণ করতে দেবেন তার ঠিক নেই। তারপরেই বলবেন যে একটা গাছতলা করে দিতে হবে। তারপরে বলবেন, বিয়ে থা করলি এখন সংসার প্রতিপালনের ভার কে নেবে? এইরকম একটু একটু করে পরপর চলতে থাকবে। যোগীন মহারাজ তাঁর মায়ের কান্না সহ্য না করতে পেরে বিয়ে করলেন। তারপরে সেই মা বললেন, সংসার করেছিস তার প্রতিপালন করতে হবে না? তিনি যখন বললেন, আমি নিজের ইচ্ছায় করিনি, তুমি জোর করে করিয়েছ। মা বললেন, নিজের ইচ্ছা না থাকলে, জোর করলে কি কেউ বিয়ে করে? যোগীন মহারাজ বিস্মিত হলেন। সংসার এইরকম আশ্চর্যই বটে। সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণাই স্বাভাবিক যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে ধর্মকর্ম করা যায়।

ঠাকুরের উপদেশও আছে যে, তাঁকে একহাতে ধরে আর একহাতে

সংসার কর। কাজেই সংসারে দোষ কি ? আসল কথা মানুষ স্নেহে অন্ধ হয়ে একবার বলে, সংসারে আছি দেখ না, কি ভোগ ভুগছি। আবার বলে, সংসারে না থাকলে কি হয় ? বাপ-মা আছেন, আত্মীয় পরিজন আছে, তাঁদের প্রতি কর্তব্য আছে। দুই রকম কথা। অবশ্য এই কর্তব্যের চিন্তা যে বৈরাগ্যবানদের মনে না আসে তা নয়। শশী মহারাজ তো এখানে স্পষ্টই বলছেন, বাপ-মা আশা করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কত কষ্ট করেছেন। সংসার না করলে তাঁদের আশা সফল হবে না। কিন্তু সংসার আমি করতে পারছি না। কেন পারছি না ? না, মনের ভিতরে এমন বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত হয়ে রয়েছে যে সংসার করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এটা যে ইচ্ছে করে নিজের দায়িত্বকে পরিত্যাগ করা তা নয়, পলায়নপর বৃত্তিও নয়, এ হচ্ছে ত্যাগের পথে যাবার জন্য মনের একটা তীব্র প্রবণতা। যাঁরা বোঝাচ্ছেন, সংসারের পথে চলা ভাল। তাঁদের সন্ন্যাসপ্রবণ মনের সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। কিন্তু যারা এই জীবনের স্বাদ পেয়েছেন বা এই জীবনের জন্য যাদের মন ব্যাকুল হয়েছে, তাঁদের পক্ষে সংসারের ভিতরে থাকা সম্ভব নয়, কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এইজন্য তাঁদের সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করা ছাড়া পথ নেই। এটি যে খুব হিসাব নিকাশ করে বিচার করে করা তা নয়। বিচার করতে গেলে ঠাকুরের কথা দুরকমেরই আছে, এখানেও হয়, ওখানেও হয়। ঠাকুর বলেছেন, এও কর ও-ও কর। যুক্তি দিয়ে দেখাতে গেলে ঠাকুরের যুক্তি উভয়দিকেই আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে সমস্ত কর্তব্য থাকা সত্ত্বেও যখন মন তীব্রভাবে বৈরাগ্যপ্রবণ হয় তখন সে কর্তব্য তাকে আর আকর্ষণ করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখি, ভাগবতে আছে—গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে গভীর রাত্রিতে অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে বললেন, তার উত্তরে

গোপীরা বলছেন যে, যে মন দিয়ে আমরা সংসারের কর্তব্য করব, সে মনের উপরে আমাদের কোন অধিকার এখন নেই। আমাদের মনপ্রাণ সব শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সমর্পিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সংসার করবার আর উপায় নেই। অবশ্য সংসার যারাই ত্যাগ করে তারা সকলেই যে এইরকম ভগবদনুরাগে ভরপুর হয়ে করে তা নয়। হয়তো বিচার করেও কিছু দেখে। প্রত্যেকের তবে ভিতর একটা প্রবণতা থাকে। সেই প্রবণতাই তাঁকে একপথে বা অন্যপথে প্রেরণ করে। এছাড়া যুক্তি বিচার করে মানুষ তার পথ নির্ণয় করতে পারে না। মানুষের যুক্তি যেন মনের উপরের একটা স্তরের কথা। মনের আরও গভীরে যে স্তর আছে তাতে আছে তার পুঞ্জীভূত প্রবণতা, যা তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার থেকে উদ্ভুত। কাজেই সেই প্রবণতাকে ছাড়িয়ে যুক্তি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এইজন্য হাজার যুক্তি দিলেও মানুষ তার নিজের পথ ছেড়ে অন্য পথকে অবলম্বন করতে পারে না।

শশী মহারাজের মন খুব কোমল। মায়ের জন্য তাঁর দুঃখ হচ্ছে কিন্তু বলছেন, তবু সংসারে ফিরে গিয়ে তাঁদের সেবা করবার সামর্থ্য আমার নেই। সামর্থ্য নেই, কারণ মন আর সেই পথে যেতে পারছে না। এ যে ইচ্ছা করে বেছে নেওয়া পথ তা নয়, মনের নিজস্ব প্রবণতা তাঁকে প্রেরিত করছে ঐ পথে যার ফলে সেই প্রবণতাকে কাটিয়ে তাঁকে অন্যপথে চলার সামর্থ্য কেউ দিতে পারবে না। এই হল সন্ন্যাস জীবনের বৈশিষ্ট্য। শশী মহারাজের বাবা যে কথাগুলি বলছিলেন তা একেবারে ব্যবহারিক কথা। বলছেন, 'আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ানো। আমি ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে চমৎকার লোক। সেই সাধুকে দেখুক না।'

আমার কাছে এক পিতা অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর বৈরাগ্যবান ছেলেকে বোঝাবার জন্য যে সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা সংসারাশ্রম শ্রেষ্ঠ

এবং বলাবাহুল্য আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব হয়নি। তিনি শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ছেলেকে বশে আনতে না পেরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাশীতে এক সাধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, ঐ সাধু তাকে বুঝিয়ে সংসারে নিযুক্ত করবেন, বুঝিয়ে দেবেন যে সংসার ভাল। আমাকে দিয়ে হল না বলে অন্য এক সাধুর কাছে পাঠালেন। ছেলেটি তারপরে আমাদের থেকে দূরেই সরে গেল, তার কিছু কিছু খবর পেতাম। ছেলেটি স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষিত। তিনি আমাকে বললেন, ছেলেটি কাশীতে আছে, একটু খোঁজ-খবর রেখো। তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি কাশীতে লিখে তার একটু খোঁজ-খবর করতে বলে দিলাম। কাশী থেকে ওখানকার মঠের কোন সাধু সেই ছেলেটির সন্ধান করতে গিয়েছিল। তার বাবা সেই খবর পেয়ে আমাকে লিখেছেন, এইরকম করে আমার ছেলের পিছনে পিছনে এখনও সন্ন্যাসীরা ধাওয়া করছেন। এ আপনাদের অন্যায়, বারণ করুন। আমি বললাম ঠিক আছে, আমাদের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তা আমি বলে দেব আর যেন কেউ না যায়। আর কেউ যায়নি। ছেলেটির পিতা ছেলেকে শুধু নিজের করে রাখতে চেয়েছিলেন। তার জীবনের পরিণাম কি হবে সে কথা বিচার করে দেখেননি। পরিণাম খুবই খারাপ হয়েছে। সে না সংসারী না সন্ন্যাসী। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবার মতো হয়েছে। তবে একবার যে ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হয়েছে—জাত সাপের কামড়—নষ্ট হবে না সেটা, কিন্তু অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হয়ে যায়। এইরকম সংসারে দোটানার মধ্যে অনেকে কষ্ট পায়। দোটানার মধ্যে কষ্ট পাওয়া বলতে ভিতরে সংসারের দিকে প্রবণতা নেই, সন্ন্যাসের দিকে প্রবণতা রয়েছে, জোর করে সংসারের পথে নিয়ে গেলে তার কষ্ট। আবার তার বিপরীত ক্রমে যার সংসারের দিকে প্রবণতা আছে ঝোঁকের বশে সাধু হয়ে গেলে তারও কষ্ট।

এইজন্য নিজেকে খুব বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে পথ নির্বাচন করা দরকার। প্রবণতা কোনখানে তা মানুষ এমনি সহজে ধরতে পারে না। যাঁরা এইরকম ত্যাগের জীবনের আস্বাদ পেয়েছেন অথচ সংসারী হয়েছেন তাঁদের অনেকের জীবনের সঙ্গে পরিচয় আছে আমাদের। দেখেছি সংসারে থেকে তাদের জীবন যেন দুর্বিষহ হয়েছে। অবশ্য যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছেন তাঁদের বোঝার ব্যবস্থা নেই, কারণ সংসার ত্যাগ এসে তাঁদের ভিতর সংসারের দিকে টান থাকলেও তাঁরা বোধহয় তা প্রকাশ করেন না, ফলে তাঁদের অন্তরের সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কখনও কখনও দেখা যায় তাঁদেরও সংসার জীবনের আকর্ষণে সেদিকে চলে যেতে হয়েছে। সেইজন্য একটা আদর্শকে স্থির করে নিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে।

ভগবানের দিকে যাবার জন্য কোন পথই সকলের পক্ষে অনুকূল বা সকলের পক্ষে প্রতিকূল হতে পারে না। অধিকারী হিসাবে নিজের সঙ্গে পরিচয় করে, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার প্রবণতা এগুলি দেখে মানুষকে পথ স্থির করতে হয়। সুতরাং যদি কেউ ত্যাগময় জীবনই পছন্দ করে তাকে সে পথেই যেতে উৎসাহিত করা ভাল, নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা ভাল নয়। আবার সংসারের পথে থেকেও যাঁরা সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তাঁদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে সোনার হরিণের মতো সন্ন্যাস হলেই তাঁদের সমস্ত সমস্যার সমাধন হয়ে যাবে এরকম ভ্রান্ত ধারণা যেন কেউ না করে। কারণ যে পথেই যাক মানুষকে অনন্ত সংগ্রাম করতে হবে। কোন পথই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সব পথেই দুঃখ আছে। যেমন বলেছেন—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'—শাণিত ক্ষুরের ধারের মতো এই পথ সংসারের পথও যেমন, সন্ন্যাসের পথও তেমনই। যা ভগবানের পথ, যে পথে যেতে গেলে মনের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়, সে পথে এই সংগ্রামের

জন্য প্রস্তুত হয়েই যেতে হবে। এতে খুব সহজ একটা পথ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। আপাত-দৃষ্টিতে যেটাকে সহজ মনে হচ্ছে, যখন সংগ্রাম আরম্ভ হবে তখন সেটা আর সহজ থাকবে না। সংসারকে সহজ পথ বলে বলা হয় কিন্তু ঠাকুর যেভাবে সংসারে থাকতে বলেছেন, সেভাবে সংসারে থাকা যে সহজ নয় যাঁরা এইভাব নিয়ে রয়েছেন তাঁরাই বুঝতে পারেন। সকলেরই সেই কথা। সন্ন্যাসের পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সেখানেও অনেক সংগ্রাম করতে হয়। তার জন্য প্রস্তুত না হয়ে এগিয়ে গেলেই হবে না, সংগ্রাম করতেই হবে এটি জেনে নিয়ে মানুষকে এ পথে চলতে হবে।

সাধন-রহস্য

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন, 'মাস্টারমশাই, আসুন, সকলে সাধন করি।' সেইসময় তাঁদের মনে তীব্র বৈরাগ্যের ভাব, সেই ভাবে ব্যাকুল হয়ে তাঁরা সাধন ভজনে আত্মনিয়োগ করতে চাইছেন। সংসারের আবহাওয়ার ভিতরে, এমন কি বরানগর মঠে থাকতেও যেন তাঁদের ভাল লাগছে না। নির্জনে নিঃসঙ্গ হয়ে সমস্ত মন প্রাণ সাধনে নিমগ্ন করে দেবার জন্য তাঁরা ব্যাকুল হয়েছেন। রাজা মহারাজ বলছেন, 'তাই তো আর বাড়ী ফিরে গেলাম না, যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলে না তবে আর কেন ? তা নরেন বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর করতেই হবে ?' ভাব হচ্ছে, ভগবানকে পাওয়া না পাওয়া অনেক দূরের কথা;' কিন্তু তাঁর জন্য যতদূর সম্ভব সাধন করা, মনকে একাগ্র করা, তাঁকে পাওয়ার আশা নিয়ে বসে থাকা, সাধনের এইটিই সবচেয়ে বড় কথা।

সাধন ভজন করতে আরম্ভ করার পর অনেকে বলেন, কোন রস পাচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি না। কথা হচ্ছে, রস আনন্দ পাবার জন্যই

কি সাধন? তাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে সাধনের মূল্য অনেক কম। কোন সর্ত নিয়ে সাধন করা চলে না। ভগবানের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করতে হবে। এইভাব নিয়ে সাধন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানকে পেলাম না বলে মনের ভিতরে একটা হতাশার ভাব সৃষ্টি করা ঠিক নয়, তা কেবল মনকে দুর্বল করে এবং কখনও কখনও সাধন বিমুখও করে। একটা উদ্দেশ্যকে জীবনে বরণ করে নিয়েছি, সেই উদ্দেশ্যকে ধরে থাকব, তাতে যা হয় হোক। 'মন্ত্রং বা সাধয়েৎ, শরীরং বা পাতয়েৎ'—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। বুদ্ধদেবও এই ভাবের কথা বলেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিস্যতে'—ললিত বিস্তার এই আসনে আমার দেহ শুকিয়ে যাক, আমার ত্বক অস্থি মাংস সব লয় হয়ে যাক, তবু বহু জন্মের সাধনাতেও দুর্লভ যে বোধি, জ্ঞান, তা লাভ না হওয়া পর্যন্ত শরীর আর এই আসন থেকে নড়বে না। এই হল সংকল্পের দৃঢ়তা। সাধন করে এগোতে পাচ্ছি না বলে হতাশ হয়ে তা ছেড়ে দিলে চলবে না। ঠাকুর বলছেন, খানদানী চাষা হাজা, শুখোর পরোয়া রাখে না, চাষ করেই যায়। যারা কেবলমাত্র কৌতূহল পরবশ হয়ে সাধন জীবন আরম্ভ করে তাদের বেশীদূর এগোন সম্ভব হয় না। দুস্তর মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

বরানগর থেকে আগত ভক্তদের মধ্যে একজন নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আচ্ছা মশাই, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে?' তার উত্তরে স্বামীজী গীতার সেই শ্লোকটি বললেন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করছেন আর তাঁর মায়া প্রভাবে সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের মতো ঘোরাচ্ছেন। যেমন আড়াল থেকে দড়ি ধরে পুতুলকে নাচায় তেমনি করে তিনি সকলকে ঘোরাচ্ছেন। বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ'—সর্বপ্রকারে তাঁর শরণ নাও, তাঁর কৃপায় শাশ্বত শান্তি, পরম পদ লাভ

করবে। সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে একথা স্বামীজী বললেন না। বললেন, তাঁর শরণাগত হতে হবে। তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজন কিছু হয় না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে সাধন ভজন করবার কি প্রয়োজন নেই? তার উত্তর হল, অবশ্যই আছে। সাধন ভজন না করলে তাঁর শরণাগত হওয়া যায় না, কৃপার প্রত্যাশী হয়ে বসে থাকাও যায় না। সাধন ভজনের দ্বারা মনের শুদ্ধি হলে তখন তাঁর শরণাগত হয়ে ঠিক ঠিক কৃপা ভিক্ষা করা যাবে। সাধন না করলেও তাঁর কৃপা হবে কি না এই কথা আমাদের অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। তার উত্তরে বলা যায়, তাঁর কৃপার কোন **condition** বা সর্ত নেই। এই করলে তাঁর কৃপা হবে আর এই করলে হবে না এই রকম কোন কথা নেই। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সাধন করলেও হবে না বা এমন কোনো সর্তও নেই যা পূরণ করলে তিনি কৃপা করবেন তাহলে আমাদের কি উপায়? কোন ভরসা না থাকলে কি করে আমরা এগোব? তার উত্তরে এইটুকু বুঝতে হবে যে, সাধন অবশ্যই করণীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আর পাঁচটা কাজ করছি, কর্তৃত্ববোধ রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধন করা ছাড়া কোন গতি নেই। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, সাধন করছি বলেই ভগবান মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত ভূতের মতো এসে হাজির হবেন এরকম কোনো সর্ত নেই। সাধনা ছাড়া আর জীবনে করণীয় কিছু নেই, এই বুদ্ধি নিয়েই সাধন করতে হবে। তাহলে সাধকের মনে আর এই প্রশ্ন উঠবে না যে, এত সাধন করছি কিন্তু কই তিনি তো দেখা দিচ্ছেন না। সাধক বুঝতে পারবে যে তাঁকে চিন্তা করা, ব্যাকুল হয়ে ডাকার মধ্যেই রয়েছে সাধনের সার্থকতা অর্থাৎ সাধনেই সাধকের চরিতার্থতা। ঐকান্তিকতার সঙ্গে সাধন করলেও কি তাঁর কৃপা হবে না? তারও উত্তর হচ্ছে এখানেও কোন সর্ত নেই। তবে তাঁর কৃপার আশা আকাঙ্ক্ষা করে বসে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে শবরীর প্রতীক্ষার দৃষ্টান্তটি সুন্দর।

শবরী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনের আশায় অপেক্ষা করে বসে আছেন। তাঁর বাল্য গেল, যৌবনও গেল, বার্দ্ধক্য এল তখনও তিনি একভাবে প্রতীক্ষা করে আছেন। তাঁর মনে হতাশা আসছে না, মনে হচ্ছে না যে তাহলে তো আমার দর্শন হল না। জীবনের শেষ মুহূর্তে শবরী রামচন্দ্রের কৃপালাভ করলেন। লাভ কখন হবে কেউ জানে না কিন্তু দরকার হলে দু-এক জন্ম নয়, জন্ম জন্মান্তর ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে। যেমন ঠাকুরের গল্পে আছে, 'শান্তিরাম বলছে, শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোক তোর ভিজবে গাঁজা।' শান্তিরাম অপেক্ষা করে বসে আছে, সে তাঁর চিন্তা করে, নাম করে মুক্তি তার হবেই। নারদকে যেতে দেখে সে বলল, ঠাকুর, কোথায় যাচ্ছ? নারদ গোলোক যাচ্ছেন শুনে বলল, প্রভুকে দয়া করে জিজ্ঞাসা করবেন আমার মুক্তিলাভের আর কত দেরী। একজন যোগী কাছে ছিল, সেও ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বলল। নারদ গোলোক থেকে ফিরে এসে বললেন, প্রভু বলেছেন, যোগীর আর তিন জন্ম পরে মুক্তি হবে আর শান্তিরামের মুক্তি হবে, যে তেঁতুল গাছের নীচে সে বসে আছে সেই তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে তত জন্মের পর। শুনে শান্তিরাম আনন্দে আত্মহারা, তাহলে মুক্তি একদিন অবশ্যই হবে। এই বিশ্বাসের ফলে এক মুহূর্তে তার অতগুলি জন্মের ভোগ ক্ষয় হয়ে গেল। আরও তিন জন্ম বাকি আছে শুনে যোগী হতাশ হয়ে সাধনা ছেড়ে দিল। সাধনপথের বৈশিষ্ট্য এটাই সময় এখানে এগোবার পক্ষে একটি প্রবল কারণ নয়। তাঁর ইচ্ছা হলে একমুহূর্তে কোটি জন্মের ভোগ ক্ষয় হয়ে যায়। ভাগবতে আছে, গোপীরা তো তেমন কিছু জপতপ করেনি তবে তাদের মুক্তি হল কি করে? পাপপুণ্য সব ক্ষয় হলে তবে তো মুক্তি হবে? তার উত্তরে বলছেন, গোপীরা সাধন ভজন ঐভাবে করেনি বটে কিন্তু পাপের ফল হল দুঃখ আর ভগবানের বিরহে গোপীদের অন্তরে যে তীব্র বেদনা

বোধ তাতেই তাদের পূর্বের সঞ্চিত সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে গেল। আর পুণ্যের ফল সুখ বা আনন্দ। ভগবানের সঙ্গে মিলনের যে অপার আনন্দ সেই আনন্দে তাদের জন্ম জন্মের সব পুণ্যও ক্ষয় হয়ে গেল। সুতরাং পাপপুণ্য উভয়ের ক্ষয়ে তাদের মুক্তি হল। ভাব হচ্ছে, তাঁকে লাভ করবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা, তীব্রতা কতখানি তার উপরই তাঁর কৃপা নির্ভর করছে। তা ছাড়া কৃপা করবেন তিনি তা যখন তাঁর ইচ্ছা হবে তখন করবেন। কৃপা করতে আমরা তাঁকে বাধ্য করতে পারি না। আমার করণীয় যা তা আমাকে করে যেতে হবে, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তা করবেন। কৃপা যদি তিনি নাও করেন, তবুও সাধন থেকে বিরত হওয়া চলবে না। তাঁকে ছাড়া আর কিছু চাই না। যে সাধক তার কাছে অন্য সব আনন্দ তুচ্ছ, ভগবৎ আনন্দ ছাড়া আর কিছু সে চায় না। যদি নাও পায় তাতেও ক্ষতি নেই, এই চাওয়াতেই তার তৃপ্তি। কৃপা তিনি করবেন কি না তিনিই জানেন, কিন্তু আমাকে তাঁর কৃপার ভিখারী হয়ে জন্ম জন্ম কাটাতে হবে।

স্বামীজী ঐ যে বলেছেন, রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করতে হবে? জীবনে একটি জিনিস বরণ করেছি তা হল তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু আমার জীবনে কাম্য নেই, যদি তাঁকে না পাই তাহলেও তিনিই কাম্য হয়ে থাকবেন। জীবনের একটি বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এইটি, এর থেকে কখনও যেন দূরে সরে না যাই এইটি সাধককে মনে রাখতে হবে।

এরপরে কথাপ্রসঙ্গে মাস্টারমশাইকে রাখাল যা বলছেন তার তাৎপর্য হল সব প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে হবে কারণ প্রলোভন তাঁকে ভুলিয়ে দেয়। এখানে বিশেষভাবে স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকতে, তাদের দিকে না তাকাতে বলা আছে। তবে এসব বাইরের ব্যবহার মাত্র। আসলে লক্ষ্য রাখতে হবে সাধকের মন শুদ্ধ কিনা, অন্তরের

ভিতরে প্রলোভন আছে কিনা। বাইরে ব্যবহার কে কিরকম করছে সেটা বড় কথা নয়, বড় হল মনের শুদ্ধি। সমস্ত প্রলোভন থেকে দূরে থেকেও কেউ যদি মনে মনে সেই প্রলোভনের কথা চিন্তা করে তাহলে দূরে থাকার কোন সার্থকতা নেই। তবে কি তাকে প্রলোভনের বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে? তাও নয়। মনে রাখতে হবে আমাদের আসল দৃষ্টি কোথায়। সাধককে আত্মবিশ্লেষণ করে এইটি বিচার করতে হবে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করে কারো মনে যদি একটুও অভিমান অহংকার না আসে তবুও তার নিজেকে বিচার করে দেখতে হবে যে মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ অর্থাৎ সব অশুভ চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছে কি না। তা না হলে গর্ব করবার কিছু আছে কি? গীতায় বলছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ (২।৫৯)

—যে নিরাহার ব্যক্তি অর্থাৎ যে বিষয় ভোগ করছে না তার থেকে বিষয় দূরে রয়েছে ঠিকই কিন্তু রস অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা গিয়েছে কি? বিষয় থেকে দূরে থাকলেই যে বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মন থেকে চলে যাবে তা বলা যায় না। তাহলে বিষয় রস যাবে কি করে? তার উত্তর বলছেন, 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'—বিষয়ের প্রতি মনের যে আকাঙ্ক্ষা তাও দূর হয়ে যায় সেই পরম বস্তুকে উপলব্ধি করলে। যিনি রসস্বরূপ, যাঁর রসে মন অভিষিক্ত হলে অন্য কোন রস আর ভাল লাগে না, তাঁকে যে উপলব্ধি করেছে তার মন অন্যদিকে যাবে না, বিষয় তাকে প্রলুব্ধ করতে পারবেই না। তার কোন আসক্তিও থাকবে না। 'ইতরোরাগবিস্মরণং নৃণাম্'—ভাগবতে আছে, তাঁর আসক্তি অনুভব করলে অন্য আসক্তি দূর হয়ে যায়। গীতায় ভগবান বলছেন,

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' (৬।২২)

—যাঁকে পেলে সাধক তার চেয়ে বড় আর কোন আকাঙ্ক্ষার বস্তু আছে বলে মনে করে না। ভগবৎ আনন্দের স্বাদ পেলে আর ভাবনা নেই, মানুষ তখন 'নিকষিত হেম' হয়ে যায়।

কিন্তু সাধক কি করবে? দরকার হলে তাকে সমস্ত জীবন ধরে এই নীরস সংগ্রাম করে যেতে হবে, আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে বসে থাকলে হবে না। চিরকাল সংগ্রামে লিপ্ত থেকে ক্ষত বিক্ষত হতে হবে, তবুও যুদ্ধের বিরাম চলবে না। অনেক সময় ভগবানকে পেলাম না বলে হতাশা এসে পাবার ইচ্ছাটিকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়, কিন্তু সাধককে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, যে কোন অবস্থাতেই সে ভগবানকে ধরে থাকবে, অন্য কিছু চাইবে না চাতক পাখীর মতো। চাতকের কাছে—'বিনা মেঘে সব জল ধুর'। এ না হলে তার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ, অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে ব্যর্থ। কারণ সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। যতটুকু করা যায় ততটুকুই সম্পদ হয়ে থাকে। পথ বড় দীর্ঘ অফুরন্ত কাজেই দৃঢ়ভাবে ধৈর্যের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। ধৈর্য শব্দটির উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। ধৈর্য শব্দের আমরা দুরকম অর্থ পাই। এক যাকে ইংরাজীতে বলে **patience** বা লেগে থাকা, দ্বিতীয় হল ধৈর্য মানে ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির যা স্বরূপ। যদি এইরকম হোত যে পঁচিশ বছর কাজ করলেই পেনসন পাওয়া যাবে, কাজেই পঁচিশটা বছর কোনো রকম করে কাটিয়ে দিয়ে তারপর পেনসন ভোগ করলাম, এ তা নয়। দরকার হলে জন্ম জন্ম এইরকম করে কাটাতে হবে এর প্রতিদানে কিছু চাইব না। তারপর কৃপা যখন তিনি করবেন তখন হবে। তবে অহং থাকলে কৃপা বাতাস যে বইছে সে অনুভব হয় না, অহং ভাব এমনভাবে আচ্ছন্ন করে থাকে যে পাল তোলা হল না। ফলে নৌকা একটুও এগোল না। নিজের জালে নিজে বদ্ধ হয়ে রয়েছি, তাই কৃপা সর্বত্র প্রবহমান হলেও অনুভব হচ্ছে না।

অনুভব তাহলে হবে কি করে? ঠাকুর বলছেন, তুই পাল তুলে দে অর্থাৎ দৃষ্টির পরিবর্তন কর। দৃষ্টিকে শুদ্ধ, অভিমান অহংকারকে চূর্ণ কর তাহলে হবে। অভিমান অহংকার চূর্ণ করবার জন্য সাধনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরকম অধিকারী বিরল যে প্রথম থেকেই নিরভিমান, নিরহংকার। কাজেই সেগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হয়। পাখীর উড়ে উড়ে যখন ডানা ব্যথা হয়ে যায় তখনই সে মাস্তলে বসে। আমাদের এই সাধন করা পাখীর ডানা ব্যথা করার মতো। যতদূর পারা যায় চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করে আমাদের কি লাভ হবে? না, আমি সাধক এই অহংকার, অভিমান চূর্ণ হবে। বুঝব যে সাধনা আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, কোনো সার্থকতায় পৌঁছে দিচ্ছে না। সাধনের ব্যর্থতার এই অনুভব, সাধন না করলে হয় না। তাই হরি মহারাজও অনেক জায়গায় বলেছেন, যে সাধন হচ্ছে উড়ে উড়ে ডানা ব্যথা করবার জন্য। যখন ডানা ব্যথা হয়ে যায় আর উড়তে পারে না তখনই সে আশ্রয় চায়। সাধন এইজন্য অপরিহার্য। কিন্তু সাধনের দ্বারা কি ফল লাভ হবে? ফল এই হবে যে, সাধনের ব্যর্থতার অনুভূতি আসবে। তখনই তার ঠিক ঠিক শরণাগতি আসবে।

যে কোন প্রকারের শরণাগতি, তা সকামই হোক আর নিষ্কামই হোক সহজে লাভ হয় না। অনেকের মনে হবে যে সকাম ভাবে শরণাগতি আবার কি রকম? ঐহিক কোন জিনিস পেতে চাইলে তার জন্য আমরা কি করি? তাঁর শরণাগত হই, না, আমাদের যতদূর সামর্থ্য আছে তার দ্বারা চেষ্টা করি? কেউ বলছেন, ছেলের অসুখ আমি ডাক্তার ডেকেছি, অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ, কবিরাজও ডেকেছি এবং শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ এসবও করেছি। তার মানে হচ্ছে এর কোনোটাতেই পুরো বিশ্বাস নেই। এমন মনে হবে না যে

ভগবানের শরণাগত হই তিনি আমার ছেলেকে ভাল করে দেবেন। শরণাগতি তো সকাম তবুও এটি সহজসাধ্য নয়। নিষ্কাম তো আরও দূরে। চেষ্টা করে করে নিজের কর্তৃত্ববোধকে যদি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা যায় তখন তাঁর শরণাগত হতেই হবে, তা ছাড়া উপায় থাকে না। শরণাগতি এলে তাঁকে সহজলভ্য মনে হয়।

ভাগবতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে—যশোদার কাছে প্রতিবেশী গোপীরা এসে অভিযোগ করছেন, তোমার ছেলের জ্বালায় আমরা আর পারি না। কত রকমে সে উপদ্রব করে—আমাদের ঘরে ঢুকে দুধ খেয়ে ফেলে, দুধের ভাঁড় উপরে শিকেয় তুলে রাখলে বাঁশের খোঁচা দিয়ে সেগুলো ভেঙে ফেলে, হয়তো দোলনায় ছেলে ঘুমাচ্ছে তাকে খোঁচা দিয়ে কাঁদায়, এমনি কত কি। যশোদার শুনে খুব রাগ হল। ছেলেকে শাস্তি দিতে হবে, ঠিক করলেন বেঁধে রাখবেন। বাঁধতে গিয়ে দেখেন দড়ি দু-আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। আরও একটা দড়ি তার সঙ্গে যোগ করলেন তবুও দু-আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছে। গোয়ালার বাড়ী দড়ির অভাব নেই। যত দড়ি ছিল জুড়ে জুড়ে তাতেও বাঁধার মতো যথেষ্ট দড়ি পাওয়া গেল না। যশোদার একথা মনে হচ্ছে না যে কি করে এত বড় দড়িতেও কম পড়ছে। মায়ার বশে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়ে কৃষ্ণের দেবত্ব তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি তাঁকে তাঁর সন্তান বলেই জানেন। ছেলে দেখছে যে মা বাঁধবার জন্য একেবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। বর্ণনা আছে সুন্দর—মায়ের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে, বেশবাস বিস্রস্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত তিনি। তখন অগত্যা তিনি নিজে বন্ধন স্বীকার করলেন। ভাব হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে স্বীকার না করলে তাঁকে কে বাঁধতে পারে? কিন্তু কখন তিনি স্বীকার করলেন? যখন যশোদা হার মেনেছেন তখনই, গোড়াতেই নয়।

কথামৃতের একটি ঘটনা—হরি মহারাজ গভীর সাধন ভজনে মগ্ন, ঠাকুরের কাছে পর্যন্ত যান না। ঠাকুর অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হরি কেন আসছে না অনেকদিন? সে বললে, আর মশাই হরি আসবেন না। তিনি এখন সাধন ভজনে মগ্ন। বেদান্ত চর্চা এবং গভীর ভাবে ধ্যান ভজন করছেন আসতে পারছেন না। ঠাকুর কোনো কথা বললেন না। তারপরে ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়িতে এসে হরিকে খবর পাঠালেন। তিনি কাছাকাছিই থাকতেন। এসে দূর থেকে দেখলেন বলরাম মন্দিরের দোতলার হলঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন আর একটি গান গাইছেন, যাত্রার গান। ঠাকুরের দুচোখ থেকে ধারা বেয়ে কাপড় ভিজিয়ে যেখানে বসে আছেন সেখানকার কার্পেটও খানিকটা ভিজে গিয়েছে। হনুমানের একটি গান গাইছেন। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন, তখন লবকুশ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, রামের ঘোড়াকে তারা বেঁধে রেখে দিল। এরপরে রামচন্দ্রের সঙ্গে তাদের দুজনের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে হনুমান আছেন। হনুমানকে লবকুশ বেঁধে নিয়ে এসেছেন সীতার কাছে, আর বলছেন, মা, দেখ কত বড় একটা হনুমানকে বেঁধে এনেছি। তখন হনুমান গাইছেন, 'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে'—ঠাকুর এই গান বার বার গাইছেন আর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। এই দৃশ্য দেখে হরি মহারাজেরও দুচোখ দিয়ে ধারা বইতে লাগল। তিনি বুঝলেন, তাঁকেই ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন এই গান গেয়ে যে, ধরা না দিলে তাঁকে ধরা যায় না, সাধনের তিনি বশ নন।

তবে সাধন না করলে তিনি যে সাধন দুর্লভ এই কথা বোঝা যাবে না, মনে হবে আর একটু করলেই হবে। সাধন ভজন যাঁরা করেছেন, তাঁদের সকলেরই সাক্ষাৎ অনুভব যে আর একটু করলেই বুঝি হবে।

আচ্ছা, না হয় দশ হাজার করে জপ করি, করল দশ হাজার জপ। তাতেও হচ্ছে না। তাহলে আরও বাড়াই। কিন্তু একথা মনে হয় না যে, যে অভিমান নিয়ে আমি জপ করছি সেই অভিমানটি না যাওয়া পর্যন্ত হবে না। মনে হয় আর একটু করলেই হবে। আমরা চারিদিকে অভিমানের বেড়া দিয়ে বসে আছি, তাই তিনি ঢুকবার পথ পাচ্ছেন না। অভিমানকে দূরে সরিয়ে দিলেই দেখা যাবে অন্তরে বাইরে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। ঐ কৃপা বাতাস অকুণ্ঠভাবে বয়ে যাচ্ছে কিন্তু যতক্ষণ মনে করি আমরা সাধক, সাধনার দ্বারা তাঁকে লাভ করব, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দূরে। আর যখন ঐ যশোদার মতো বিপর্যস্ত হয়ে, শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আমরা সাধনার অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জন দেব, তখনই তাঁর কৃপার অনুভব হবে। এই কথাটি বিশেষ করে আমাদের বুঝবার জিনিস।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর জ্ঞান ও প্রেমের অবস্থা

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর ভক্তেরা কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন, তাঁদের মানসিক অবস্থা কিরকম এখানে তার বর্ণনা করা হয়েছে। কয়েকটি কথায় ভক্তদের মনের তীব্র বৈরাগ্যের চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। রাখাল ভাবছেন একাকী নর্মদাতীরে কি অন্য কোথাও চলে যাবেন। নিজের তপস্যা প্রবণ মন তবু প্রসন্নকে বোঝাচ্ছেন, 'কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে?' যাঁরা ত্যাগী তাঁদের মনে হয় সংসারের থেকে দূরে যাওয়া দরকার কারণ সংসার মায়াপাশে বদ্ধ করে। বাপমায়ের মায়াও মায়া। এখানে থাকলে তাঁদের ভালবাসা যদি মনকে আবদ্ধ করে তাই প্রসন্ন সংসার ছেড়ে যেতে চাইছেন। রাখাল তার উত্তরে বলছেন, 'গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে?'

অর্থাৎ যে মন তাঁর দিকে গিয়েছে সে কি আর বাপ-মায়ের ভালবাসাতে আবদ্ধ হয়? ভগবানের ভালবাসার তুলনা নেই। বাপমায়ের বিশেষ করে মায়ের ভালবাসা নিঃস্বার্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই। মায়ের সমস্ত মনটা সন্তানের জন্য পড়ে থাকে, সন্তান তাকে একদিন দেখবে, পালন করবে এই আশা নিয়ে নয়, সন্তানকে সন্তান বুদ্ধিতে দেখেই এত ভালবাসা। তবু সে ভালবাসার সঙ্গে ঈশ্বরের ভালবাসার দুটি দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। প্রথমত মায়ের ভালবাসারও একটা সীমা আছে। মা যতই ভালবাসুন সন্তানের সঙ্গে যখন কোন আদর্শের বিরোধ হয় কিংবা সন্তান যদি মাকে একেবারে না দেখে, ভরণপোষণ না করে তখন হয়তো সন্তানের প্রতিও মায়ের মন বিরূপ হতে পারে। কিন্তু ভগবানের ভালবাসায় এইরকম কোনো সর্ত নেই। এই হলে তিনি ভালবাসবেন না, আর এই হলে ভালবাসবেন এইরকম কথা নেই। এইজন্যই তাঁকে অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলা হয়। কোনো হেতু ছাড়াই তিনি কৃপা করেন আর সেই কৃপারও কোনো সীমা নেই। সমুদ্রের মতো সে ভালবাসা অসীম অনন্ত, তা কখনও নিঃশেষিত হয় না। তাই ভগবানের ভালবাসার তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়ত মায়ের ভালবাসা হচ্ছে মায়িক ভালবাসা। মায়ের শরীর থেকে সন্তানের জন্ম, এইজন্য মায়ের মনে হয় সন্তানের সঙ্গে তার দেহ মন এক। নিজের দেহের প্রতি যেমন ভালবাসা সন্তানের প্রতিও তেমনি ভালবাসা। মায়ের চেয়ে ভালবাসা আর কোথাও মেলে না এইজন্য মাতৃস্নেহকে সবচেয়ে গভীর বলা হয়। তবু সেখানেও স্নেহ একটা মায়িক বন্ধন। 'এ আমার' বলে সন্তানের প্রতি মায়ের যে তীব্র আকর্ষণ বা মমত্ব বোধ এটি কিন্তু পরিপূর্ণ ভালবাসার পরিচয় নয়। প্রকৃত ভালবাসা হল যাকে ভালবাসি তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। মা সন্তানের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলয় করে দেন না,

সন্তানকেই নিজের মধ্যে বিলয় করে দেন অর্থাৎ নিজেকে ভালবাসেন তাই সন্তানকেও ভালবাসেন। সন্তান 'আমার' বলেই এই ভালবাসা। নিজের সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালবাসা থাকে অন্যের সন্তানের প্রতি তা হয় না। কাজেই সেই ভালবাসা সীমিত। পাত্রের দ্বারা ও কালের দ্বারা সীমিত, কারণের দ্বারাও সীমিত। সুতরাং এই সীমিত ভালবাসার সঙ্গে ভগবানের অসীম ভালবাসার তুলনা হয় না। তাঁর ভালবাসা বিশেষ কোন পাত্রে হবে তা নয়, কোন এক কালে হবে তা-ও নয়, তিনি সর্বকালে ভালবাসেন এবং তাঁর ভালবাসা অহেতুক, কারণের দ্বারা সীমিত নয়।

এরপরে প্রসন্ন রাখালকে বলছেন, 'তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না?' প্রসন্ন রাখালের মনের অবস্থা জানেন তাই প্রশ্ন করলেন। রাখাল বলছেন, 'মনে খেয়াল হয় যে নর্মদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি। এক একবার ভাবি, ঐসব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি।' সেই সময় গৃহীরা অনেকে তীর্থস্থানে বাগানবাড়ী করে রাখত যখন সুবিধা পাবে তখন সেখানে গিয়ে সাধন ভজন করবে। কিন্তু তাদের পক্ষে সেখানে গিয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব হোত না কাজেই বাগানটি খালি পড়ে থাকত। সেখানে ছোটখাট ঘর থাকত। সাধু বা কেউ খালি বাগান পেয়ে থাকতে ইচ্ছা করলে তাকে থাকতে দেওয়া হোত। কাশীতে আগে এইরকম অনেক বাগান ছিল, সেখানে সাধুরা থাকতে পেতেন। রাখাল বাগানে থাকি বলতে এইরকম জায়গায় থাকতে চাইছেন।

এরপর দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্নের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। প্রসন্ন বলছেন, 'না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম; কি নিয়ে থাকা যায়?' তারক বলছেন, 'জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে?' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে যে দর্শন করেছে তার প্রেম হবে না এ

কি হয়? তারকের এই রকম উক্তি। তারক অর্থাৎ স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে যাঁরা ব্যবহার করেছেন, তাঁরা জানেন যে, মানুষ ভগবানের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারে না, এ তিনি ভাবতেই পারতেন না। তিনি মনে করতেন এ কি সম্ভব? তাছাড়া প্রত্যেককে পূর্ণজ্ঞান হোক পূর্ণভক্তি হোক বলে যেরকম আশীর্বাদ করতেন তার দ্বারা বোঝা যেত যে তাঁর মধ্যে কপটতা ছিল না, তিনি স্তোকবাক্য দিতেন না। তিনি জানতেন প্রত্যেকেরই পক্ষে পূর্ণজ্ঞান পূর্ণভক্তি লাভ করা সম্ভব। আশীর্বাদ করার সময় বলতেন, হবে না আবার কি? আমাদের মতো মাত্রা রেখে বলতেন না। তাই এখানে বলছেন, ঠাকুরকে দেখা সত্ত্বেও ভক্তি হল না? তিনি এটা বুঝতেই পারেন না যে প্রেম ও ভক্তির উৎসস্বরূপ যে শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁকে যে দর্শন করেছে তার আবার ভক্তি হবে না কেমন করে?

বললেন, 'জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে।' ঠাকুরও জ্ঞানের কথা সর্বদা খুলে বলতেন না, অনেক সংকোচ করে বলতেন। লোককে যখন তখন বলতেন, হ্যাঁ ভক্তিই ভাল, জ্ঞান কঠিন পথ। প্রসন্ন বলছেন, 'কাঁদতে পারলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে?' তারকের উত্তরটি লক্ষণীয়। তিনি বলছেন, 'কেন, পরমহংস মশায়কে ত দেখেছ।' তাঁকে দেখেছ অতএব তা বৃথা হবে কেমন করে? জ্বলন্ত জ্ঞান আর প্রেমের সজীব মূর্তিকে যে দেখেছে তার জ্ঞান প্রেম লাভ করা খুব কঠিন হবে একথা তিনি কল্পনাই করতে পারতেন না।

তারপর বলছেন, 'আর জ্ঞানই বা হবে না কেন?' আগে বলেছিলেন জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে এখানে আবার নিজেকে সংশোধন করে বলছেন, শক্ত হতে পারে কিন্তু হবে না কেন? তখন প্রসন্ন বলছেন, 'কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে ত জানা। কি জানবে? ভগবান আছেন কিনা, তারই ঠিক নাই।' ভগবান আছেন কি না, এই যে প্রশ্ন এ সকলেরই

মনে। এত বড় ভক্ত যিনি, যাঁর মনে এইরকম তীব্র বৈরাগ্য, যাঁর এত প্রেম, যাঁর মন কাঁদছে প্রেম হোল না বলে, সেই মানুষের মনেও এরকম প্রশ্ন উঠছে যে ভগবান আছেন কি না তারই ঠিক নেই। মানুষের বিশেষকরে ভক্তদের সাধনপথে এগিয়ে যেতে যেতে মনের এইরকম দোলায়মান অবস্থা প্রায়ই হয়। এর ভিতর দিয়ে সকলকেই যেতে হয়। ভগবান আছেন বলে মনে দৃঢ় ধারণা সহজে হয় না। মনের ভিতরে সংশয় আসে সত্যিই কি তিনি আছেন, না আমরা আলেয়ার পিছনে ছুটছি? অনেক সময় সাধারণ লোকেও এ কথা বলে। কিন্তু যাঁরা সাধক, তীব্র ভক্তি বা জ্ঞানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের কথা ভিন্ন। তাঁরা যখন বলছেন ভগবান আছেন কি না তারই ঠিক নেই তখন তার অর্থ বুঝতে হবে যে ভগবদ্ অনুভূতির জন্য তাঁর মনে তীব্র ব্যাকুলতা। কেবল ভগবান আছেন শুনে তাঁর মন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে চায় না। তাঁদের কথা, যদি আছেন তাহলে তাঁকে দেখতে পাই না কেন? রামপ্রসাদ বলছেন, 'মা বলে ডাকিস না রে ভাই, থাকলে এসে দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই।' মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান করে সন্তান বলছেন, আমি এত কাঁদছি তুমি থাকলে নিশ্চয়ই দেখা দিতে, সুতরাং তুমি নেই। এটা অভিমানের কথা, অবিশ্বাসের কথা নয়। তারক বললেন, 'হ্যাঁ তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।'

জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নেই মানে বৌদ্ধ মতে ঈশ্বর নেই কিন্তু ঠিক সেই সিদ্ধান্ত সেখানে নেই। বুদ্ধদেবকে একজন জিজ্ঞাসা করছেন, ভগবান কি আছেন? বুদ্ধ বলছেন, আমি কি বলেছি আছেন? তখন প্রশ্নকর্তা বললেন, তাহলে কি ভগবান নেই? বুদ্ধদেব বলছেন, আমি কি বলেছি তিনি নেই? ভাব হচ্ছে ভগবান আছেন কি না তিনি বলছেন না এবং না বলার কারণ হচ্ছে যে ভগবান আছেন বললেই বা আমাদের কি লাভ হল আর নেই বললেই বা কি লোকসান হল?

সাধারণ মানুষের কাছে ভগবান তো কথার কথা। এই কথার কথারূপ যে ভগবান সে ভগবানের থাকা না থাকা আর এই নিয়ে ঘোর তর্ক করা নিরর্থক। তর্কের ভিতর দিয়ে যাওয়ার মানে মনে সেরকম কোনো জিজ্ঞাসা যে আছে তা নয়, একটা বুদ্ধির কসরৎ মাত্র। যাঁরা তর্ককুশল তাঁরা কেউ বুদ্ধি করে ভগবান আছেন তার অকাট্য প্রমাণ দেখাবেন আবার তার বিপরীত ক্রমে কেউ দেখাবেন ভগবানের না থাকাটাই যুক্তিসিদ্ধ। সাধারণ মানুষ এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। জ্ঞানীরও ভ্রান্তি এইরকম তর্কের দ্বারা দূর হয় না। কাজেই শুধু তর্ক দিয়ে জ্ঞান অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তাহলে তর্কের সঙ্গে আর কি চাই? ঠাকুর বলেছেন সে কথা, তর্কের সঙ্গে ত্যাগ বৈরাগ্য চাই। বিষয়ের আকর্ষণ যদি থাকে তাহলে তর্কের সাহায্যে যতই বলি জগৎ মিথ্যা ঈশ্বর সত্য কিন্তু আচরণের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে আমরা ঈশ্বরকে অসত্য করে জগৎকেই সত্যের স্থান দিচ্ছি। কাজেই এ তর্কের দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। মনের যখন যে রকম অবস্থা সিদ্ধান্ত সেই অনুসারে হবে। এরূপ সিদ্ধান্ত খুব নির্ভরযোগ্য হয় না একথা বলা চলে। তাহলে নির্ভরযোগ্য নয় এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের লাভ কি? তাই বুদ্ধদেব বলতেন, আমাদের দুঃখের নিবৃত্তি করতে হবে। সেই নিবৃত্তির কি উপায় তাও তিনি বলে দিয়েছেন। বাসনা ত্যাগ করলেই দুঃখের নিবৃত্তি হবে। এ তো সোজা কথা। এখন বাসনা কি করে ত্যাগ করব? না, বাসনা যে দুঃখের মূল সেটা জেনে ত্যাগ করব। মন যদি ভাল করে বুঝে নেয় যে বাসনাই সকল দুঃখের কারণ তাহলে বাসনাকে প্রশ্রয় দেয় কেন? দেয় তার কারণ এ বিষয়ে সে খুব সচেতন নয়, অন্তরের সঙ্গে সে জিনিসটি বুঝবার চেষ্টা করছে না। তর্ক বিচার করে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করতে চেষ্টা করছে। এইরূপ বিচারের কোনো অর্থ নেই। গীতায় বলছেন,

'বাদঃ প্রবদতামহম্'—যারা তর্ক করে তাদের ভিতরে আমি বাদরূপে আছি। বাদ মানে শুদ্ধ তর্ক যা মানুষকে তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছে দেয়। কিন্তু তত্ত্বকে লাভ করতে হলে মনকে সম্পূর্ণ রাগ-দ্বেষ মুক্ত করতে হবে। রাগ হল কোন বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ এবং দ্বেষ হল কোন বস্তুর প্রতি মনের বিকর্ষণ। এই অনুরাগ আর বিরাগ যুক্ত যে মন, সে মন কখনও শুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না। যে সিদ্ধান্তের প্রতি তার আগ্রহ আছে সে তর্ক যুক্তির দ্বারা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করবে। কাজেই সেটা তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করার পক্ষে অনুকূল নয়। অতএব সবরকম তর্ক-বিচারের দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় না। তর্ক এমন হবে যে অন্য কোনো বিচার আর আসবে না, অন্য কোনো দিকে মনের প্রবণতা থাকবে না। কেবল তত্ত্বটিকে, সত্যটিকে জানতে চাইবে। রাগ-দ্বেষ মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই দৃষ্টিতে দেখে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা তিনি বলতে চান না। এসব কেবল নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা, এতে লাভ নেই, দুঃখের নিবৃত্তি চাইলে আগে বিচার করতে হবে কি করে তা হবে। বিচারের প্রথম বস্তু হচ্ছে দুঃখ আছে, জগৎ দুঃখময় এটি অনুভব করা। অনুভব করলে সমস্ত জগতের প্রতি বৈরাগ্য আসে। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সমস্ত কিছুর প্রতি বৈরাগ্য হতে হবে। বিচার করতে করতে মনের এমনি অবস্থা আসবে যখন কোনো একটা দিকে প্রবণতা থাকবে না, বিচারকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তারপরে সেই অনুভূতি হবে, সিদ্ধান্ত হবে যে সমস্ত দুঃখময়। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে জগৎটা যে দুঃখময় এ ধারণা মানুষের সহজে হয় না। ধারণা হলে তখন তার সাধনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। বুদ্ধদেব এক জায়গায় বলছেন, দেখছ না সমস্ত জগৎটা জ্বলছে। তুমি চাইছ যে, এই দাবানল থেকে তুমি পরিত্রাণ পেয়ে যাবে? ভাবছ অপরের দুঃখ হোক, আমি কোনরকম করে

সুখে থাকব। এ সম্ভব নয়। জগৎ যে দুঃখময় এটি চিরন্তন সত্য বলে তিনি বলেছেন, এ তাঁরই আবিষ্কার। জগৎ দুঃখময় তা সকলেই জানে কিন্তু জগৎটাকে দুঃখময় বলে প্রতিপন্ন করা এমন জোর দিয়ে কঠোর ভাষায় বোধহয় আর কেউ বলেন নি। বুদ্ধ বলছেন, এটি আর্যসত্য যে জগতে দুঃখের অস্তিত্ব আছে। আর দ্বিতীয় আর্যসত্য হল দুঃখের নিবৃত্তিও আছে। যদি দুঃখ অনিবার্য হয় তাহলে দুঃখ ভোগ করতেই হবে এই ভেবে মনে হতাশা, নিশ্চেষ্টতা আসবে। তাই আশ্বাস দিচ্ছেন, দুঃখের নিবৃত্তিও হয়। আর দুঃখের নিবৃত্তি হয় জানতে পারলে নিবৃত্তির উপায়ও হয়।

এখন, কি করলে এই দুঃখের নিবৃত্তি হতে পারে, এটি সবচেয়ে বড় কথা যা মানুষের জানা প্রয়োজন। বুদ্ধ সেটি বিচার করে করে, ধ্যান করে করে আবিষ্কার করলেন। বললেন, দুঃখের কারণ দূর হলে দুঃখের নিবৃত্তি হবে। দুঃখের কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করে করে তিনি দেখলেন তৃষ্ণা বা বাসনাই দুঃখের কারণ। যেখানেই দুঃখ দেখতে পাই সেখানেই খুঁজে পাব বাসনা। যেমন কারো হয়তো দুঃখ যে তার স্বাস্থ্য বড় ভঙ্গুর। কেন? না, তার বাসনা সে যেন সুস্থ থাকে, আরোগ্য তার বাসনা। এই বাসনা থাকার ফলেই তার রোগের জন্য দুঃখ হচ্ছে, এ না থাকলে রোগের কষ্ট হবে না। আর কষ্ট হলেও তার যদি সুস্বাস্থ্য ভোগ করবার বাসনা না থাকে তাহলে মনে দুঃখ আসবে না। সুতরাং মূল কারণ হল বাসনা। এই বাসনা ত্যাগ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বটে কিন্তু বাসনার নিবৃত্তি করবে কি করে? বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে বললেই তো আর করা যায় না। এখানেই হচ্ছে সাধারণ মন আর লোকোত্তর পুরুষের মনের তফাৎ। ঠাকুর বললেন, মনে করলাম এটা ত্যাগ করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মন দৃঢ় হয়ে গেল তাতে। চেষ্টা করেও তাকে সেই পথে নেওয়া যাবে না।

এখানে রাগ দ্বেষাদির থেকে মুক্ত মনের জ্ঞান লাভের কথাই বলছেন। তাই বললেন, 'জ্ঞান কি হয়?' আমাদের মন রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত নয় অতএব জ্ঞান হয় না। ঠাকুর একথা নানাভাবে বুঝিয়েছেন যে, তিনি বাক্যমনের অতীত, মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। উপনিষদেও তাই বলা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে, এই মনের দ্বারাই তাঁকে জানতে হবে। সেখানে মন মানে শুদ্ধ মন। মনের অশুদ্ধ অবস্থা দূর করে শুদ্ধ করলে সেই মনের দ্বারা তাঁকে জানা যাবে। ঠাকুর বলছেন, তখন এই মন আর মন থাকে না, মন বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে আত্মা হয়ে যায়। শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ আত্মা। একে ঠাকুর বলেছেন বোধে বোধ হওয়া। বোধ মানে সেই ইন্দ্রিয় যার দ্বারা আমরা তাঁকে জানতে যাচ্ছি আর যিনি বোধ স্বরূপ দুই-ই তখন এক হয়ে যায়। এই বোধে বোধ হওয়া সহজসাধ্য নয় কিন্তু হতে যে পারে না এমন কথা নেই। তাই তারক বলছেন, 'জ্ঞানই বা হবে না কেন?'

তারপর তিনি বললেন, 'জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।' জ্ঞানী দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণী হলেন যাঁরা ব্যবহারিক জ্ঞান বিশিষ্ট, ব্যবহারকে লক্ষ্য করে যাঁরা চলেন, বিচার করেন। তাঁরা বলেন, ঈশ্বর আছেন, তা না হলে জগৎ সৃষ্টি কি করে হল? জগৎ জড় বস্তু, সে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করতে পারে না। কাজেই কোন চেতনের দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি হতেই হবে। আর যদি বলি জগতের সৃষ্টি হয়নি, নিত্য কাল এই জগৎটা আছে, তার উত্তর হচ্ছে, যা পরিবর্তনশীল তার আরম্ভ কোনো কালে নিশ্চয়ই আছে। সুরু আছে শেষও আছে। জগতের পরিবর্তনটা আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, দেখছি সব বস্তুই পরিবর্তনশীল। কাজেই জগৎ স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর জগৎ জড় বস্তু অতএব সে স্বপ্রকাশ হতে পারে না। সুতরাং জগৎ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে বা আপনা থেকে হয়েছে এরূপ বলতে পারি না। কোন

এই হল শুদ্ধ মনের পরিচয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলবে, আমি পারি না। বুদ্ধদেব বলেছেন যে, পারি না একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বলছেন, কেন পারবে না? বাসনা মনে আছে, মন থেকে তাকে ছেড়ে দাও। সাধারণ মানুষের মনের সঙ্গে শুদ্ধ-মন-বিশিষ্ট মানুষের মনের এই তফাৎ হল তাঁরা মনকে যদি একবার বলে দেন এই করতে হবে তো মন সেইটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

কিন্তু মনকে সেইরকম করে বশীভূত করতে না পারা পর্যন্ত মানুষ কি করবে? চেষ্টা করবে। কারণ বাসনার উৎপত্তি হয় সংস্কার থেকে, তার বিপরীত সংস্কার এনে বাসনাকে নিবৃত্ত করতে হয়। ভাল খাবার জিনিস পেলেই আনন্দ হয়, এটা সংস্কার হয়ে গিয়েছে। এই সংস্কারটা মনকে ভাল খাবার জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট করে। এখন, তার বিপরীত ক্রমে মনকে বোঝাতে হবে, না, এতে কোন কল্যাণ নেই। ঠাকুর তো এক কথায় বলে দিলেন, টাকাতে কি হয়? টাকাতে খাবার হয়, কাপড় হয়, একটা থাকবার জায়গা হয় কিন্তু ভগবান লাভ হয় না; অতএব টাকাকে তুচ্ছ করলেন। এইরকম ভাবে সমস্ত সুখকেই তুচ্ছ করলেন কারণ তাতে ভগবান লাভ হয় না। এই একটা বিচার, একটা উপায় বলে দিলেন।

তবে মানুষের কি এককথায় এটা হবে? তা হবে না। দীর্ঘকাল এই অভ্যাস করে যেতে হবে। করতে করতে তার মন এমন বশে আসবে যে, সে যা ইঙ্গিত করবে মন তাই পালন করবে। মনের উপরে প্রভুত্ব আসবে। এখন হচ্ছে মনের দাসত্ব। মন যা বলবে সেই হুকুম মেনে আমাদের চলতে হবে। মন আমাদের হাতের একটা যন্ত্র তা না হয়ে আমরা এখন মনের একটা যন্ত্র হয়ে গিয়েছি। মন যা বলছে আমরা তাই করছি। কিন্তু বিপরীত ক্রমে মনকে আমাদের বশে আনতে হবে তাহলে সেই মন হবে শুদ্ধ মন। তখন সেই শুদ্ধ মনে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্ভব হবে।

জিনিস আপনা থেকে হয় না। ব্যাকরণের ভাষায় কর্তৃকর্ম বিরোধ বলে একটা কথা আছে। নিজেকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ যে সৃষ্টি করবে সৃষ্টির আগে তার তো থাকা চাই। আমি যদি আমাকে সৃষ্টি করি তা হলে সৃষ্টির আগে আমার থাকা চাই। তা থাকলে আমার সৃষ্টি আর আমি কি করে করব? কাজেই এখানে বিরোধ। জগৎটার সৃষ্টি Nature-এর দ্বারা হয়েছে বলা হয়। Nature মানে স্বভাব। স্বভাব মানে কি? যা এমনি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কোন জিনিস এমনি হয় না। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। সুতরাং জগৎকে যদি কার্য বলি তাহলে জগতের এক জগৎ-কর্তা থাকা চাই অর্থাৎ ঈশ্বর থাকা চাই এবং সেই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান হওয়া চাই। তা না হলে এই বিরাট সুশৃঙ্খল জগৎ সৃষ্টি তিনি কিভাবে করলেন? এই হল একমত।

আর একমত বলবে, জগৎটা বাস্তব কি না বিচার করে দেখতে হবে, করলে দেখা যাবে জগৎ সত্য নয়। জগৎই যদি সত্য না হয় তাহলে তার সৃষ্টি কর্তাও সত্য নয়, মিথ্যা কর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কর্তাও মিথ্যা। মিথ্যা জগতের কর্তৃত্ব কিরকম? শঙ্কর বলেছেন, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ এইরকম। যে বন্ধ্যা তার পুত্র হয় না, পুত্র হলে তো সে বন্ধ্যাই নয়। কাজেই এই শব্দের মধ্যে ব্যাঘাত দোষ হচ্ছে। একটি আর একটিকে মিথ্যা প্রমাণিত করছে। জগৎটা যদি মিথ্যা হয় তাহলেও জগৎ কর্তৃত্বও মিথ্যা সুতরাং ঈশ্বরও মিথ্যা হয়ে গেল। এই মতে ঈশ্বর নেই। এখন এই মিথ্যা জগৎ নেই বলে যাঁরা সিদ্ধান্ত করেন তাঁদের সঙ্গে পূর্ব সিদ্ধান্তের ব্যবহারে কি পার্থক্য আছে? পার্থক্য এই যে, যখন জগৎ মিথ্যা তখন জগৎ-কর্তাও মিথ্যা। সুতরাং আমাদের কিছু করণীয় নেই। কিছু করণীয় যদি নেই তাহলে আমাদের দুঃখের নিবৃত্তি কি করে হবে? বলছেন, বুঝতে হবে দুঃখটাও মিথ্যা, তাহলে

আর করণীয় কিছুই থাকবে না। কিন্তু আমরা তা করতে পারি না, এই জ্ঞানকে ব্যবহারে লাগাতে পারি না। কাজেই আমাদের কাছে জগতের একটা অস্তিত্ব আছে এটা ধরে নিতে হবে। তাকে ব্যবহারিক সত্তা বলে ধরে নিতে হবে। তবেই আমরা এই জগতে ব্যবহার করতে পারব এবং ব্যবহার এমনভাবে করব যাতে এই জগতের বন্ধনটা আমাদের কেটে যায়। তখন বিচার করে করে দেখতে হবে এমন কোনো শক্তিমানের দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে যিনি অবশ্যই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, স্বপ্রকাশ, তবেই তাঁর পক্ষে জগৎসৃষ্টি সম্ভব। এটা জেনে লাভ কি হল? লাভ এই হল যে, তখন আমি তাঁর সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত তা দেখব। হয় বলব, আমি তাঁর অংশ, নয় বলব আমি আর তিনি বস্তুত পৃথক নই—ভক্তির ভিতর দিয়ে হোক বা জ্ঞানের ভিতর দিয়ে হোক, এই দুটি রূপেই আমরা তাঁর সঙ্গে অভিন্নত্ব অনুভব করব। তা করলে আমাদের বন্ধন ঘুচে যাবে। তাঁকে জানার পর এই হল দুটি উপায়। যে উপায়েই হোক আমাদের সৎ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

দেখা গেল বিচার করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যাচ্ছি সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে, বিচারকে নির্ভুল করতে হলে আমাদের রাগ দ্বেষ থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে। বিজ্ঞানের গবেষকরাও এই কথা বলেন, যদি আমাদের অনুসন্ধান পূর্বগ্রহের দ্বারা দুষ্ট হয় তাহলে সেই অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হয় না। সত্যকে জানতে হলে মনকে নিষ্পক্ষপাত করতে হয়। আমি অমুক জিনিসটা দেখতে চাই বললে সেই জিনিসটাই দেখা হবে, এটা হবে কল্পনা। অনেক সময় কিছুক্ষণ কল্পনা করার পর অন্ধকারে হঠাৎ সেই জিনিসটার মতো একটা কিছু দেখা যেতে পারে। কারণ দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে মন সেই জিনিসটাকে দেখাচ্ছে। যেমন একটা চাবি হারিয়ে গিয়েছে, দিনভর খুঁজেছি, পাইনি। কিন্তু স্বপ্নে

দেখছি চাবিটা পাওয়া গেল। কেন? না, চাবিটাকে পেতে হবে এই আকাঙ্ক্ষা মনকে একেবারে অভিভূত করে রেখেছিল। তাই স্বপ্নে দেখছি চাবি পাওয়া গেল। চাবিটা কিন্তু সত্যি সত্যি পাওয়া গেল না। চিন্তা আমাদের মনকে কিভাবে প্রভাবিত করে এইটুকু বোঝা গেল। কাজেই মানুষের মনে যদি পূর্বগ্রহ থাকে, **prejudice** থাকে **for or against** স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক, তাহলে বিচার কখনও নির্দোষ হবে না। তাই বিচারকে তত্ত্ব নির্ণয়ের উপযোগী করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ বিমুক্ত করতে হয়। সবরকম **prejudice, bias** থেকে মুক্ত হতে হয়। জ্ঞানীর পক্ষে এটা আরও সূক্ষ্মভাবে সত্য। কারণ তিনি গভীরতর তত্ত্ব অন্বেষণের প্রয়াস করেন। কাজেই তাঁর মনকে আরও সূক্ষ্ম, শুদ্ধ করতে হয়। কেবল কাজ চালানোর মতো করলে হয় না। মনকে এমন শুদ্ধ করতে হবে যে রাগদ্বেষের তরঙ্গ আর উঠবে না নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতো। তাহলে সে সঠিক তত্ত্বকে ধরিয়ে দেবে। মনকে এইভাবে ব্যবহার করতে সাধারণ মানুষ পারে না, জ্ঞানী পুরুষেরাই পারেন। এইজন্য তাঁরা যা জানতে চান তাঁদের মন তক্ষুণি তা ধরে দেয়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ। মন এমন সূক্ষ্ম হয়েছে যে, যেখানে মন দেবে সেই জিনিসটিই প্রকাশিত হবে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য গবেষণা করে, চেষ্টা করে বার করতে হয় কিন্তু শুদ্ধমনা ব্যক্তি যেদিকে মনঃসংযোগ করেন সঙ্গে সঙ্গে সেই তত্ত্ব তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়। সে মনের আরও বিশেষত্ব হচ্ছে তত্ত্বের দিকে তার যে গতি তা ধীরে ধীরে নয় একেবারে সোজা।

স্বামী শুদ্ধানন্দ একবার স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে উদ্বোধন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করলে তিনি তেমন আগ্রহ দেখান না। দুবার তিনবার বলবার পর একদিন শিবানন্দ মহারাজ বললেন, তুমি বারবার বলছ, আমিও ভেবেছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দেখি

লিখতে গেলে একেবারেই সিদ্ধান্ত এসে যায়। তখন আর লেখা হয় কি করে? পূর্বপক্ষ অর্থাৎ তার বিপরীত কল্পনা মনে এলে তারপর বিচার করে সেই কল্পনাকে খণ্ডন করে তত্ত্বে পৌঁছতে হয়, এ না হলে লেখা হয় না। কিন্তু যে মন শুদ্ধ সেই মনে পূর্বপক্ষ আসে না। কোন সংশয় যখন আসে না তখন তার নিরসন করবে কি করে? সাধারণ মনের সঙ্গে শুদ্ধ মনের এই পার্থক্য। ঠাকুরের শুদ্ধমন। যা বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে তা একেবারে সামনে প্রতিভাত হয়েছে। উপনিষদে আছে, 'স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি···অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি।' (ছা. ৮. ২. ১-২)—তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। আবার যদি তিনি মাতৃলোক কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্পমাত্রই মাতাগণ তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হন।

—এইরকম তিনি যা চাইবেন সঙ্গে সঙ্গে মন তা উপস্থিত করে দেবে। মন শুদ্ধ হলে আর বিলম্ব নেই, কোন প্রক্রিয়া করবার কিছু নেই সোজা তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছয়। শুদ্ধমনের ফল এই।

সেই শুদ্ধমন লাভ করবার পথ কঠিন, বন্ধুর, অনেক প্রযত্ন সাপেক্ষ। চেষ্টা যদি নিশ্ছিদ্র ঐকান্তিক হোত, মনকে যদি একাগ্রভাবে কোনোদিকে নিযুক্ত করা যেত তাহলে আর বিলম্ব হোত না সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধি আসত। তা হচ্ছে না বলে আমাদের এত বিলম্ব, তবে সাধনের দ্বারা এসব একেবারে সহজ সুলভ বস্তু হয়ে যায়।

পরিশিষ্ট—(২)

ভক্তমণ্ডলীর পূর্ণ বৈরাগ্য ও শরণাগতি

পরিশিষ্টের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দুটি জিনিস পাচ্ছি। একটি তীব্র বৈরাগ্য, সংসারে বিতৃষ্ণা আর দ্বিতীয়টি শরণাগতি—অনন্যচিত্তে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। জ্ঞান ভক্তি নিয়ে তর্কবিচার করতেন যে নরেন্দ্র, সে নরেন্দ্র আর নেই। এখানে নরেন্দ্র ভক্ত যিনি সম্পূর্ণরূপে গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁকে জানতে চান না, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করতে চান না, কেবল তাঁর করুণা ভিক্ষা করছেন, যাতে সংসারে মন আসক্ত না হয়, তাঁর পাদপদ্মে অচলা ভক্তি আসে। নরেন্দ্রের মনে এখন পূর্ণ বৈরাগ্য, তাঁর একমাত্র কাম্য ভক্তি। পরবর্তীকালে উপদেষ্টারূপে, গুরুরূপে, বক্তারূপে যে নরেন্দ্রকে পাই তিনি আর এক নরেন্দ্র। ঠাকুর বলেছেন, নরেন্দ্রের ভিতরে ভক্তি, বাইরে জ্ঞান। তিনি ভক্তিকে জ্ঞানের আবরণে আড়াল করে রেখে উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তি বিহ্বলতা মনে এলে আর তাঁর পক্ষে গুরু বা উপদেষ্টারূপে উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য নরেন্দ্র কোনক্রমে নিজেকে সংযত রেখে, ভক্তিভাবকে জ্ঞানের বহিরাবরণে আবৃত করেছেন। তিনি অন্তরঙ্গদের কাছে বলেছেন, ভক্তির ভাব এলে আমি এত বিহ্বল হয়ে যাই যে আর তখন কোনো কথাবার্তা চলে না। এইজন্য আমি ভক্তিকে চাপা দিয়ে রেখে জ্ঞানের কথা বেশি বলি। ঠাকুর বলেছেন, নরেন শিক্ষা দেবে। তাই ঠাকুরের আদেশে নরেন যেন তাঁর ভিতরের ভক্তিভাবকে দাবিয়ে রেখে উপদেষ্টারূপে জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। এ যেন গুরুর আদেশ পালন করবার জন্যই করা,

অন্তরের প্রেরণাবশতঃ নয়। অন্তরে তিনি একটি শিশুর মতো যিনি এক ভগবান ছাড়া আর কিছু জানেন না, ইষ্ট বা গুরু ছাড়া যাঁর অন্য জ্ঞান নেই। তাঁর প্রাণমন আত্মা গুরু পাদপদ্মে সমর্পিত হয়েছে। এখানে নরেন্দ্রের যে রূপটি ফুটে উঠেছে তা অন্যত্র দুর্লভ, এর কারণ আগেই বলেছি।

একটি চিঠিতে নরেন্দ্র জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে 'প্রিয় জো' বলে সম্বোধন করে লিখছেন, আমার ভিতরে যে গুরু ছিল, উপদেষ্টা, কর্তা, নেতা ছিল, সে এখন মৃত। এখন আমি আর গুরু উপদেষ্টা নই, কর্তা, নেতা নই, আমি সেই দক্ষিণেশ্বরের বালক যে ঠাকুরের পাদপদ্মে বসে নিবিষ্ট মনে তাঁর কথা শুনত আর তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে থাকত। নরেন্দ্রের যে রূপটি অপ্রকাশিত সেই রূপটি অর্থাৎ তাঁর শিশুসুলভ শরণাগতির ভাবটি ঐ চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য কোনটি তাঁর আসলরূপ এটি বলা কঠিন, কারণ তাঁর ভিতরে যখন যে রূপের প্রকাশ হচ্ছে তখন সেই রূপেরই পরাকাষ্ঠা দেখা যাচ্ছে, যেমন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে দেখা যেত। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি ভাবে তদ্গত চিত্ত হয়ে কথা বলছেন তখন সেই ভাবটি যেন সমস্ত দেহ মনে ফুটে উঠছে। আবার যখন জ্ঞানের কথা হচ্ছে তখন যেন বেদান্ত সিংহ। সিংহ বিক্রমে বেদান্তের কথা বলছেন আর সব তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। দুটি ভাব সাধারণের দৃষ্টিতে আপাত বিরোধী বলে মনে হলেও মহাপুরুষদের জীবনটিই সবসময় আপাত বিরোধী ভাবের সমন্বয় রূপ। যখন যে ভাব তাঁদের দেহমনকে আশ্রয় করে তখন সেই ভাবে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হয়ে যান। দুটি জিনিসকে একসঙ্গে এনে পরস্পরের বিরোধ দেখে বিচার করে কোনটি শ্রেষ্ঠ কোনটি নিকৃষ্ট এ ভাবতে গেলে আমরা মহাপুরুষদের জীবনের মূল সূত্রটি হারিয়ে ফেলব। তাঁরা যখন যে ভাব প্রকাশ করেন সে ভাবটিকে সম্পূর্ণ দেহমন দিয়ে প্রকাশ করেন,

আংশিক ভাবে নয়। এই সম্পূর্ণ তন্ময়তাই সমস্ত সাধনের পরাকাষ্ঠা। ঠাকুর একেই বলেছেন, মন মুখ এক হওয়া। আমাদের কাছে দুটি ভাব পরস্পর বিরোধী। আমরা একটির কথা ভাবলে অপরটির কথা ভাবতে পারি না। ঠাকুর যখন যে সাধন করছেন তখন সেই সাধনের সঙ্গে সমঞ্জস্য যা কিছু তারই অনুষ্ঠান করছেন, যখন তিনি জ্ঞানী তখন তাঁর কাছে জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নেই। আবার যেখানে ভক্ত সেখানে তাঁর কায়-মন সমস্ত শ্রীভগবানে অর্পিত। সেখানে, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। আমি কিছু নই, তিনি তিনি—এই ভাব দেখতে পাই। যখন পূর্ণরূপে এক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন অন্যভাব থাকেই না। সাধারণ মানুষের জীবনে জ্ঞান বা ভক্তি এর যে কোন একটির রূপায়ণেই পূর্ণ সার্থকতা এসে যায়, অপরটির কথা ভাববার আর দরকার হয় না ; কিন্তু যিনি জগদ্‌গুরু হবেন, সকল মানুষের ভাব তাঁর ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট না হলে তিনি জগদ্‌গুরু হতে পারবেন না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তও বটেন, জ্ঞানীও বটেন। আবার তাঁর ভক্তির ভিতরেও কত বিচিত্রতা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই প্রত্যেকটি ভাব তাঁর কাছে পরিপূর্ণ। আপাতত মনে হয় যে এই ভাবগুলির একটি একটি করে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে যেতে হয় কিন্তু তা নয়। প্রত্যেকটি ভাবই মানুষকে সেই চরম তত্ত্বের আস্বাদন করিয়ে দিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এটি আমরা বিশেষভাবে দেখছি। ভক্তিশাস্ত্রেও একথা বলা হয়নি যে হনুমান দাস্যভাব আস্বাদন করবার পর আবার বাৎসল্য, সখ্য বা মধুরভাব আস্বাদন করতে গিয়েছেন। দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতর দিয়ে হয়েছে এবং তাতেই তিনি পরম চরিতার্থতা লাভ করেছেন। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সব ভাব সম্পর্কে এরকম বলা যায়। প্রত্যেকটি ভাবই মানুষকে চরম সার্থকতা এনে দিতে পারে।

নরেন্দ্র সেইজন্য বলেন, যখন তিনি জ্ঞানী আর যখন তিনি ভক্ত

এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ একটি যখন আছে তখন অপরটি নেই। ঠাকুরের জীবনে যেমন আমরা দেখতে পাই তিনি কীর্তন করছেন, নৃত্যগীতে আত্মহারা বিহ্বল হয়ে পড়ছেন, মুহুর্মুহু সমাধি হচ্ছে। এই শ্রীরামকৃষ্ণও যেমন সত্য আবার সম্পূর্ণ জ্ঞান সূর্যরূপে যে শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি জগৎকে তুচ্ছ করছেন তিনিও তেমনি সত্য। 'নাহং নাহং' যিনি বলছেন তিনি যেমন সত্য, তেমনি 'সোঽহং সোঽহং' যিনি বলছেন তিনিও তেমনি সত্য। একটিকে অনুসরণ করে তার সামান্য অংশও আমরা জীবনে প্রকাশ করতে পারি না অথচ কোনটি বড় কোনটি সত্য বিচার করতে যাই যেন সবগুলিকে পরীক্ষা করবার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে। ঠাকুরের কথা, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে জানবার কি দরকার, এক গ্লাসেই তো হয়ে যায়। এখানে নরেন্দ্রও তাই বলছেন, 'তুই কীটস্য কীট, তুই তাঁকে জানতে পারবি!' অর্থাৎ তুমি ক্ষুদ্র আধার, তোমার যে ভাব দিয়ে ভগবানকে বুঝতে চেষ্টা করছ সেই আধারটুকু একটুখানি ভাবেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়, কাজেই জ্ঞানী বড় কি ভক্ত বড় এসব বিচারে তোমার কি দরকার? যে কোন ভাবের দ্বারাই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা আসতে পারে, ঠাকুর এই কথাটি বারবার বলেছেন। তাই ঠাকুরের ভাবকে যে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে তার কাছে জ্ঞানী বড় না ভক্ত বড় এটি অবান্তর প্রশ্ন। কারণ আমার যেটুকুতে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। একটা বাটি কি সমুদ্রকে মাপতে পারে? তার আধারটা ভরে গেলেই হল। সেইরকম জ্ঞানী অথবা ভক্ত যে পক্ষ থেকেই তাঁকে বিচার করতে, আস্বাদন করতে যাই তখন এমনি বাটির পরিমাপ দিয়েই সমুদ্রকে বিচার করি। তিনি অসীম তাঁর পরিমাপ করতে জ্ঞানী ভক্ত কেউ পারে না। জ্ঞানী বুদ্ধিবিচারের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, ভক্ত তাঁকে ভাবনার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা আস্বাদন করতে

চেষ্টা করে। তফাৎ এইটুকুই। কিন্তু তিনি যেমন জ্ঞানস্বরূপ তেমনি প্রেমস্বরূপও। যেদিক দিয়ে বিচার করি তাঁর স্বরূপের কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং জ্ঞান কিংবা ভক্তি যে ভাবেই আমরা তাঁকে আস্বাদন করি না কেন তাঁকেই আস্বাদন করছি। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ভক্তি করে মনটা একটু শুদ্ধ হবে যখন, তখন সেই শুদ্ধ মন দিয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবব। এটি ভুল ধারণা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' করে যে তত্ত্বকে আস্বাদন করতে পারব, 'আমি তোমার দাস'—এই ভাব দিয়েও সেই তত্ত্বকেই আস্বাদন করব এবং তাতে আস্বাদনের পরিমাণের কোন পার্থক্য হবে না, অপূর্ণতাও থাকবে না।

এখানে নরেন্দ্রকে প্রসন্ন বলছেন, 'তুমি বল্‌ছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই তো বল চার্বাক আর অন্যান্য অনেকে বলে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে।' আপাত দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের ভাষণগুলি বিচার করে দেখলে মনে হয় একটির সঙ্গে আর একটির কোথাও কোথাও অসামঞ্জস্য রয়েছে। যারা ভাসাভাসা দেখতে চায় তারা এর মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। আর যারা সম্পূর্ণভাবে সেই ভাবে বিলীন হতে চায় তারা ওসব বিচার না করে এর মধ্যে কোনো একটি ভাবকে জীবনে পরিপূর্ণ করবার চেষ্টা করে। কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা ত্যাজ্য কোনটা গ্রাহ্য—এগুলি হচ্ছে বিচারের কথা। এইরকম বুদ্ধি দিয়ে খতিয়ে দেখাকে ঠাকুর অবজ্ঞা করতেন। থুথু ফেলে বলতেন এসব তুচ্ছ। আসল কথা, নিজের ভাবে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে ব্যক্তি-আমিটি-কে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে বিলীন করে দেওয়া। এ ভক্তির ভাবে যেমন সম্ভব তেমনি জ্ঞানীর ভাবেও সম্ভব। সম্ভাবনা দু জায়গাতেই সমান রয়েছে। কেবল যে যে ভাব আশ্রয় করে চলতে সুবিধা বোধ করে তার জন্য সেই ভাবের ব্যবস্থা। পূর্ণজ্ঞানী আর পূর্ণভক্তের ভিতর কোনো পার্থক্য নেই। গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগে এই কথাই

বলা হয়েছে। সেখানে ভক্তের লক্ষণ আর জ্ঞানীর লক্ষণ একই। উভয়ে একই বস্তুর আস্বাদন করেন তবে প্রকার পদ্ধতি ভিন্ন। কিন্তু একথা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, ভগবানের কোন সীমা নেই, তিনি বাক্য মনের অতীত। বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরতে পারি না, তিনি অসীম, অনন্ত। এ বিষয়ে জ্ঞানী এবং ভক্তের মধ্যে মত পার্থক্য নেই। কেবল ভক্ত তাঁর ক্ষুদ্র আমিকে তাঁতে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন আর জ্ঞানী তাঁর আমিকে ক্ষুদ্রত্ব থেকে মুক্ত করে অসীমের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যেতে চাইছেন। জ্ঞানী নিজেকে বিস্তার করছেন আর ভক্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁতে নিজেকে বিলীন করছেন। উভয়েরই চরম উদ্দেশ্য হল তাঁদের খণ্ড সত্তাকে সেই অনন্ত সত্তায় মিশিয়ে দেওয়া। 'নেহ নানস্তি কিঞ্চন'—তিনি ছাড়া জগতে আর কিছু নেই তিনিই সর্বত্র ওতপ্রোত। আমিও তাঁরই একটি রচনা, তাঁরই একটি খেলার পুতুলের মতো। ভক্তের সত্তা তাঁতে বিলীন আবার জ্ঞানীর সত্তাও তাই। বিশেষ করে এই ভাবটি এখানে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

মাস্টারমশাই এখানে এই দুটি ভাবের সামঞ্জস্যের কথা বিশেষ বলেননি, তিনি নরেন্দ্রের ভক্তি ভাবটিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। আসল কথা মাস্টারমশায় জ্ঞানী নন, ভক্ত। এক একজন এক একটি বিশিষ্ট ভাব অনুসারে পরমতত্ত্বকে দেখে। শেষে সে যখন পরম তত্ত্বে পৌঁছয় তখন যে অন্য পথে সেই তত্ত্বে পৌঁছেছে তার সঙ্গে আর কোন প্রভেদ থাকে না। ভগবান অসীম, অনন্ত প্রেমস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—এই বিষয়ে ভক্তের সঙ্গে জ্ঞানীর ভিন্ন দৃষ্টি নেই। কেবল তাঁদের সাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন এবং ভিন্ন প্রণালীর ভিতর দিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। ভাষার প্রভেদের দ্বারা তত্ত্বের প্রভেদ হচ্ছে না। তত্ত্ব এক এবং অবিসংবাদী। এইটুকুই বিশেষ করে এখানে বুঝবার মতো।

কথামৃতের মর্মকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যেখানেই থাকুন সর্বদাই ভক্তদের সঙ্গে ভগবদ্ প্রসঙ্গের আলোচনা হোত। কেউ কেউ সেই প্রসঙ্গগুলির কিছু সংক্ষিপ্ত নোট নিয়ে রাখতেন। তাঁদের ভিতরে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ একজন। তখন তাঁর নাম তারক। তিনি একদিন Note নিচ্ছেন, ঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন, ওরে, ওসব তোর করতে হবে না ; ওর জন্যে লোক আছে। তখন কে যে লোক আছে তা কেউ জানত না। এইটুকু বোঝা গেল যে তাঁকে করতে হবে না। মাস্টারমশাই, যিনি 'কথামৃতে' শ্রীম বলে বিখ্যাত, তিনি ঠাকুরের কথাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত note রাখতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই note-গুলি নিয়ে পরে মনে মনে চিন্তা করবেন। শ্রীম অতিশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। শুধু শুনে তাঁর তৃপ্তি হোত না, কথাগুলি নিয়ে মনন করবেন বলে লিখে রাখতেন। তাঁরই ডায়েরীতে এই নোটগুলি যথাসম্ভব সংগৃহীত ছিল। বলা বাহুল্য ডায়েরীতে যা সংগৃহীত ছিল সেগুলি অতি সংক্ষিপ্ত আকারের। এত সংক্ষিপ্ত যে অপরে সেই ডায়েরী পড়লে কিছু বুঝতে পারবেন না। এই সংক্ষিপ্ত আকারের নোটগুলি তাঁর নিজের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি অবসর সময়ে নোটগুলি নিয়ে বসতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করে মনে মনে সেই দিনের কথাগুলিকে ভাবতেন। এক কথায় ঐগুলি তাঁর ধ্যানের সহায়ক ছিল। ধ্যান করতে করতে সেদিনের সমস্ত চিত্রটি যখন চোখের সামনে ভেসে উঠত তখন তিনি কলম ধরতেন এবং সেদিনের ঘটনাগুলি লিখতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি যে কত অসাধারণ ছিল তা তাঁর কথামৃতের লিখনভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রত্যেকটি ঘটনাকে যেন চোখের সামনে দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাই যখন আমরা এই কথামৃতের আলোচনা করি তখন অনেক সময় বলি যে, সেই দিনের ঘটনাটি আমরাও যেন ধ্যানের মধ্যে আনতে চেষ্টা করি। তাহলে

তার ভিতরে নূতন আলোক, নূতন রস পাব এবং জীবনে তা আরও বেশী কার্যকর হবে। মাস্টারমশাই এইভাবেই এই প্রসঙ্গগুলি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা ঠাকুরের কাছে যেতেন তাঁরা কেউ কেউ জানতে পেরে দেখতে চাইলে মাস্টারমশাই তাঁদের কাকেও কাকেও পড়ে শুনিয়েছেন। তাঁরা বললেন, এগুলি প্রকাশ করা দরকার, এতে জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। মাস্টারমশাই কিন্তু তাতে নারাজ। তিনি বলেছিলেন, এগুলি আমার নিজের জন্য লেখা, আমার দেহ যাবার পরে তোমরা যা ইচ্ছা হয় করবে। কিন্তু পরে সকলের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে তিনি ঐ লেখা প্রকাশ করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। পরে তা কথামৃত রূপে যখন প্রকাশিত হল তখন তা স্বামীজীর কাছ থেকে অজস্র উৎসাহ পেল। স্বামীজীর সেই প্রশংসা বাক্যগুলি কথামৃতের ভূমিকাতে উল্লিখিত রয়েছে। শ্রীশ্রীমাও বলেছেন, কথামৃতের লেখাগুলি শুনলে মনে হয় যেন ঠাকুর সামনে বসে বলছেন। স্বামীজী বলেছেন, কথামৃতের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে জগতে কখনও কোন মহাপুরুষের কথাগুলি এমন অবিকৃত ভাবে সংগৃহীত হয়নি। কারণ আগে যেসব সংগ্রহ হয়েছে সেগুলি যিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে। এখানে মাস্টারমশাই নিজেকে যেন সম্পূর্ণ গুপ্ত রেখে গ্রন্থকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব এসে ঠাকুরের চিন্তাধারাকে কোনরূপে বিকৃত করতে পারেনি। স্বামীজী আরও বলেছিলেন, প্লেটো সক্রেটিসের যে জীবনী লিখেছেন সেটি হচ্ছে **Plato all over**, সব জায়গাতে প্লেটোই ফুটে উঠেছেন। সক্রেটিসের চেয়ে সেখানে প্লেটোরই কিন্তু প্রাধান্য। কথামৃতকার নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মধ্যে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব এসে ঠাকুরের ভাবকে যেন বিন্দুমাত্র ব্যাহত না করে, এই ভাবে তিনি কথামৃতকে ভক্তসমাজে

উপস্থাপিত করেছেন। এইজন্যই এইটি একটি অমূল্য সম্পদ। কথাসাহিত্যের দিক দিয়েও এটি অসাধারণ সৃষ্টি। এই অসাধারণ কথামৃতের অসামান্যতার পরিচয় দিন দিন আমরা আরও বেশী করে পাচ্ছি। যখন বেরিয়েছিল তখন হয়তো দুচারজনকে এটি প্রভাবিত করেছে, কিন্তু আজ কথামৃত সমস্ত বিশ্বের মানবকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করছে। বিভিন্ন ভাষায় কথামৃত অনূদিত হয়েছে, ফলে যাঁরা বাংলা জানেন না তাঁরাও এই কথামৃতের রস আস্বাদন করতে পারছেন এবং যাঁদের কাছে এই কথাগুলি পৌঁছচ্ছে তাঁদের ভিতরে যদি কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক পিপাসা থেকে থাকে তাহলে সেই পিপাসা যেন শতগুণে বেড়ে যাচ্ছে। এই হল কথামৃতের বৈশিষ্ট্য। ভাগবতে আছে, —'ভগবৎকথা স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—যত আলোচনা করা যাবে তত তার ভিতরে ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর স্বাদ পাওয়া যাবে। কথামৃতের বৈশিষ্ট্যও অনুরূপ। কেউ কেউ বলেন, কথামৃত পড়েছি। কতটা পড়েছ। কিছু কিছু পড়েছি। আমি বলি, কেন, ভাল লাগেনি বুঝি? কারণ এ এমন এক অপূর্ব জিনিস যা পড়লে আর খানিকটা পড়ে ছেড়ে দেওয়ার কথা নয়।

এ সম্বন্ধে 'লৌহ-কপাট' গ্রন্থ-প্রণেতা জরাসন্ধ তাঁর একটি ভাষণে একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। আসানসোল আশ্রমে ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমি তো বক্তা নই, আমি গল্প লিখি। তাই আপনাদের কাছে একটি গল্প বলব। যে গল্পটি বললেন তা একটি দুর্দান্ত কয়েদী মেয়ের কাহিনী। মেয়েটিকে কেউ সামলাতে পারে না, কয়েদীদের ভিতর তার খুব বদনাম। জরাসন্ধ সেখানে জেলর ছিলেন। ভাবলেন, দেখি না মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ করে। আলাপ করতে গেলে মেয়েটি কথায় কথায় একেবারে গর্জন করে ওঠে। তিনি মেয়েটিকে বললেন, মা, তুমি একটা বই পড়বে? সে বললে, বই

আবার কি পড়ব? আপনাদের বই মানেই তো নীতিকথার ঝুড়ি, নীতিকথা আমি চাই না। ও অনেক জানি। তিনি বললেন, না, না, খুব সুন্দর বই, গল্পের ভিতর দিয়ে কথা। 'আচ্ছা, দেবেন, দেখব।' তিনি লাইব্রেরী থেকে একখানি কথামৃত তাকে দিয়েছিলেন। তারপর মেয়েটি কথামৃত পড়ছে। কিছুদিন পর ওয়ার্ডেনদের ভিতর যারা লাইব্রেরীতে কাজ করে তারা কথামৃতটি ফেরৎ আনতে গেলে মেয়েটি সে বই আর কিছুতেই ফেরৎ দেবে না। তারা জোর করেছে, বুঝিয়েছে কিন্তু মেয়েটি তীব্র আপত্তি জানায়, না, আমি ফেরৎ দেব না। জরাসন্ধ জেলর বলে ওঁকে ওরা বলল, মেয়েটি কথামৃত কিছুতেই ফেরৎ দিচ্ছে না। তখন উনি নিজে গেলেন। বললেন, কি মা, তোমার এখনও বইখানি পড়া হয়নি বুঝি? সে বললে, সব বই কি পড়া হয়ে যায়? জরাসন্ধ বললেন, তখন বুঝলাম কেন মেয়েটি বই ফেরৎ দিচ্ছে না। প্রথমে ভেবেছিলেন বইটি সে কোথাও অনাদরে ফেলে রেখেছে তাই দিচ্ছে না। যখন বললে সব বই কি পড়া হয়ে যায়, তখন উনি বুঝলেন। তাকে বললেন, আমি তোমাকে আর একখানি বই কিনে দেব। তোমার কাছেই রাখতে পারবে। বলে তিনি তাকে একখানি কথামৃত কিনে দিলেন। তখন মেয়েটি লাইব্রেরীর বই ফেরৎ দিল।

এখন, এই যে কথা, 'সব বই কি পড়া হয়ে যায়'—এই কথাটিই চিন্তা করবার জিনিস। কথামৃত পড়া কখনও হয়ে যায় না। আরম্ভ করলে ক্রমশ তার ভিতর থেকে নানা দিক দিয়ে নূতন নূতন রস আবিষ্কৃত হয়। যাঁরা সাহিত্যিক তাঁরা এর মধ্যে সাহিত্যের স্বাদও পাবেন। আর যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চান তাঁদের তো কথাই নেই। কথামৃতের বৈশিষ্ট্য হ'ল তা কখনও পুরানো হয় না। শাস্ত্রে পুরাণ কথাটির অর্থ হচ্ছে, 'পুরা অপি নব এব'—যা পুরানো হয়েও নূতন, নিত্যই নূতন।

যত দিন যায় ততই যেন নূতন মনে হয় তাই এ হল পুরাণ। যারা কথামৃত খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েন তাঁরা নিশ্চয় এটি অনুভব করেছেন। যতবার পড়া যায় ততবার তা নূতন রূপে প্রতিভাত হয় তাই কথামৃত কখনও পুরানো হয় না।

তাছাড়া এর রচনাভঙ্গী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেভাবে কথা বলে, যেভাবে চিন্তা করে হুবহু সেইরকম ভাবে কথাগুলি পরিবেশিত। ঠাকুর নিজে কথাগুলিকে খুব পাণ্ডিত্যের প্রলেপ দিয়ে বিকৃত করতেন না, সাদা মাটা ভাষায় কথা বলতেন। এইজন্য কথাগুলি সোজা মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করত আর এইজন্যই বোধহয় এটি সর্বজন-সমাদৃত। দার্শনিকেরা এর মধ্যে দার্শনিক রস আবিষ্কার করেছেন, সাহিত্যিকরা পাচ্ছেন সাহিত্যরস, আর যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, তাঁরা এর ভিতরে পাচ্ছেন গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান। অনেক জটিল বৈষয়িক সমস্যাও ঠাকুর অদ্ভুতভাবে এক একটি কথায় কি ভাবে সমাধান করে দিয়েছেন ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সর্বজনের কাছে কথামৃতের এত সমাদরের কারণ হল এই। জ্ঞানী-ভক্ত পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই জন্য আকর্ষণীয় বস্তু এর মধ্যে আছে, যেন অমৃতের খনি। দিন দিন কথামৃতের প্রভাব চারিদিকে এত ছড়িয়ে পড়ছে যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। জগতের বড় বড় মনীষী যাঁরা, জগৎ চিন্তায় যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরা এই কথামৃতের সাদা মাটা কথা দেখে, গ্রাম্য ভাষায় পরিবেশিত ভাবের গাম্ভীর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। ভগবান যখন কথা বলেন শুধু পণ্ডিতের জন্য কথা বলেন না, কোন গোষ্ঠীর জন্যও বলেন না, সকলের জন্য বলেন। কথাগুলি নূতন কিনা এ প্রশ্ন নয়, পুরানো হয়েও নূতন।

গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।' (৪/৩)—আমি সেই পুরাতন যোগের কথাই

তোমাকে বলছি। ভগবান যেমন নিত্য পুরাতন তেমনি তাঁর কথা সবই পুরানো কিন্তু পুরানো মানে অব্যবহার্য নয়, সর্বদাই তা আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু। এইজন্যই বলা হল পুরাতন হয়েও নূতন। কথামৃতও পরিবেশিত হয়েছে সম্পূর্ণ অনলংকৃত রূপে। ঠাকুরের কথাকে এখানে অলংকৃত করা হয়নি, তাঁর যেমন স্বাভাবিক রূপ, স্বাভাবিক সৌন্দর্য সেইভাবেই শ্রীম কথামৃতকে পরিবেশন করেছেন। কথামৃতের বৈশিষ্ট্য হল এইটিই।

তাছাড়া কথামৃতে ঠাকুরের যে সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া যায় সেগুলি একদিক দিয়ে যেমন প্রবল যুক্তি দ্বারা সমর্থিত, আর একদিক দিয়ে তেমনি বিশ্বাসী লোকের কাছে অনায়াসে গ্রহণযোগ্য। সকলেরই এগুলি যেন অন্তরের কথা, সকলে যেন এই কথাগুলিই খুঁজছিল। আমাদের অন্তর যে বস্তুগুলিকে চাইছে অথচ যেন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারছে না, সেই আমাদের চিরকালের অব্যক্ত চাওয়াই যেন রূপ পেয়েছে কথামৃতের ভিতর। এইজন্য এর এত সমাদর। ভাষা এত সরল যে সকলে বুঝতে পারে। প্রসাদগুণ বলে যদি কোন গুণ থাকে, এর ভিতরে তা পরিপূর্ণরূপে আছে। কোন জায়গায় কোন অস্পষ্টতা দুর্বোধ্যতা নেই বুঝতে কোন পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, সকলেই বুঝতে পারে। আবার তেমনি যিনি পণ্ডিত তাঁরও যে বস্তুটি অন্বেষণের বিষয়, যাকে হয়তো তিনি খুঁজছেন কিন্তু ধরতে পাচ্ছেন না, এই প্রায় নিরক্ষর ব্যক্তিটির ভাষায় তাঁর অন্বিষ্ট বস্তুটিই যেন ফুটে উঠেছে। তাই আমরা অনেক সময় ভাবি যে এই যুগটিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ বলা যায় তেমনি এটিকে কথামৃতের যুগও বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবরূপী হয়ে এই কথামৃতের ভিতরে ছত্রে ছত্রে নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছেন। এইজন্য কথামৃতের এত সমাদর।

আমরা দীর্ঘকাল ধরে সেই কথামৃতের ধারাবাহিক আলোচনা করে

আসছি। যখন আমি বেলুড় মঠে ছিলাম তখন থেকেই এই কথামৃতের আলোচনা আরম্ভ করেছি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেই কথামৃত চলছে, দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়েছে। কথামৃত পঞ্চম ভাগ অবধি প্রকাশিত হয়েছে। মাস্টারমশাই-এর কথায় জানা যায় তিনি যদি আরও কিছুদিন স্থূল শরীরে থাকতেন তাহলে আরও অনেক তথ্য আমরা পেতাম তাঁর গ্রন্থ থেকে। কিন্তু ঠাকুরের হয়তো তা ইচ্ছা নয়। তিনি তাঁর সন্তানকে তাঁর পাদপদ্মে ডেকে নিয়েছেন, কাজেই এখন আর কথামৃতের প্রস্রবণ ঐভাবে উৎসারিত হবে না। কিন্তু যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা অপ্রতিহত গতিতে চলবে, দিকে দিকে প্রাণে প্রাণে তা প্রসারিত হবে। যুগে যুগে তার আরও সমৃদ্ধি হবে। দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় কথামৃত অনূদিত হচ্ছে এবং হবে। আশ্চর্যের বিষয় আপনারা শুনে আনন্দ বোধ করবেন, জাপানে,—যেখানে অধিকাংশ লোক ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, বাংলা ভাষার তো কথাই নেই, সেখানেও কথামৃতের প্রসার দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। ইংরাজী থেকে ভাষান্তরিত হয়ে জাপানী ভাষায় তা প্রচারিত হয়েছে এবং জাপানে মানুষের মনকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে যে দেখে অবাক হতে হয়। আমার, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী—যাঁরা জাপানে আছেন তাঁদের সঙ্গে জাপানীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলতে পারি। বছরে বছরে তাদের আগ্রহে আমি জাপানে যাই, কিছুদিন করে থাকি তাদের সঙ্গে। এইসব প্রসঙ্গ করি, তাদের আগ্রহ এত দেখে অবাক হতে হয়।

আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রচার করছি। কিন্তু অবতার যখন আসেন, অবতার শব্দটি বলতে যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে বলব যে এই অসাধারণ বিভূতি এইরকম ভাবে যখন প্রকাশিত হন, তখন তাঁর ভাবধারা কি করে চারিদিকে বয়ে যায় তা আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতেও আমরা বুঝতে

পারি। যেমন অনেক সময় আমরা দেখি কোন একটা সূত্র একটা ভাব এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় প্রচারিত হয়, এখানে যেন সেরকম কোন একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, আপন বেগে ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কারও চেষ্টা কারও কৃতিত্ব এর ভিতরে নেই, আপনিই সেই ভাব চলে যায়, প্রসারিত হয় চারিদিকে। তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে মানুষের এই ভাবের বড় প্রয়োজন। যে মানুষ সংসারে নানা তাপে তাপিত, নানারকম সমস্যা জর্জরিত, পরিত্রাণের সকল পথ যার কাছে রুদ্ধ, অন্তর যার পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল, তার কাছে ভগবানের এইভাব কোন না কোনরকমে এসে পৌঁছাবেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা—এখানে তো সাইনবোর্ড দেওয়া হবে না, বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করা হবে না যে 'এখানে ঈশ্বরীয় কথা আলোচনা হয়।' তার দরকারও হয় না। একটি প্রচলিত কথা লীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ফুল ফোটে মধুকরকে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয় না যে এসো এখানে ফুল ফুটেছে। মধুপিপাসুরা আপনিই সাগ্রহে সেখানে আসে। ঠাকুরের কাছে তাঁর স্থূল শরীরে অবস্থানকালে যাঁরা এসেছিলেন, আপনাদের অন্তরের প্রেরণায় তাঁরা এসেছিলেন। অবশ্য ঠাকুরের যে অন্তরের ডাক ছিল না তা নয়, অন্তরের আহ্বান তাঁরও ছিল। তিনি সেই দক্ষিণেশ্বর কুঠীবাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, তোদের না দেখে আমি থাকতে পারছি না।' হয়তো সেই ডাক স্থূল শব্দরূপে চারিদিকে পৌঁছয়নি, কালীবাড়ীর সীমানার বাইরে স্থূলরূপে পৌঁছয়নি, কিন্তু জগতের দিকে দিকে কোণে কোণে সেই আহ্বান প্রসারিত হয়েছে এবং তার ফলে চারিদিক থেকে অমৃতের পিপাসু যাঁরা, তাঁরা সেই অমৃত পান করবার জন্য ছুটে আসছেন। সেই অমৃত কারও ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, জগতের সম্পদ। ভগবান যখন

আসেন, জগতের জন্য আসেন। তিনি কোথায় এলেন, কি রূপে এলেন, কোন্ সমাজের ভিতর এলেন সেটা বড় কথা নয়। তিনি এলেন একটি বিশেষ সময়ে, যে সময়ে জগতের তাঁকে প্রয়োজন ছিল। এইরূপে তাঁর আবির্ভাব এবং তাঁর স্থূল শরীরের অবসানের পরেও তাঁর ভাবমূর্তি দীর্ঘকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে এবং কাজ করে। এইটি বিশেষ করে আমাদের অনুধাবন করবার জিনিস।

আমরা মনে করছি কথামৃতের প্রস্রবণ বোধহয় এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে, না তা হয়নি। কথা যেখানে ব্যক্তভাবে হয় সেখানে তার শেষ হয়, আর অব্যক্ত ভাবরূপে যখন সে থাকে সে অনাদি, অনন্ত, অফুরন্ত, তা ফুরোবে না। কাজেই তাঁর কথা স্থূল শরীরে, স্থূলশব্দরূপে না হলেও সূক্ষ্মরূপে ভাবরূপে জগতের কোণে কোণে প্রসারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এইটি হচ্ছে কথামৃতের বৈশিষ্ট্য। কথামৃত কেবল কয়েকটি গ্রন্থের পাতায় সীমিত হয়ে নেই, তাঁর অনন্ত ভাবরাশি, তার মধ্যে মাত্র কিছু কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে গ্রন্থের পাতায়। আর বাকী সব এখনও অসংগৃহীত কিন্তু চারিদিকে আকাশে বাতাসে তা ভেসে বেড়াচ্ছে। যেখানেই কোনও প্রাণ গ্রহণ করতে উৎসুক এবং সমর্থ, সেখানেই তা প্রকাশিত হচ্ছে।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ অনন্ত। ঋষিদের ভিতর দিয়ে সেই বেদের প্রকাশ। অমুক অমুক মন্ত্রের অমুক অমুক ঋষি, কিন্তু কোন জায়গায়ই সেই ঋষিরা মন্ত্রের কর্তা নন, মন্ত্রের প্রকাশক। মন্ত্র তাঁদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েছে, ফুটে উঠেছে। সেইরকম কথামৃতের ঋষি মাত্র একজন সেই শ্রীম নন, তিনি প্রথম উৎস বলা যায়। তারপর চারিদিকে বিভিন্ন হৃদয়ে সেই মন্ত্র উদ্ভাসিত হচ্ছে। মন্ত্রের ঋষিরা বহু, বিচিত্র এবং তা কোন দেশকালের দ্বারা সীমিত নয়। অনন্ত জ্ঞানরাশি অনন্ত কাল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে অনুকূল ক্ষেত্র পেলেই তা সেখানে উপ্ত হয়, অঙ্কুরিত হয়,

ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্রবাহের বৈশিষ্ট্য। অন্য অনেক ভাব হয়তো সমাজে ওঠে এবং সমাজের উপর হয়তো কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করে। কতকগুলি কৌতূহলী মনের কাছে তা আকর্ষকও হয়। আবার মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে আর সেসব জিনিস বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের কথা কখনও চিরকালের জন্য বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যায় না। প্রত্যেকটি কথা অনন্ত, তার প্রভাব অফুরন্ত। দিনে দিনে এই প্রভাব আমরা অনুভব করব। যখন ঠাকুর স্থূলদেহে অবস্থান করে ছিলেন, তখন কজনই বা তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন, কজনই বা তাঁকে জানতে পেরেছিলেন?

একদিন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলেছিলেন যে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যখন বাস করতেন তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কর্মচারী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দক্ষিণেশ্বরবাসী, যারা ঠাকুরের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসতে সুযোগ পেয়েছিল তাদের জীবনে তাঁর প্রভাব আমরা কতটুকু দেখতে পাই? এই হচ্ছে ভগবানের বৈশিষ্ট্য যে, শুধু তাঁর সঙ্গে থাকলেই হয় না, দৈহিক সামীপ্যই যথেষ্ট নয়। কালের দ্বারাও এই প্রভাব সীমিত হয় না। কতকাল তারপর কেটে গিয়েছে কিন্তু আজও কথামৃত পুরানো হয়নি। ঠাকুরের ভাবধারা চারিদিকে এখনও অবধি যেন পূর্ণবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। কি বিপুল শক্তি এই কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, যে শক্তির গভীরতা ব্যাপকতা এখনও আমরা কল্পনায় আনতে পারছি না। ঠাকুরের স্থূলদেহে অবস্থানকালে কতজন তাঁকে উপহাস করেছেন, কতজন মাস্টারমশাইকে বলেছেন, ছেলেধরা মাস্টার। কারণ মাস্টার ছেলেদের ধরে ধরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যায় আর তাদের পরকালটা যায়। কিন্তু আজ আর সেকথা কেউ বলবে না এবং আজকেই যে তার পূর্ণরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাও নয়। যত দিন যাবে তত আমরা নূতন

নূতন করে এই কথামৃতের মাহাত্ম্যকে আস্বাদন করতে পারব। এই দিক দিয়ে দেখে কথামৃত সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। কেবল ভাষা হিসাবে নয়, কেবল একটি শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে নয়, অন্তরের ভিতরে আমাদের যে আকুতি, যে জিজ্ঞাসা রয়েছে সেগুলিকে এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। কতখানি আমরা এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি, আমাদের জীবনের পথ কতখানি এর দ্বারা আলোকিত হতে পারে। আর যদি তা না হয় তবে কথামৃত প্রসঙ্গ আলোচনা করে হয়তো আমাদের ভাষাসাহিত্যের কিছু সম্পদ-বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু জীবনে তা ফলপ্রসূ হবে না।

অবতার যখন আসেন তখন তাঁকে কেউ চিনতে পারে না, যত দিন যায় ক্রমশ পরিচয় প্রকাশ পায়। যেমন গীতায় বলেছেন, 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্' ॥ (৯।১১)—মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে মানবদেহধারী বলে অবজ্ঞা করে, আমার পরমতত্ত্ব যা তা আর জানে না। পরমতত্ত্ব জানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু যেখানে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু কেউ আছেন তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে সেই তত্ত্ব যেন নিজেকে অনাবৃত করে, উন্মোচিত করে। তত্ত্ব নিজে তাঁদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, এরজন্য সময়ের প্রয়োজন আছে, আমাদের ধৈর্য ধরে তার জন্য অপেক্ষা করবার দরকার আছে। আর দরকার আছে অন্তরকে নির্মল করবার, শুদ্ধ করবার যাতে হৃদয় মুকুরে সেই তত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতীত হতে পারে। এইজন্য আমাদের নিজেদের করণীয় কিছু রয়েছে, তা হল হৃদয়কে নির্মল করতে চেষ্টা করা। কেন আমরা তাঁর আহ্বান শুনতে পাচ্ছি না? কেন তাঁর কথা এমনভাবে আমাদের আকৃষ্ট করছে না যাতে সমস্ত জীবনটা পরিবর্তিত হয়ে যায়? দুচারটি লোক তাঁর কথায় প্রভাবিত যখন হয়েছিলেন, তখন সেইকথা শুনেছিলেন তো অনেকে, কিন্তু সকলের হৃদয়ে তার প্রভাব কেন পড়লো

না? আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে দেখতে গেলে বুঝি যে সেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না তাই সেখানে সেই অপূর্ব শক্তি কাজ করেনি, বীজ সেখানে অনঙ্কুরিত থেকে গেল। এইজন্য আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে, ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি কথা সেখানে উপ্ত হয়ে কালে আমাদের জীবনকে ফলে ফুলে সুশোভিত করে তোলে। আমরা দিনে দিনে তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখতে পাচ্ছি এবং দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। কিন্তু শুধু মুগ্ধ হলে হবে না, শুধু দ্রষ্টারূপে দেখলে হবে না, আমাদের নিজেদের ঐ পরিবেশে এসে জীবনকে একটুখানি সরস করতে হবে। জীবনকে পূর্ণরূপে অমৃতময় না করতে পারলেও অন্তত একটুখানি স্বাদও অনুভব করতে পারলে তখন দেখব 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। পদে পদে এই স্বাদ যেন ক্রমবর্ধমান হবে, বেড়ে বেড়ে আমাদের সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করবে। এইটুকু আমাদের ভাববার কথা, এইটুকু বিচার করবার কথা এবং সেজন্য আমাদের যা করণীয় তা করবার কথা।

আজ আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে নিজেদের এইজন্য প্রস্তুত করা। যেমন আমাদের রেডিওকে **tune** করতে হয়, সেই রকম করে নিজেদের **tune** করা যাতে সেই সুর আমাদের অন্তরে ধ্বনিত হয়, যাতে আমরা তাঁর কথাগুলিকে আমাদের অন্তরের কথা বলে গ্রহণ করতে পারি। যেমন কথামৃতে আছে, শ্রীরাধিকা বলছেন, 'তোদের শ্যাম কথার কথা, আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা।' কথার কথা রূপে তাঁর কথাগুলি আমাদের জীবনে যেন ভেসে না যায়, আমরা যেন সেগুলিকে অন্তরের ব্যথা বলে গ্রহণ করতে পারি। অন্তরের আকুলতা নিয়ে আমরা সেগুলিকে হৃদয়ে যেন ধারণ করতে পারি। তার পরিণামে আমাদের জীবন সার্থক হবে এবং শুধু তা নয় সমগ্র জগতে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হবে। আমরা যুগ বলতে কোন কালের সীমার দ্বারা তাকে সীমিত

করি না, যুগ মানে একটা ভাবপ্রবাহ। সত্যযুগ, দ্বাপর যুগ, ত্রেতা যুগ, কলিযুগ—এই যে কথা বলি, এই চারযুগ চিরকাল চলছে, কখনও একযুগের প্রভাবে কখনও অন্য যুগের প্রভাবে আমরা থাকি। একই কালে কেউ আছেন সত্যযুগের মানুষ কেউ কলিযুগের মানুষ। একজন খুব ভাল লোককে দেখলে আমরা বলি, আহা, এ মানুষটি সত্যযুগের মানুষ। সত্যই তিনি সত্যযুগের মানুষ কারণ তাঁর বাস হচ্ছে সত্যযুগে, এই যুগে নয়। এইরকম বর্তমান যুগকে আমাদের কালের দ্বারা সীমিত করলে চলবে না, আমাদের ভাবতে হবে আমরা সেই অবতারের যুগে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেই যুগেই যেন আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করি, তাঁকে যেন ভুলে না থাকি, বিস্মৃত না হয়ে যাই। বারে বারে তিনি আহ্বান করেছেন মানুষকে বহুরূপে, বহুযুগে। একজায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, আমার মুক্তি নেই, আমাকে যুগে যুগে আসতে হবে। আমরা বলছি না, সকলেই তাঁকে অবতার বলে গ্রহণ করুন, তিনিও সেই কথার উপরে জোর দেননি। ভাব হচ্ছে, ভগবানের করুণাময় মূর্তি যুগে যুগে প্রকট হচ্ছে। যাদের দরকার তাদের কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন তাদের জন্য, তাদের উদ্ধার করবার জন্য, তাদের নিজ পদপ্রান্তে নিয়ে যাবার জন্য। ভগবান বার বার এই ভাবে আসছেন। 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া'—ভাগবতে বলেছেন—অসংখ্য অবতার, দিকে দিকে কালে কালে তিনি অবতীর্ণ হচ্ছেন মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য। কতবার আবির্ভূত হয়েছেন এবং আরও কতবার হবেন। শেষ নেই তাঁর আসার। জীবের প্রতি করুণা তাঁর কখনও সীমিত হয় না, ধারা কখনও নিঃশেষিত হয় না। মানুষের প্রতি, আর্তের প্রতি, দুস্থের প্রতি, অজ্ঞানান্ধকারে যারা ডুবে রয়েছে তাদের প্রতি তাঁর করুণা চিরন্তন ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের সকলকে জাগাবার জন্য বারে বারে তাঁকে আবির্ভূত হতে হয়। স্বামীজী যেমন বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—ওঠো, জাগো। তোমরা ঘুমিয়ে

রয়েছো, গভীর ঘুমের মধ্যে থেকে তোমরা তোমাদের জীবনের লক্ষ্যকে ভুলে আছ।

একবার ঠাকুর বদ্ধজীবের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দৃষ্টান্ত এত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করছেন বা এত ভীষণ ভাবে ব্যাখ্যা করছেন যা সকলের ভয়ের কারণ হচ্ছে। তাই শ্রোতাদের ভিতরে একজন বলছেন, মশাই, বদ্ধজীবের কি তাহলে কোন উপায় নেই? ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে সিংহগর্জনে বলছেন, উপায় থাকবে না কেন? আছে বইকি। উপায় নেই এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে ভগবান মানুষকে ফেলেন না। শুধু 'উপায় আছে' এই কথা বললেন না। জোর দিয়ে বলছেন, থাকবে না কেন? তারপরে উপায়গুলি বললেন—তাঁর নাম গুণগান, সাধুসঙ্গ, মাঝে মাঝে নির্জনবাস, নিত্যানিত্য বিচার। এইগুলিকে উপায় বলে বলছেন। আমরা এগুলি তো উপায় বলে জানি কিন্তু সেইরূপে গ্রহণ করি কি? অবতার আসেন সেগুলিকে শুধু ভাবরূপে না রেখে সজীব প্রাণবন্ত করে তুলবার জন্য। ঠাকুর বলছেন, শাস্ত্রের কথা চিনিতে বালিতে মিশানো। আমাদের সেই বালিকে পরিত্যাগ করে চিনিকে গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্র ঘুমিয়ে আছে, আমাদের ভিতরে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, সেই শাস্ত্রকে জাগাতে হবে, প্রাণবন্ত করতে হবে। ধর্ম আমাদের কাছে কতকগুলি নীতিকথা, কতকগুলি পুরাণ, ইতিহাস বা অনুষ্ঠান মাত্র হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের জীবনে সেগুলিকে প্রাণবন্ত করতে হবে। এই জন্য বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব—স্বামীজী বলেছেন। বেদমূর্তি—অনন্ত জ্ঞানরাশির আকর যে বেদ সেই বেদ যেন মূর্তি ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আমি বলছি না একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ রূপেই তাঁর আবির্ভাব। বহুরূপে অনন্তকাল ধরে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে এবং হবে, শেষ নেই তার। যতদিন মানুষের তাঁকে প্রয়োজন থাকবে ততদিন তাঁর আবির্ভাব হবে।

উপস্থিত যে কালে আমরা এসেছি, এই সময়ে তাঁর যে অদ্ভুত প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে, তা যাতে আমাদের জীবনে কার্যকর হয় এইজন্য আমরা সকলে প্রাণভরে প্রার্থনা করি—হে প্রভু, তোমার আগমন আমাদের জীবনে সার্থক হোক।

সমাপ্ত